গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় খণ্ড

গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
ও অন্যান্য গান

VISVA-BHARATI
294431
LIBRARY
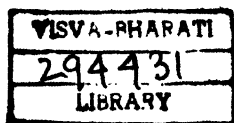
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৭
সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৭
তৃতীয় সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৭১
পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৭৩, পৌষ ১৩৭৫
চতুর্থ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬
পঞ্চম সংস্করণ : মাঘ ১৩৭৯
ষষ্ঠ সংস্করণ : পৌষ ১৩৮১

পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৮৪, বৈশাখ ১৩৮৬
ভাদ্র ১৩৮৬, ফাল্গুন ১৩৯৩
ফাল্গুন ১৩৯৪

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন । কলিকাতা ৬

স্বরলিপিপঞ্জী

গানের প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রে (পৃষ্ঠা ৭-৩২) কোথায় কোন্ গানের স্বরলিপি প্রকাশিত তাহা নির্দেশ করা হইল ; গ্রন্থোত্তর সংখ্যা গ্রন্থের খণ্ড -বাচক ; সাময়িক পত্রের নির্দেশের সহিত সংখ্যা-দ্বারা যথাক্রমে মাস বৎসর ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করা হইয়াছে। (গানের স্বরলিপি কোনো গ্রন্থে সংকলিত হইয়া থাকিলে, উহার সাময়িক পত্রে প্রকাশ প্রায়শঃ উল্লেখ করা হয় নাই।) যে-সকল পুস্তকে বা সংগীত-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।—

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
অরূপরতন[১] (স্বরবিতান ৪২)	১৩৬২	
আনুষ্ঠানিক সংগীত	১৩৭০	আনুষ্ঠানিক
কাব্যগীতি[২] (স্বরবিতান ৬৩)	১৩২৬	
কালমৃগয়া (স্বরবিতান ২৯)	১৩৬০	
কেতকী (স্বরবিতান ১১)	১৩২৬	
গীতপঞ্চাশিকা (স্বরবিতান ১৮)	১৩২৫	
গীতমালিকা (দুই ভাগ : স্বরবিতান ৩০[৩] ও ৩১)	১৩৪৫ ও ১৩৩৬	
গীতলিপি[৪] (ছয় খণ্ড)	খ্রীস্টীয় ১৯১০-১৮	
গীতলেখা[৫] (তিন ভাগ)	১৩২৪-২৭	

---

১ রাজা নাটকের রূপান্তর— অরূপরতন ; উহার ১৩২৬ মাঘ ও ১৩৪২ কার্তিক এই দুইটি সংস্করণের সব গানেরই স্বরলিপি সংকলিত।

২ ১৩২৬ পৌষে প্রথম প্রকাশিত ; ইহার ৫টি গানের স্বরলিপি 'অরূপরতন' (স্বরবিতান ৪২) গ্রন্থে সংকলিত ও কাব্যগীতির পুনর্মুদ্রণে বর্জিত।

৩ প্রথমভাগ গীতমালিকার ১৩৩৩ সালের প্রথম মুদ্রণে ছিল না এমন ১০টি গানের স্বরলিপি ১৩৪৫ সালে ইহাতে প্রথম সংকলিত হয়।

৪ অধিকাংশই স্বরবিতানের ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ -অঙ্কিত খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত— মাত্র ১৫টি গানের স্বরলিপি শেফালি, কেতকী, অরূপরতন ও অন্য দু-একখানি গ্রন্থে থাকায়, উল্লিখিত তিন খণ্ডে গৃহীত হয় নাই।

৫ অধিকাংশ স্বরলিপি স্বরবিতানের ৩৯, ৪০ ও ৪১ -অঙ্কিত খণ্ডে সংকলিত।

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংকেত
গীতিচর্চা (দুই খণ্ড)	১৩৬৮ ও ১৩৭৩	
গীতিবীথিকা (স্বরবিতান ৩৪)	১৩২৬	
তপতী[৬] (স্বরবিতান ৫৭)	১৩৩৮	
তাসের দেশ (স্বরবিতান ১২)	১৩৫৭	
নবগীতিকা (দুই খণ্ড : স্বরবিতান ১৪ ও ১৫)	১৩২৯	
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (স্বরবিতান ১৮)	১৩৪৫	চণ্ডালিকা
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (স্বরবিতান ১৭)	১৩৪৩	চিত্রাঙ্গদা
প্রায়শ্চিত্ত (স্বরবিতান ২[৭])	১৩১৬	
ফাল্গুনী (স্বরবিতান ৭)	১৩৫৫	
বসন্ত (স্বরবিতান ৬)	১৩৩০	
বাল্মীকিপ্রতিভা (স্বরবিতান ৪৯)	১৩৩৫	
বিশ্বভারতী পত্রিকা ॥ ত্রৈমাসিক		বিশ্বভারতী
বিসর্জন (স্বরবিতান ২৮[৮])	১৩৫৯	
বৈতালিক[৯]	১৩২৫	
ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি[১০] (ছয় খণ্ড)	১৩১১-১৮	ব্রহ্মসঙ্গীত

[৬] ১৩৩৬ ভাদ্রের বিশেষ-সংস্করণ পুস্তক এবং ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ ও ১৩৫৬ বৈশাখের সকল পুস্তক স্বরলিপি-যুক্ত। প্রথমোক্ত পুস্তকে 'সর্ব খর্বতারে দহে' গানটি নাই, অন্যান্য পুস্তকে 'যমের দুয়ার খোলা পেয়ে' গানটি বর্জিত— শেষোক্ত গ্রন্থের স্বরলিপি-অংশের পুনর্মুদ্রণই স্বরবিতান ৫৭।

[৭] প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ সংস্করণের (১৩১৬) স্বরলিপি-অংশের পুনর্মুদ্রণ। এককালে 'বিসর্জন' নাটকের পরিশিষ্টে (১৩৪৯-৫১) গানগুলির স্বরলিপি মুদ্রিত ছিল। এই গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত, সেইসঙ্গে 'রাজা ও রানী' এবং 'ব্যঙ্গকৌতুক'এর গানগুলিরও স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে।

[৯] এই গ্রন্থ, প্রধানতঃ ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গীতলিপি ও গীতলেখা হইতে স্বরলিপির সংকলন। ইহার ৬টি নূতন স্বরলিপির মধ্যে, স্বরবিতানের সপ্তবিংশ খণ্ডে ৫টি ও ১টি ত্রয়শ্চত্বারিংশ খণ্ডে সংকলিত।

[১০] কাঙ্গালীচরণ সেন -কর্তৃক সংকলিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি'র ছয় খণ্ডে রবীন্দ্র-সংগীতের ১৯৮টি স্বরলিপি ছিল; তন্মধ্যে স্বরবিতানের চতুর্থ খণ্ডে ৫০টি,

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী[১১] (স্বরবিতান ২১)	১৩৫৮	ভানুসিংহ
ভারততীর্থ[১২]	১৩৫৪	
মায়ার খেলা (স্বরবিতান ৪৮)	১৩০২	
শতগান[১৩]	১৩০৭	
শাপমোচন	১৩৭১	
শেফালি (স্বরবিতান ৫০)	১৩২৬	
শ্যামা (স্বরবিতান ১৯)	১৩৪৬	
সংগীতগীতাঞ্জলি[১৪]	খ্রীস্টীয় ১৯২৭	গীতাঞ্জলি
স্বরলিপি-গীতিমালা (১৩০৪)[১৫]	১৩০৪	গীতিমালা
স্বরবিতান[১৬]	১৩৪২	বিকল্পে : স্বর

দ্বাবিংশ চতুর্বিংশ পঞ্চবিংশ ও ষড়্‌বিংশ খণ্ডের প্রত্যেকটিতে ২৫টি, ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ২৬টি, এবং ১৯টি সপ্তবিংশ খণ্ডে সংকলিত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি' (প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৫৮) স্বতন্ত্র পুস্তক। পরবর্তী সূচীতে উহার উল্লেখস্থলে, গ্রন্থের পুরা নাম ও প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে।

১১ ৯টি পদাবলীর সুর বা স্বরলিপি, অধিকন্তু গোবিন্দদাস-রচিত 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি' গানে রবীন্দ্রনাথ যে সুর দেন তাহাও আছে।

১২ ইহার সমুদয় স্বরলিপি স্বরবিতান ৪৬ ও ৪৭ খণ্ডে সংকলিত।

১৩ ইহার অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত।

১৪ ইহার অধিকাংশ স্বরলিপি পূর্বপ্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থে প্রচারিত ছিল। বর্তমানে ইহার সমুদয় স্বরলিপি স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

১৫ ইহার অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি স্বরবিতানের ১০, ২০, ৩২ ও ৩৫ -অঙ্কিত খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

১৬ রবীন্দ্রসংগীতের সমুদয় স্বরলিপি এই গ্রন্থমালায় ক্রমশঃ সংকলিত হইতেছে।

কয়েকটি খণ্ড সম্পর্কে বিশেষ তথ্য—

স্বরবিতান ৩৭ ও ৩৮ উভয় খণ্ডে গীতাঞ্জলি কাব্যের ৫৯টি, প্রাক্-গীতাঞ্জলি ১টি, মোট ৬০টি গানের স্বরলিপি আছে।

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংকেত
স্বরবিতান[১৭]	১৩৬৩	
Twenty six Songs by Rabindranath Tagore : staff notation by A. A. Bake	১৩৭৫	বাকে

স্বরবিতান ৩৯, ৪০ ও ৪১ -অঙ্কিত খণ্ডে গীতিমাল্য কাব্যের ৭৮টি গানের স্বরলিপি, প্রধানতঃ গীতলেখার বিভিন্ন খণ্ড হইতে সংকলিত।

স্বরবিতান ৪৩ ও ৪৪ -অঙ্কিত খণ্ডে গীতালি কাব্যের মোট ৫২টি গানের স্বরলিপি রহিয়াছে।

স্বরবিতান ৪৫-অঙ্কিত খণ্ডে ৩০টি ভগবদ্‌ভক্তিমূলক গানের স্বরলিপি।

স্বরবিতান ৪৬ ও ৪৭ -অঙ্কিত খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের দেশভক্তিসূচক সমুদয় গানের, তথা 'বন্দে মাতরম্‌' গানের রবীন্দ্র-স্বর সংকলিত।

স্বরবিতান ৫২-অঙ্কিত খণ্ডে অচলায়তন নাটকের ১৮টি ও মুক্তধারা নাটকের ৮টি, মোট ২৬টি গানের স্বরলিপি সংকলিত।

স্বরবিতান ৫৩ ও ৫৪ -অঙ্কিত খণ্ডে কবির শেষ বয়সে রচিত বহু গানের স্বরলিপি সংকলিত।

স্বরবিতান ৫৫-অঙ্কিত খণ্ডে বহু আনুষ্ঠানিক সংগীতের স্বরলিপি সংকলিত।

স্বরবিতান ৫৬-অঙ্কিত খণ্ডের ২৮টি গানের অধিকাংশই ইতিপূর্বে পুস্তকে বা পত্রিকায় অপ্রকাশিত।

স্বরবিতান ৫৭-অঙ্কিত খণ্ডে তপতী নাটকের ১০টি গানের স্বরলিপি।

স্বরবিতান ৫৮ ও ৫৯ -অঙ্কিত খণ্ডে কবির শেষ বয়সের, প্রধানতঃ বর্ষা-বসন্তের, বহু গানের স্বরলিপি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

স্বরবিতান ৬০-অঙ্কিত খণ্ডে ১৫টি গানের স্বরলিপি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

[১৭] নাগরী হরপে প্রচারিত স্বরবিতানে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র নির্বাচিত ২৫টি গানের স্বরলিপি সংকলিত। বাংলা স্বরবিতান হইতে ভিন্ন।

বাংলা বর্ণমালার নির্দিষ্ট ক্রমে গানের প্রথম ছত্রগুলি সাজানো। ড়—ড, ঢ়—ঢ, য়—য এরূপই ধরা হয়। উপস্থিত সূচীপত্রে ং=ঙ্ এরূপও ধরা হইয়াছে; অর্থাৎ 'সংকট' শব্দ, 'সঙ্কট' বানান থাকিলে যেখানে বসিবার সেইখানেই বসিয়াছে। ঁ এবং ঃ স্বাতন্ত্র্যমর্যাদা পায় নাই, ওইরূপ চিহ্ন না থাকিলে শব্দটি যে স্থানে থাকিবার সেখানেই আছে। 'ঐ' বর্ণটিকে বাংলা শব্দের আদিতে স্বীকার করা হয় নাই, 'ওই' বানানে তদুপযুক্ত স্থানে বসানো হইয়াছে।

বর্তমান সূচীতে সম্ভব হইলেই, স্বরলিপিহীন গানের সুর বা সুর-তাল -সম্পর্কিত তথ্য সংকলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সূচীতে সংকলিত প্রথম ছত্রের পূর্বে * চিহ্ন দিয়া, চিহ্নিত গান যে এদেশীয়, পূর্বপ্রচলিত, অন্যের কোনো বিশেষ গান অথবা গতের আদর্শে বা প্রভাবে রচিত ইহাই জানানো হইয়াছে। অপর পক্ষে ছত্রের পূর্বে + চিহ্ন দিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, ঐ গান কোনো বিলাতি গানের আদর্শে বা প্রভাবে রচিত।

কোনো কোনো গানের সূচনাতেই পাঠভেদ দেখা যায়— কখনো-বা একটি পাঠের সূচনাতেই অতিপর্বিক একটি শব্দ আছে, অন্য পাঠে নাই— এরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ পাঠই সূচীপত্রে ধরা হইয়াছে এবং একটি পাঠের উল্লেখ-স্থলে প্রয়োজন হইলে বন্ধনী-মধ্যে অন্য পাঠেরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' প্রভৃতি স্বরলিপিগ্রন্থে, বিভিন্ন চরিত্র -কর্তৃক গীত হওয়ায়, একই গানের বিভিন্ন অংশের স্বরলিপি পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রিত আছে, বর্তমান সূচীপত্রে অপ্রধান রচনা-খণ্ডের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই।

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

কালমৃগয়া

প্রথম দৃশ্য

তপোবন

ঋষিকুমারের প্রবেশ

বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি।
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী।
কোথা সে লীলা গেল কোথায়।
লীলা, লীলা, খেলাবি আয়॥

লীলার প্রবেশ

লীলা। ও ভাই, দেখে যা, কত ফুল তুলেছি।

ঋষিকুমার। তুই আয় রে কাছে আয়,
আমি তোরে সাজিয়ে দি—
তোর হাতে মৃণাল-বালা,
তোর কানে চাঁপার দুল,
তোর মাথায় বেলের সিঁথি,
তোর খোঁপায় বকুল ফুল॥

লীলা। ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মতো
ফুল কত ফুটেছে।
কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি যায়—

ও ভাই, সাবধানেতে আয় রে হেথা,
দিস নে দ'লে পায়॥

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা,
যাব নদীর কূলে।
শিব গড়িয়ে করব পুজো,
আনব কুসুম তুলে।

ঋষিকুমার। মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা,
দুলব সে দোলায়।
বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
বকুলের তলায়।

লীলা। না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
নিয়ে যাব ধরে—
মা বলেছে ঋষির সাজে
সাজিয়ে দেবে তোরে।

ঋষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই,
এখন যাই ফিরে—
একলা আছেন অন্ধ পিতা
আঁধার কুটিরে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

বনদেবীগণ

প্রথম। সমুখেতে বহিছে তটিনী,
দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।

দ্বিতীয়। বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।

তৃতীয়। সাঁঝের অধর হতে
ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।

চতুর্থ। দিবস বিদায় চাহে,
সরযূ বিলাপ গাহে,
সায়াহ্নেরই রাঙা পায়ে
কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া।

সকলে। এসো সবে এসো, সখী,
মোরা হেথা বসে থাকি—

প্রথম। আকাশের পানে চেয়ে
জলদের খেলা দেখি।

সকলে। আঁখি-'পরে তারাগুলি
একে একে উঠিবে ফুটিয়া॥

সকলে। ফুলে ফুলে চ'লে চ'লে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,
কী জানি কিসেরই লাগি প্রাণ করে হায়-হায়॥

প্রথম। নেহারো, লো সহচরী,
কানন আঁধার করি
ওই দেখো বিভাবরী আসিছে।

দ্বিতীয়। দিগন্ত ছাইয়া
শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিছে।

তৃতীয়। আয়, সখী, এই বেলা
মাধবী মালতী বেলা
রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা।

চতুর্থ। ওই দেখো নলিনী উথলিত সরসে
অস্ফুট মুকুলমুখী মৃদু মৃদু হাসিছে।

সকলে। আসিবে ঋষিকুমার কুসুমচয়নে,
কুটারে রাখিয়া দিব তারি তরে সযতনে।
নিচু নিচু শাখাতে ফোটে যেন ফুলগুলি,
কচি হাত বাড়াইয়ে পায় যেন কাছে॥

তৃতীয় দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার

বেদপাঠ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্যতি দিশোহস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্॥

তস্য প্রাচী দিগ্‌ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্র রোদং রোদিতি সোহহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্॥

অন্ধ ঋষি জল এনে দে, রে বাছা, তৃষিত কাতরে।
শুকায়েছে কণ্ঠ তালু, কথা নাহি সরে॥

মেঘগর্জন

না, না, কাজ নাই, যেয়ো না বাছা—
গভীরা রজনী ঘোর, ঘন গরজে—
তুই যে এ অন্ধের নয়নতারা।
আর কে আমার আছে!
কেহ নাই— কেহ নাই—
তুই শুধু রয়েছিস হৃদয় জুড়ায়ে।

তোরেও কি হারাব বাছা রে—
সে তো প্রাণে স'বে না ॥

ঋষিকুমার। আমা-তরে অকারণে, ওগো পিতা, ভেবো না।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না।
পথ যে সরল অতি,
চপলা দিতেছে জ্যোতি—
তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না ॥

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বন

বনদেবতা

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশ দিশি,
স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—
কী হবে কে জানে।
ঘোরা রজনী,
দিকললনা ভয়বিভলা।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী
থরহর চরাচর পলকে ঝলকিয়া।
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী।

গুরু গুরু নীরদগরজনে
স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে।
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ,
কড় কড় বাজ॥

প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

সকলে। ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে।
দ্বিতীয়। গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা—
তৃতীয়। ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
সকলে। দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত—
প্রথম। চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে॥

সকলে। আয় লো সজনী, সবে মিলে—
ঝর ঝর বারিধারা,
মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন—
এ বরষা-দিনে
হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে।
প্রথম। ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন—
দ্বিতীয়। মাখাব বরন ফুলে ফুলে।
তৃতীয়। পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা—
চতুর্থ। লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
প্রথম। বনেরে সাজায়ে দিব, গাঁথিব মুকুতাকণা,
পল্লবশ্যামদুকূলে।
দ্বিতীয়। নাচিব, সখী, সবে নবঘন-উৎসবে
বিকচ বকুলতরু-মূলে॥

ঋষিকুমারের প্রবেশ

ঋষিকুমার। কী ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা,
পথ যে কোথায় দেখা নাহি যায়,
জড়ায়ে যায় চরণে লতাপাতা।
যাই, ত্বরা ক'রে যেতে হবে
সরযূতটিনীতীরে—
কোথায় সে পথ।
ওই কল কল রব—
আহা, তৃষিত জনক মম,
যাই তবে যাই ত্বরা।

বনদেবীগণ। এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাস্!
ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে।
স্নেহের পুতুলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে—
কী জানি কী হবে,
বনে হবি পথহারা।

ঋষিকুমার। না, কোরো না মানা, যাব ত্বরা।
পিতা আমার কাতর তৃষায়,
যেতেছি তাই সরযূনদীতীরে॥

বনদেবীগণ। মানা না মানিলি, তবুও চলিলি—
কী জানি কী ঘটে।
অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন—
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে।
রাখ্ রে কথা রাখ্, বারি আনা থাক্—
যা, ঘরে যা ছুটে।
অয়ি দিগঙ্গনে, রেখো গো যতনে
অভয় স্নেহছায়ায়।

অয়ি বিভাবরী, রাখো বুকে ধরি
 ভয় অপহরি রাখো এ জনায়।
এ যে শিশুমতি, বন ঘোর অতি—
 এ যে একেলা অসহায়॥

পঞ্চম দৃশ্য

শিকারীগণের প্রবেশ

বনে বনে সবে মিলে চলো হো !
 চলো হো !
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়।
 এমন রজনী বহে যায় যে।
ধনুর্বাণ বল্লম লয়ে হাতে
 আয় আয় আয়, আয় রে।
 বাজা শিঙ্গা ঘন ঘন—
 শব্দে কাঁপিবে বন,
 আকাশ ফেটে যাবে,
 চমকিবে পশু পাখি সবে,
 ছুটে যাবে কাননে কাননে,
চারি দিকে ঘিরে যাব পিছে পিছে।
 হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ॥

দশরথের প্রবেশ

শিকারীগণ। জয়তি জয় জয় রাজন্, বন্দি তোমারে—
 কে আছে তোমা-সমান।
ত্রিভুবন কাঁপে তোমার প্রতাপে,
 তোমারে করি প্রণাম॥

শিকারীদের প্রতি

দশরথ। গহনে গহনে যা রে তোরা—
নিশি বহে যায় যে।
তন্ন তন্ন করি অরণ্য
করী বরাহ খোঁজ্ গে!
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশু সবে
এখনি বাহির হবে—
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্।
জ্বালায়ে মশাল-আলো
এই বেলা আয় রে॥

প্রস্থান

প্রথম শিকারী। চল্ চল্ ভাই,
ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয়। প্রাণপণ খোঁজ্ এ বন, সে বন!
তৃতীয়। চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই।
প্রথম। না না ভাই, কাজ নাই—
হোথা কিছু নাই— কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
তৃতীয়। বরা! বরা!
প্রথম। আরে, দাঁড়া দাঁড়া,
অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার।
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়
ওই অশথতলায়।
এবার ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে সবে থাক্—
সাবধান, ধরো বাণ—
সাবধান, ছাড়ো বাণ।

দুই-তিন জন। গেল গেল, ওই ওই পালায় পালায়।
চল্ চল্—
ছোট্ রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই॥

প্রস্থান

বিদূষকের সভয়ে প্রবেশ

বিদূষক। প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে,
ওরে বরা, করবি এখন কী!
বাবা রে!
আমি চুপ ক'রে এই
আমড়াতলায় লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরোদখানা,
দেখেও কি রে ভড়কালি না!
বাহবা, সাবাস্ তোরে—
সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি।
গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে
ব্রাহ্মণীরে ঘরে ফেলে
কোথা এলেম এ ঘোর বনে—
মনে আশা ছিল মস্ত
চলবে ভালো দক্ষিণ হস্ত,
হা রে রে পোড়া কপাল,
তাও যে দেখি কেবল ফাঁকি॥

শিকারীগণের প্রবেশ

শিকারীগণ। ঠাকুরমশায়, দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই ব'সে
শিকারেতে হবে যেতে
মিহি কোমর বাঁধো ক'ষে।

বন বাদাড় সব ঘেঁটেঘুঁটে
আমরা মরি খেটেখুটে,
তুমি কেবল লুটেপুটে
পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে !

বিদূষক । কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি !
শিকার করতে যায় কে মরতে,
ঢুঁসিয়ে দেবে বরা-মোষে ।
ঢুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে ॥

হাসিতে হাসিতে
শিকারীগণের প্রস্থান

বিদূষক । আঃ বেঁচেছি এখন ।
শর্মা ও দিকে আর নন ।
গোলেমালে ফাঁকতালে সটকেছি কেমন ।
দেখে বরা'র দাঁতের পাটি
লেগেছিল দাঁত-কপাটি,
পড়ল খ'সে হাতের লাঠি কে জানে কখন—
আহা কে জানে কখন ।
চুলগুলা সব ঘাড়ে খাড়া,
চক্ষু-দুটো মশাল-পারা—
গোঁ-ভরে হেঁট-মুখে তাড়া কল্লে সে যখন—
রাস্তা দেখতে পাই নে চোখে,
পেটের মধ্যে হাত পা ঢোকে,
চুপ্‌সে গেল ফাঁপা ভুঁড়ি শঙ্কাতে তখন—
আহা শঙ্কাতে তখন ॥

প্রস্থান

শিকার স্কন্ধে
শিকারীগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা
রাশি রাশি শিকার।
করেছি ছারখার,
সব করেছি ছারখার।
বন-বাদাড় তোলপাড়
করেছি রে উজাড়॥

গাইতে গাইতে প্রস্থান

বনদেবীদের প্রবেশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া।
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া।
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে।
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে।
আকুল সরসী, সারস সারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
বিপদ-ঘনছায়া ছাইয়া।

কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া ॥

প্রস্থান

দশরথের প্রবেশ

না জানি কোথা এলুম, এ যে ঘোর বন।
কোথা সে করীশিশু, কোথা লুকালো!
একে তো জটিল বন, তাহে আঁধার ঘন,
যাক্-না যাবে সে কত দূর, কত দূর—
যাব পিছে পিছে—
না না না না, ও কী শুনি!
ওই-সে সরযূতীরে করিছে সলিল পান—
শবদ শুনি যে ওই, এই তবে ছাড়ি বাণ ॥

নেপথ্যে বনদেবীগণ

হায় কী হ'ল! হায় কী হ'ল!

বাণাহত ঋষিকুমারের নিকট দশরথের গমন

কী করিনু হায়!
এ তো নয় রে করীশিশু! ঋষির তনয়!
নিঠুর প্রখর বাণে রুধিরে আপ্লুত কায়,
কায় রে প্রাণের বাছা ধুলাতে লুটায়!
কী কুলগ্নে না জানি রে ধরিলাম বাণ,
কী মহাপাতকে কার বধিলাম প্রাণ!
দেবতা, অমৃতনীরে হারা প্রাণ দাও ফিরে,
নিয়ে যাও মায়ের কোলে মায়ের বাছায় ॥

মুখে জলসিঞ্চন

ঋষিকুমার। কী দোষ করেছি তোমার,
কেন গো হানিলে বাণ!
একই বাণে বধিলে যে
দুটি অভাগার প্রাণ।
শিশু বনচারী আমি,
কিছুই নাহিক জানি,
ফল মূল তুলে আনি—
করি সামবেদ গান।
জন্মান্ধ জনক মম
তৃষায় কাতর হয়ে
রয়েছেন পথ চেয়ে—
কখন যাব বারি লয়ে।
মরণান্তে নিয়ে যেয়ো,
এ দেহ তাঁর কোলে দিয়ো—
দেখো, দেখো, ভুলো নাকো,
কোরো তাঁরে বারি দান।
মার্জনা করিবেন পিতা—
তাঁর যে দয়ার প্রাণ॥

মৃত্যু

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি

আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে,
হা তাত, একবার আয় রে।

ঘোরা রজনী, একাকী,
কোথা রহিলে এ সময়ে !
প্রাণ যে চমকে মেঘগরজনে,
কী হবে কে জানে ॥

লীলার প্রবেশ

লীলা । বলো বলো, পিতা, কোথা সে গিয়েছে ।
কোথা সে ভাইটি মম কোন্ কাননে,
কেন তাহারে নাহি হেরি !
খেলিবে সকালে আজ বলেছিল সে,
তবু কেন এখনো না এল ।
বনে বনে ফিরি 'ভাই ভাই' করিয়ে,
কেন গো সাড়া পাই নে ॥

অন্ধ । কে জানে কোথা সে !
প্রহর গণিয়া গণিয়া বিরলে
তারি লাগি ব'সে আছি
একা হেথা কুটীরদুয়ারে—
বাছা রে, এলি নে ।
ত্বরা আয়, ত্বরা আয়, আয় রে,
জল আনিয়ে কাজ নাই—
তুই যে আমার পিপাসার জল ।
কেন রে জাগিছে মনে ভয় ।
কেন আজি তোরে হারাই-হারাই
মনে হয় কে জানে ॥

লীলার প্রস্থান

মৃত দেহ লইয়া দশরথের
প্রবেশ

অন্ধ। এতক্ষণে বুঝি এলি রে!
হৃদিমাঝে আয় রে, বাছা রে!
কোথা ছিলি বনে এ ঘোর রাতে
এ দুর্যোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি।
আছি সারানিশি হায় রে
পথ চাহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর—
দে মুখে বারি! কাছে আয় রে॥

দশরথ। অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা তাত, ধরি চরণে।
কেমনে কহিব, শিহরি আতঙ্কে।
আঁধারে সন্ধানি শর খরতর
করীভ্রমে বধি তব পুত্রবর
গ্রহদোষে পড়েছি পাপপঙ্কে॥

দশরথ-কর্তৃক ঋষির নিকটে
ঋষিকুমারের মৃতদেহ
স্থাপন

অন্ধ। কী বলিলে, কী শুনিলাম, এ কি কভু হয়!
এই-যে জল আনিবারে গেল সে সরযূতীরে—
কার সাধ্য বধে, সে যে ঋষির তনয়।
সুকুমার শিশু সে যে, স্নেহের বাছা রে—
আছে কি নিষ্ঠুর কেহ বধিবে যে তারে!
না না না, কোথা সে আছে, এনে দে আমার কাছে-
সারা নিশি জেগে আছি, বিলম্ব না সয়।
এখনো যে নিরুত্তর, নাহি প্রাণে ভয়!
রে দুরাত্মা, কী করিলি—

অভিশাপ

পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাংপ্রতম্
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি ॥

দশরথ। ক্ষমা করো মোরে, তাত— আমি যে পাতকী ঘোর
না জেনে হয়েছি দোষী, মার্জনা নাহি কি মোর!
সহে না যাতনা আর— শান্তি পাইব কোথায়!
তুমি কৃপা না করিলে নাহি যে কোনো উপায়।
আমি দীন হীন অতি— ক্ষম ক্ষম কাতরে,
প্রভু হে, করহ ত্রাণ এ পাপের পাথারে ॥

অন্ধ। আহা, কেমনে বধিল তোরে!
তুই যে স্নেহের পুতলি, সুকুমার শিশু ওরে।
বড়ো কি বেজেছে বুকে! বাছা রে,
কোলে আয়, কোলে আয় একবার—
ধুলাতে কেন লুটায়ে! রাখিব বুকে ক'রে ॥

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও অবশেষে
উঠিয়া দাঁড়াইয়া দশরথের প্রতি

শোক তাপ গেল দূরে,
মার্জনা করিনু তোরে ॥

পুত্রের প্রতি

যাও রে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাশরি—
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে—
কেবলই আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি।

যাও রে অনন্ত ধামে, অমৃতনিকেতনে—
অমরগণ লইবে তোমা উদার-প্রাণে
দেব-ঋষি রাজ-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে—
যাও রে অনন্ত ধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে—
যায় যেথা দানব্রত সত্যব্রত পুণ্যবান
যাও বৎস, যাও সেই দেবসদনে ॥

যবনিকাপতন

পুনরুত্থান

ঋষিকুমারের মৃতদেহ ঘেরিয়া বনদেবীদের গান

সকলই ফুরালো স্বপনপ্রায় !
কোথা সে লুকালো, কোথা সে হায় ।
কুসুমকানন হয়েছে ম্লান,
পাখিরা কেন রে গাহে না গান—
ও সব হেরি শূন্যময়— কোথা সে হায় !
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল ।
সেই যে আসিত তুলিতে জল,
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
ও সে আর আসিবে না— কোথা সে হায় ॥

যবনিকাপতন

বাল্মীকিপ্রতিভা

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য

বনদেবীগণ

সহে না, সহে না, কাঁদে পরান।
সাধের অরণ্য হল শ্মশান।
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান।
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখি গাহে না গান।
শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদনরবে ফাটে পাষাণ।
দেবী দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে—
রাখো অধীনী জনে, করো শান্তিদান॥

প্রস্থান

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

আঃ বেঁচেছি এখন। শর্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন।
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি,
তাই, মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন—
আহা সটকেছি কেমন।
আসুক তারা আসুক আগে, দুনোদুনি নেব ভাগে,
হাস্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন।
শুধু মুখের জোরে, গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে,
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম—
আহা করব সরগরম॥

লুঠের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার।
করেছি ছারখার— সব করেছি ছারখার—
কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে করেছি একাকার।

প্রথম দস্যু। আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ—
এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ।

দ্বিতীয় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা!

প্রথম দস্যু। এত বড়ো আস্পর্ধা তোদের,
মোরে নিয়ে এ কি হাসি-তামাশা!
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড, খবর্দার রে খবর্দার!

দ্বিতীয় দস্যু। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নস্য, এমনি যে আকার।

তৃতীয় দস্যু। এম্‌নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ—
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ।

প্রথম দস্যু। আর যে এ-সব সহে না প্রাণে—
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া!
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ—
কোথা রে লাঠি, কোথা রে ঢাল!

সকলে। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার॥

বাল্মীকির প্রবেশ

সকলে। এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কে বা রাজা, কার রাজ্য; মোরা কী জানি!
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী।
রাজা-প্রজা উঁচু-নিচু কিছু না গণি!

ত্রিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়॥

বাল্মীকির প্রতি

প্রথম দস্যু। এখন করব কী বল্।
সকলে। এখন করব কী বল্।
প্রথম দস্যু। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল!
সকলে। বল্ রাজা, করব কী বল্ এখন করব কী বল্।
প্রথম দস্যু। পেলে মুখেরই কথা,
আনি যমেরই মাথা। করে দিই রসাতল!
সকলে। করে দিই রসাতল!
সকলে। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল।
বল্ রাজা, করব কী বল্ এখন করব কী বল্॥
বাল্মীকি। শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে, পূজা দেব কালীকে।
ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা—
বলি নিয়ে আয়॥

বাল্মীকির প্রস্থান

সকলে। ত্রিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়॥

—

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়—
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্!
দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক।
কে বা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ!
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরশা, আন্ আন্ দেখি ঢাল।
প্রথম দস্যু। আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল।

হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ ॥

উঠিয়া

সকলে। কালী কালী বলো রে আজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো !
নামের জোরে সাধিব কাজ—
বলো হো হো হো, বলো হো, বলো হো !
ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে,
ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ওই লট্টপট্টকেশ অট্ট অট্ট হাসে রে—
হাহাহা হাহাহা হাহাহা !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয় !
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয় !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয় !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয় ॥

গমনোদ্যম

একটি বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওই মেঘ করে বুঝি গগনে।
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে।
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
সারা দিবস বনভ্রমণে
ঘরে ফিরে যাব কেমনে ॥

—

এ কী এ ঘোর বন ! এনু কোথায় !
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না।
কী করি এ আঁধার রাতে।

কী হবে মোর হায়।
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিত চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা—
তরাসে কাঁপে কায়॥

বালিকার প্রতি

প্রথম দস্যু। পথ ভুলেছিস সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখতে চাস?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব সুখে থাকবি বারো মাস।
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রথমের প্রতি

দ্বিতীয় দস্যু। কেমন হে ভাই! কেমনে সে ঠাঁই?
প্রথম দস্যু। মন্দ নহে বড়ো—
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়ো।
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ!
তৃতীয় দস্যু। আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে—
আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে।
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ॥

সকলের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়।
আহা, ঐ করুণ চোখে ও কাহার পানে চায়।
বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে— এ কী দশা হায়।
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে—
কে ওরে বাঁচায়॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্যে কালীপ্রতিমা

বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাল্মীকি। রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা!
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর— ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লব করো,
রণরঙ্গে মাতো, মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িত-অসি,
ছুটাও শোণিতস্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উরো কালী কপালিনী, মহাকালসীমন্তিনী,
লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা॥

বালিকাকে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। দেখো হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড়ো সরেস পেয়েছি বলি সরেস—
এমন সরেস মছলি, রাজা, জালে না পড়ে ধরা।
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেলো ত্বরা॥

বাল্মীকি। নিয়ে আয় কৃপাণ। রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও— যা ত্বরায়।
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িত খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়॥

বালিকা। কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়।
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়—
রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়।
দয়া করো অনাথারে— কে আমার আছে—
বন্ধনে কাতরতনু মরি যে ব্যথায়।

নেপথ্যে বনদেবী। দয়া করো অনাথারে দয়া করো গো—
বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যথায়॥

বাল্মীকি। এ কেমন হল মন আমার!
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে।
পাষাণহৃদয় গলিল কেন রে!
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে॥

প্রথম দস্যু। আরে, কী এত ভাবনা কিছু তো বুঝি না।
দ্বিতীয় দস্যু। সময় বহে যায় যে।
তৃতীয় দস্যু। কখন্ এনেছি মোরা, এখনো তো হল না।
চতুর্থ দস্যু। এ কেমন রীতি তব, বাহ্ রে।
বাল্মীকি। না না হবে না, এ বলি হবে না—
অন্য বলির তরে যা রে যা।
প্রথম দস্যু। অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব!
দ্বিতীয় দস্যু। এ কেমন কথা কও, বাহ্ রে॥
বাল্মীকি। শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে।
বাঁধন কর ছিন্ন,
মুক্ত কর এখনি রে॥

যথাদিষ্ট কৃত

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বাল্মীকি। ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
ভ্রমি একেলা শূন্যমনে।

কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ
জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষণে ॥

প্রস্থান

দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্বার ধরিয়া আনিয়া

ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই,
এমন শিকার ছাড়ব না।
হাতের কাছে অম্‌নি এল, অম্‌নি যাবে!
অম্‌নি যেতে দেবে কে রে!
রাজাটা খেপেছে রে, তার কথা আর মানব না।
আজ রাতে ধুম হবে ভারী— নিয়ে আয় কারণবারি,
জ্বেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পুজো দেব
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে— রাজাটা খেপেছে রে,
তার কথা আর মানব না ॥

প্রথম দস্যু। রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজির, কোতোয়াল তুমি,
ওই ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ।
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে।
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর্ তোরা সব যে যার কাজ ॥

দ্বিতীয় দস্যু। আছে তোমার বিদ্যে-সাধ্যি জানা।
রাজত্ব করা, এ কি তামাশা পেয়েছ।

প্রথম দস্যু। জানিস নে কেটা আমি।

দ্বিতীয় দস্যু। ঢের ঢের জানি— ঢের ঢের জানি—

প্রথম দস্যু। হাসিস নে হাসিস নে মিছে, যা যা—
সব আপন কাজে যা যা,
যা আপন কাজে।

দ্বিতীয় দস্যু। খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা।
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে॥

তৃতীয় দস্যু। আঃ কাজ কী গোলমালে, নাহয় রাজাই সাজালে।
মরবার বেলায় মরবে ওটাই, আমরা সব থাকব ফাঁকতালে।

প্রথম দস্যু। রাম রাম! হরি হরি! ওরা থাকতে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখলে, বাবা, ঢুকব আড়ালে।

সকলে। ওরে চল্ তবে শিগ্‌গিরি,
আনি পূজার সামিগ্‌গিরি।
কথায় কথায় রাত পোহালো, এমনি কাজের ছিরি॥

প্রস্থান

বালিকা। হায়, কী দশা হল আমার!
কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো।
মুহূর্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে—
জনমের মতো বিদায়॥

পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ
ও কালীপ্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী!
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে, চমকে ধরণী।
ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ মা, সন্তানের মিনতি।
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা ত্রিনয়নী॥

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। অহো! আস্পর্ধা একি তোদের নরাধম!
তোদের কারেও চাহি নে আর, আর, আর না রে—
দূর দূর দূর, আমারে আর ছুঁস নে।
এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি— সব ছাড়িনু।

প্রথম দস্যু। দীন হীন এ অধম আমি, কিছুই জানি নে রাজা।
এরাই তো যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে বোঝাই বোঝে না।
কী করি, দেখো বিচারি।

দ্বিতীয় দস্যু। বাঃ— এও তো বড়ো মজা, বাহবা!
যত কুয়ের গোড়া ওই তো, আরে বল্‌-না রে।

প্রথম দস্যু। দূর দূর দূর, নির্লজ্জ, আর বকিস নে।

বাল্মীকি। তফাতে সব সরে যা। এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি— সব ছাড়িনু॥

দস্যুগণের প্রস্থান

বাল্মীকি। আয়, মা, আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।
কত দুঃখ পেলি বনে, আহা, মা আমার!
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি, মা, সহিতে পারি—
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার॥

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বনদেবীগণের প্রবেশ

রিম্‌ ঝিম্‌ ঘন ঘন রে বরষে।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে॥

প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে।

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে।
আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে—
কেমনে যাবে বেদনা।
ধরি ধনু আনি বাণ গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে॥

শৃঙ্গধ্বনিপূর্বক দস্যুগণকে আহ্বান

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যু। কেন রাজা, ডাকিস কেন, এসেছি সবে।
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পুজো হবে?
বাল্মীকি। শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে।
প্রথম দস্যু। ওরে, রাজা কী বলছে শোন্।
সকলে। শিকারে চল্ তবে।
সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে॥

বাল্মীকির প্রস্থান

এই বেলা সবে মিলে চলো হো, চলো হো!
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়,
এমন রজনী বহে যায় যে।
ধনুর্বাণ বল্লম লয়ে হাতে আয় আয় আয় আয় রে।
বাজা শিঙা ঘন ঘন, শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখি সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে—
চারি দিকে ঘিরে যাব পিছে পিছে
হো হো হো হো॥

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে।
তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী বরাহ খোঁজ্‌ গে—
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশু সবে এখনি বাহির হবে,
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্‌ ত্বরা চল্‌।
জ্বালায়ে মশাল-আলো এই বেলা আয় রে॥

প্রস্থান

প্রথম দস্যু। চল্‌ চল্‌ ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয় দস্যু। প্রাণপণ খোঁজ্‌ এ বন, সে বন—
চল্‌ মোরা ক'জন ও দিকে যাই।
প্রথম দস্যু। না না ভাই, কাজ নাই।
হোথা কিছু নাই, কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
দ্বিতীয় দস্যু। বরা বরা!
প্রথম দস্যু। আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার।
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয় ওই অশথতলায়।
এবার ঠিকঠাক হয়ে সবে থাক্‌—
সাবধান ধরো বাণ, সাবধান ছাড়ো বাণ,
গেল গেল ঐ, পালায় পালায়, চল্‌ চল্‌।
ছোট্‌ রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই॥

বনদেবীগণের প্রবেশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া,

ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া।
তরাসে চমকিয়ে হরিণহরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে—
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে।
আকুল সরসী, সারসসারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া॥

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

প্রথম দস্যু। প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে, করবি এখন কী।
ওরে বরা, করবি এখন কী।
বাবা রে, আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদখানা দেখেও কি রে ভড়কালি না।
বাহবা! শাবাশ তোরে, শাবাশ রে তোর ভরসা দেখি॥

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর-একজন
দস্যুর প্রবেশ

অন্য দস্যু। বলব কী আর বলব খুড়ো— উ উ—
আমার যা হয়েছে বলি কার কাছে—
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ।
প্রথম দস্যু। তখন যে ভারী ছিল জারিজুরি,
এখন কেন করছ, বাপু, উ উ উ—
কোন্‌খানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ॥

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। সর্দারমশায় দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই বসে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধো কষে।
বনবাদাড় সব ঘেঁটেঘুঁটে
আমরা মরি খেটেখুটে,
তুমি কেবল লুটেপুটে
পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে!

প্রথম দস্যু। কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি।
শিকার করতে যায় কে মরতে—
ঢুঁসিয়ে দেবে বরা-মোষে।
ঢু খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে॥

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ

বাল্মীকি। রাখ্ রাখ্, ফেল ধনু, ছাড়িস নে বাণ॥
হরিণশাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণনয়ান।
কোনো দোষ করে নি তো, সুকুমার কলেবর—
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর!
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ॥

প্রস্থান

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। আর না, আর না, এখানে আর না—
আয় রে সকলে চলিয়া যাই।
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল্ চল্ চল্ এখনি যাই॥

বাল্মীকির প্রবেশ

দস্যুগণ। তোর দশা, রাজা, ভালো তো নয়—
রক্তপাতে পাস রে ভয়—
লাজে মোরা মরে যাই।
পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ—
হেন কভু দেখি নাই॥

দস্যুগণের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বাল্মীকি। জীবনের কিছু হল না হায়—
হল না গো হল না, হায় হায়।
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আঁধারে।
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো, পারি না আর।
কী লয়ে এখন ধরিব জীবন, দিবসরজনী চলিয়া যায়—
দিবসরজনী চলিয়া যায়—
কত কী করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কী করিব জানি না গো।
সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা। ধনুর্বাণ ত্যেজেছি,
কোনো আর নাহি কাজ—

'কী করি কী করি' বলি হাহা করি ভ্রমি গো—
কী করিব জানি না যে ॥

ব্যাধগণের প্রবেশ

প্রথম ব্যাধ। দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি বসেছে গাছে।
দ্বিতীয় ব্যাধ। আয় দেখি চুপিচুপি আয় রে কাছে।
প্রথম ব্যাধ। আরে, ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ।
দ্বিতীয় ব্যাধ। রোস্, রোস্, আগে আমি করি রে সন্ধান।
বাল্মীকি। থাম্ থাম্, কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ।
দুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান।
প্রথম ব্যাধ। রাখো মিছে ও-সব কথা,
কাছে মোদের এস নাকো হেথা,
চাই নে ও-সব-শাস্তর-কথা— সময় বহে যায় যে।
বাল্মীকি। শোনো শোনো, মিছে রোষ কোরো না।
ব্যাধ। থামো থামো ঠাকুর— এই ছাড়ি বাণ ॥

একটি ক্রৌঞ্চকে বধ

বাল্মীকি। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

—

কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণী রে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কী! হৃদয়ে এ কী এ দেখি!
ঘোর অন্ধকারমাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়—
অবাক্! করুণা এ কার ॥

সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি। এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা।

কী প্রতিমা দেখি এ— জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে আ মরি কমলপুতলা ॥

ব্যাধগণের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বনদেবী। নমি নমি, ভারতী, তব কমলচরণে।
পুণ্য হল বনভূমি, ধন্য হল প্রাণ।

বাল্মীকি। পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা—
ধন্য হল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ।

বনদেবী। কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে—
হৃদয়কমলে চরণকমল করো দান।

বাল্মীকি। তব কমলপরিমলে রাখো হৃদি ভরিয়ে—
চিরদিবস করিব তব চরণসুধাপান ॥

দেবীগণের অন্তর্ধান

কালী-প্রতিমার প্রতি

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী তুই, না বুঝে মা বলেছি মা!
এত দিন কী ছল করে তুই পাষাণ করে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন-জলে গলেছি মা!
কালো দেখে ভুলি নে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন—
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা!
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাল্মীকি। কোথা লুকাইলে!
সব আশা নিভিল, দশ দিশি অন্ধকার।
সবে গেছে চলে ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে ॥

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

লক্ষ্মী। কেন গো আপনমনে ভ্রমিছ বনে বনে,
সলিল দু নয়নে কিসের দুখে!
কমলা দিতেছে আসি রতন রাশি রাশি,
ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে।
কমলা যারে চায় বলো সে কী না পায়,
দুখের এ ধরায় থাকে সে সুখে।
ত্যেজিয়া কমলাসনে এসেছি এ ঘোর বনে,
আমারে শুভক্ষণে হেরো গো চোখে॥

বাল্মীকি। কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা—
তুমি তো নহ সে দেবী কমলাসনা।
কোরো না আমারে ছলনা।
কী এনেছ ধন মান! তাহা যে চাহে না প্রাণ।
দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না-
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
আমি, দেবী, সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না, এসো না—
এসো না এ দীনজনকুটিরে।
যে বীণা শুনেছি কানে মন প্রাণ আছে ভোর—
আর কিছু চাহি না, চাহি না।

লক্ষ্মীর অন্তর্ধান

বাল্মীকির প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী,
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অয়ি!

স্বপনসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা—
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা !
তোমারে চাহি ফিরিছে হেরো কাননে কাননে ওই ॥

বনদেবীগণের প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ

সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি। এই-যে হেরি গো দেবী আমারি !
সব কবিতাময় জগত-চরাচর, সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে, জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে।
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী,
আলোকে আলো আঁধারি।
আজি মলয় আকুল বনে বনে একি গীত গাহিছে ;
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী, নব রাগরাগিণী উছাসিছে—
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি।
তুমিই কি দেবী ভারতী ! কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে—
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে।
তুমি ধন্য গো ! রব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি ॥

সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে
গলাতে পাষাণ তোর মন—
কেন, বৎস, শোন্ তাহা শোন্ !
আমি বীণাপাণি তোরে এসেছি শিখাতে গান—
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণপ্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারি দিকে দিক্‌বধূ আকুল নয়নজলে।

মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়
শত স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম রবে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্যস্রোত রবে।
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি, মরুভূমি উর্বরিয়া।
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবি-বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার—
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

সকলে। মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি
প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।
দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।
তৃতীয়া। মোরা মদিরতরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে।
প্রথমা। দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে
আধো-তানে ভাঙা-গানে
ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।
তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।
প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে
আনি মান-অভিমান।
দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। চলো সখী, চলো।
কুহকস্বপনখেলা খেলাবে চলো।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেমছল
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো, যাও কোথা যাও।
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও কারে চাও।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী।
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপুরী-পানে ধাও।
কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও।

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত!
নবীনবাসনাভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।
সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে।
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

শান্তার প্রতি

অমর। যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে,
তেমনি আমিও, সখী, যাব—
না জানি কোথায় দেখা পাব।

কার সুধাস্বরমাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে।
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত।
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত।

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। মনের মতো কারে খুঁজে মর—
সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।

নেপথ্যে চাহিয়া

শান্তা। আমার পরান যাহা চায়,
তুমি তাই তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে—
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস—
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর-কারে ভালোবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও—
আমি যত দুখ পাই গো॥

নেপথ্যে চাহিয়া

মায়াকুমারীগণ। কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
প্রথমা। মনের মতো কারে খুঁজে মর—
দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে।
তৃতীয়া। ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
প্রথমা। তোমার আপনার যে জন দেখিলে না তারে
দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে।
তৃতীয়া। যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তা'ও॥

তৃতীয় দৃশ্য

কানন

প্রমদার সখীগণ

প্রথমা। সখী, সে গেল কোথায়,
তারে ডেকে নিয়ে আয়।
সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।
প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়।
দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে—
সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুলতায়॥

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুলফুলহার।
আধফুট জুঁইগুলি যতনে আনিয়ে তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল,
কপোলে পড়িছে বারেবার।

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন,
আনন্দে বিবশা যেন—

দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে!

প্রথমা। সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা—
তরুণ তনু এত রূপরাশি বহিতে পারে না বুঝি আর॥

তৃতীয়া। সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা
এ কি আর ভালো লাগে!
আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে।
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন—
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে।
সখী, তরল কোমল নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সখী, সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে,

মরমের আলো কপোলে ফুটিবে
শরম-অরুণ রাগে ॥

প্রমদা। ওলো, রেখে দে, সখী, রেখে দে—
মিছে কথা ভালোবাসা।
সুখের বেদনা, সোহাগযাতনা—
বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,
'লহো লহো' ব'লে পরে আরাধন—
পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রুসাগরে ভাসা—
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা ॥

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।

কুমারের প্রবেশ

প্রমদার প্রতি

কুমার। যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে—
দাঁড়াও বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে।
চঞ্চলসমীরসম ফিরিছ কেন
কুসুমে কুসুমে কাননে কাননে।
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে—

তুমি গঠিত যেন স্বপনে।
এসো হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,
ধরিয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবসনিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেমশয়নে॥

প্রমদা। কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই॥
পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা-হুতাশ—
চকিতে শুনিতে শুধু পাই— চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই॥

অশোকের প্রবেশ

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি—
যারে ভালো বেসেছি!
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে—
রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে—
নাহয় দলে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি॥

প্রমদা। ওকে বলো, সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল—
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল!
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা—
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল।

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল-
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল।
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—
ফিরে যাই এই বেলা চলো সখী, চলো॥

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।
এ সুখধরণীতে কেবলই চাহ নিতে,
জান না হবে দিতে আপনা—
সুখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি,
বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি—
পরান পড়ে আসি বাঁধনে॥

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

অমর কুমার ও অশোক

অমর। আমি মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ডাকে॥

অশোক। তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো।
কেন বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা।

কেমনে সে হেসে চলে যায়,
কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান!
এত ব্যথাভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না—
প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হত
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান।
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে—
তবু তার সংশয় হত অবসান

কুমার। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে।

অমর। অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হা-হা রবে,
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো—
কেন গো নিতে চাও মন তবে।
স্বপনসম সব জানিয়ো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে—
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।

কুমার। তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে
থাক্ সে আপনার গরবে।

অশোক। আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।

যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারি নে দূরে যেতে, মরিতে আসি-
লই গো বুক পেতে অনলবাণ।
যতই হাসি দিয়ে দহন করে
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃতধারা যতই যাচি
ততই করে প্রাণে অশনি দান॥

অমর। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন—
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।

অমর ও কুমার। ওগো, কেন—
ওগো, কেন মিছে এ দুরাশা।

অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়ামরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।

অমর ও কুমার। ওগো, কেন—
ওগো, কেন মিছে এ পিপাসা।

অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে।
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিলকূজিত কুঞ্জ।

অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
একি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহুপ্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে।

অমর ও কুমার। তবে কেন—
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা॥

মায়াকুমারীগণ। দেখো চেয়ে দেখো ওই কে আসিছে।
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে।
হৃদয়দুয়ার খুলিয়ে দাও,
প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ-সাথে তার সুবাস ভাসিছে॥

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

প্রমদা। সুখে আছি সুখে আছি, সখা, আপন-মনে।
প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ,
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।
প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো,
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়।
এই মাধুরীধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি।
অশোক। ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
কুমার। মন দাও দাও, দাও সখী, দাও পরের হাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো—
আনো সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়নপাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,

সুখ পায় তায় সে।

চির কলিকাজনম কে করে বহন চিরশিশিররাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

অমর। ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে।

গোপন হৃদয়তলে কী জানি কিসের ছলে

আলোক হানে।

এ প্রাণ নূতন ক'রে কে যেন দেখালে মোরে,

বাজিল মরমবীণা নূতন তানে।

এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল—

তৃষাভরা তৃষাহরা এ অমৃত কোথা ছিল।

কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখি গান গাহে,

কোন্ সমীরণ বহে লতাবিতানে॥

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে,

কেন আসে না কাছে।

ওলো যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে

ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

সখীগণ। ছী, ওলো ছী, হল কী, ওলো সখী।

প্রথমা। লাজবাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে শরম টুটিল।

তৃতীয়া। কেমনে যাব, কী শুধাব।

প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।

প্রমদা। ওলো যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে

ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে॥

মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে

দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া।

দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

অমরের প্রতি

সখীগণ। ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও—

তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর।

অমর। আমি কী যেন করেছি পান—

কোন্ মদিরারসভোর।

আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।

সখীগণ। ছি ছি ছী।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।

এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলামন—

কেহ সচেতন, কেহ অচেতন—

কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,

কাহারো নয়নে লোর—

আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর।

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়

হেথা দাঁড়ায়ে তরুছায়।

অমর। সখী, অবশ হৃদয়ভারে চরণ

চলিতে নাহি চায়,

তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

সখীগণ। ছি ছি ছী।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।

এ ভবে কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,

কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো

চরণে পড়েছে ডোর।

কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর॥

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না— চলে আয়, চলে আয়।

ও কী কথা যে বলে সখী, কী চোখে যে চায়।

চলে আয়, চলে আয়।

লাজ টুটে শেষে মরি লাজে মিছে কাজে।

ধরা দিবে না যে বলো কে পারে তায়।

আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে আয়, চলে আয়॥

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধো ঘুমঘোর, আধো জাগরণ,
চোখোচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ
কুহুস্বরে পিক গাহিয়া—
দেখে দেখো, সখী, চাহিয়া॥

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

অমর। দিবসরজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
'কে আসিছে' ব'লে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখি।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই,
থাকি স্বপনের আশে—
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়
বাঁধিব স্বপনপাশে।

এত ভালোবাসি এত যারে চাই
মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি ॥

প্রমদা সখীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার। সখী, সাধ করে যাহা দিবে তাই লইব।
সখীগণ। আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।
কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব।
সখী। দেয় যদি কাঁটা?
কুমার। তাও সহিব।
সখীগণ। আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।
কুমার। যদি একবার চাও, সখী, মধুর নয়ানে
ওই আঁখি-সুধা-পানে চিরজীবন মাতি রহিব।
সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে?
কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব।
সখীগণ। আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন ॥
প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ।
সে তো এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ।
সে কি মোর তরে পথ চাহে—
সে কি বিরহগীত গাহে
যার বাঁশরিধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ।

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরমবেদনা।

প্রমদার প্রতি

অশোক। ওগো সখী, দেখি দেখি মন কোথা আছে।
সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরো কারে যাচে।
অশোক। কী মধু, কী সুধা, কী সৌরভ,
কী রূপ রেখেছ লুকায়ে!
সখীগণ। কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে!
অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে, এ কাননে পথ না পায়
সখীগণ। যারা এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে॥
প্রমদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়।
এ যে হৃদয়দহনজ্বালা সখী।
এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা,
এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা।
কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই-যাই করে প্রাণ— যেতে পারি নে।
যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি—
কোথা যে নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা।
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা॥
প্রথমা সখী। সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে
আমাদের সখী যারে মনপ্রাণ সঁপেছে।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে!
প্রথমা। ওই-যে তরুতলে বিনোদমালা গলে

না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—

ও কি কাছে আসিবে কভু! কথা কবে!

তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে! ও কি বাঁধন মানে!

ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে।

দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখিপানে চায়,

যেন কোন্ পথ ভুলে এল কোথায় ওগো!

তৃতীয়া। যেন কোন্ গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভরে,

যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে॥

অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে।

ভুলিব না এ জীবনে কী স্বপনে কী জাগরণে।

তুমি জান বা না জান,

মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে

হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।

আমি প্রকাশিতে পারি নে,

শুধু চাহি কাতর নয়নে॥

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে।

প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে যদি আপনি কাঁদিলে।

দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও মন রাখো গোপনে।

তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে।

সকলে। কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না।

কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না।

প্রথমা। হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়।

দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে।

নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

অমর। সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে

সে কি ফিরাতে পারে সখী!

সংসারবাহিরে থাকি জানি নে কী ঘটে সংসারে।
কে জানে হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কি না পায়, জানি নে—
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা-হৃদয়-দ্বারে।
তোমার সকলি ভালোবাসি— ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি—
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে॥

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা।

দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না।

প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন।
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না।

সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা—
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা—

দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও।

প্রথমা। জীবনের আনন্দপথ ছেড়ে দাঁড়াও।

তৃতীয়া। দূর হতে করো পূজা হৃদয়কমল-আসনা॥

অমর। তবে সুখে থাকো সুখে থাকো— আমি যাই— যাই।

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।

সখীগণ। অধীরা হয়ো না, সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।

অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়।
হেথাকার পথ জানি নে— ফিরে যাই।
যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই।

প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে।
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই।

সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে॥

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে শরমে বাধিল, মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরমবেদনা।
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ—
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ—
মেলিতে নয়ন মিলালো স্বপন, এমনি প্রেমের ছলনা॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৃহ

শান্তা। অমরের প্রবেশ

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল—
সেই রবি শশী তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যাসমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন।
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ।

শান্তার প্রতি

এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়ে—
শীতল স্নেহসুধা করো দান,
দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নূতন জীবন॥

মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এসো কাছে।

ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে।
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পার নি ভালো,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে॥

শান্তা। দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না।
আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না।
তুমি যাহে সুখী হও তাই করো সখা,
আমি সুখী হব ব'লে যেন হেসো না।
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো—
কী হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই—
আমার অদৃষ্টস্রোতে তুমি ভেসো না॥

অমর। ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।
এবার জেগেছি, জেনেছি—
এবার আর ভুল নয়, ভুল নয়।
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে।
জেনেছি স্বপন সব মিছে।
বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে—
এ তো ফুল নয়, ফুল নয়!
পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন।
ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখী,
অতল সাগর এ সংসার—
এ তো কূল নয়, কূল নয়॥

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

দূর হইতে

সখীগণ। অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে—

তবে তো ফুল বিকাশে।

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ,
নিশি দিন রহো পাশে।

দ্বিতীয়া। ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয়রতন-আশে।

সকলে। ফিরে এসো ফিরে এসো, বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে॥

অমর। ওই কে আমায় ফিরে ডাকে।
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে।

মায়াকুমারীগণ। বিদায় করেছ যারে নয়নজলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো।
আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুসুমবনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে?
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো।

অমর। আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা।
কাহার মনের কথা মনেই থাকে।
আমি শুধু বুঝি, সখী, সরল ভাষা—
সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা।
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে॥

মায়াকুমারীগণ। সেদিনো তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশ দিশি কুসুমদলে।
দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানি,
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো।

অমরের প্রতি

শান্তা। না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে!

ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরান জলে!
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা,
দেখ নি ফিরে—
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে॥

অমর। আমি কারেও বুঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাই নি তো কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে— কে লইবে ডাকি
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবলই তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে॥

প্রস্থান

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহবিধুর হিয়া মরিল ঝুরে।
ম্লান শশী অস্তে গেল, ম্লান হাসি মিলাইল—
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে।

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। চল্ সখী, চল্ তবে ঘরেতে ফিরে—
যাক ভেসে ম্লান আঁখি নয়ননীরে।
যাক ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক্ আশা অবসান—
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে॥

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে।

ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল—
চিরদিন তৃষাকুল পরান জ্বলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো॥

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর শান্তা অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

স্ত্রীগণ। এস' এস', বসন্ত, ধরাতলে।
আন' কুহুকুহু কুহুতান, প্রেমগান,
আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আন' নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে।

পুরুষগণ। এস' থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত
নবপল্লবপুলকিত
ফুল-আকুল-মালতিবল্লি-বিতানে—
সুখছায়ে মধুবায়ে এস' এস'।
এস' অরুণচরণ কমলবরণ
তরুণ উষার কোলে।
এস জ্যোৎস্নাবিবস নিশীথে,
কলকল্লোল-তটিনী-তীরে—
সুখসুপ্ত সরসীনীরে এস' এস'॥

স্ত্রীগণ। এস' যৌবনকাতর হৃদয়ে,
এস' মিলনসুখালস নয়নে,
এস' মধুর শরমমাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি,
নবীন কুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাঁধন॥

শান্তার প্রতি

অমর। মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে।
কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরনছটাতে।
হেরো পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী,
যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে।
পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে॥

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে
মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।

পুরুষগণ। ফুলগন্ধে পাগল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে—

স্ত্রীগণ। তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে।

পুরুষগণ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন।

স্ত্রীগণ। চিরদিন হেরিব হে
মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি॥

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

প্রমদার প্রতি

শান্তা। আহা, কে গো তুমি মলিনবয়নে
আধোনিমীলিত নলিননয়নে
যেন আপনারি হৃদয়শয়নে
আপনি রয়েছ লীন।

পুরুষগণ। তোমা তরে সবে রয়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারি সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারা দিন।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছ এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে—
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি।

পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া॥

সখীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়,
সখীর হৃদয় কুসুমকোমল—
কার অনাদরে আজি ঝরে যায়!
কেন কাছে আস', কেন মিছে হাস',
কাছে যে আসিত সে তো আসিতে না চায়।
সুখে আছে যারা সুখে থাক্ তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক সারা—
দুখিনী নারীর নয়নের নীর
সুখীজনে যেন দেখিতে না পায়।
তারা দেখেও দেখে না,
তারা বুঝেও বুঝে না,

তারা ফিরেও না চায় ॥

শান্তা। আমি তো বুঝেছি সব, যে বোঝে না-বোঝে,
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে।
আপনি বিরহ গড়ি আপনি রয়েছে পড়ি,
বাসনা কাঁদিছে বসি হৃদয়সরোজে।
আমি কেন মাঝে থেকে দুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে ॥

প্রমদার প্রতি

অশোক। এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে—
ভালো যারে বাস তারে আনিব ফিরে।
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা—
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ননীরে ॥

শান্তা ও স্ত্রীগণ। চাঁদ হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

পুরুষগণ। কত দুখে কত দূরে আঁধারসাগর ঘুরে
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে।
মিলন দেখিবে বলে ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারি ধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে।

সকলে। চাঁদ হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে ॥

প্রমদা। আর কেন, আর কেন
দলিত কুসুমে বহে বসন্তসমীরণ।
ফুরায়ে গিয়েছে বেলা— এখন এ মিছে খেলা—
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ।

সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন মুছাতে এলে
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে!

প্রমদা। এই লও, এই ধরো— এ মালা তোমরা পরো—
এ খেলা তোমরা খেলো, সুখে থাকো অনুক্ষণ ॥

অমর। এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়নজলে
এ মলিন মালা কে লইবে।
ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়তলে,
এ চিরবিষাদ কে বহিবে।
সুখনিশি অবসান— গেছে হাসি, গেছে গান—
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে
নীরব নিরাশা কে সহিবে॥

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব।
আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন,
তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।
ভুল-ভাঙা দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে—
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব॥

অমর ও শান্তার প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়—
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়।
নয়নসলিলে যে হাসি ফুটে গো,
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়॥

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে।
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলি নে।

সখীগণ। সংসার কঠিন বড়ো— কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে আর যে যায় সে যায়—
কারো তরে ফিরেও না চায়।

প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও ম্লানমুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও—

থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে—
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না॥

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ

সকলে। এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।
প্রথমা। শুধু সুখ চলে যায়।
দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা।
তৃতীয়া। এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়।
সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান।
প্রথমা। তাই এত হায়-হায়।
দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়।
সকলে। সখী, চলো, গেল নিশি, স্বপন ফুরালো,
মিছে আর কেন বলো।
প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল।
সকলে। সখী, চলো।
প্রথমা। প্রেমের কাহিনী গান হয়ে গেল অবসান।
দ্বিতীয়া। এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল॥

চিত্রাঙ্গদা

ভূমিকা

প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে।
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।

তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণ বৈচিত্র্যে—
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত।
একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীতে আছে—
প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়॥

মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা; শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবনকুঞ্জবনে।
এল হৃদয়শিকারে,
এল গোপন পদসঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণবিজড়িত অন্ধকারে।

পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্যপরীক্ষা,
হানে সাধুর সাধনদীক্ষা,
সর্বনাশের বেড়াজাল
বেষ্টিল চারি ধারে।

এসো সুন্দর নিরলঙ্কার,
এসো সত্য নিরহঙ্কার—
স্বপ্নের দুর্গ হানো,
আনো, আনো মুক্তি আনো—
ছলনার বন্ধন ছেদি
এসো পৌরুষ-উদ্ধারে॥

১

প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার শিকার-আয়োজন

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে,
অরণ্যে তমশ্ছায়া।
মুখর নির্ঝরকলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীরু
হরিণদম্পতি।
চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্নরেখাশ্রেণী
রেখে গেছে ওই পথপঙ্ক-'পরে,
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান॥

বনপথে অর্জুন নিদ্রিত

শিকারের বাধা মনে করে চিত্রাঙ্গদার সখী তাঁকে তাড়না করলে

অর্জুন। অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা!
অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা
সে কোনখানে পাবে তার আশ্রয়!
চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!

বালকবেশীদের দেখে সকৌতুক অবজ্ঞায়

অর্জুন। হাহাহাহা হাহাহাহা, বালকের দল,
মা'র কোলে যাও চলে— নাই ভয়।
অহো, কী অদ্ভুত কৌতুক।

প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!
ফিরে এসো, ফিরে এসো—
ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসম্মান,
যুদ্ধে করো আহ্বান!

বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরব
করি যেন অনুভব—
অর্জুন! তুমি অর্জুন॥

হা হতভাগিনী, একি অভ্যর্থনা মহতের,
এল দেবতা তোর জগতের,
গেল চলি,
গেল তোরে গেল ছলি—
অর্জুন! তুমি অর্জুন॥

সখীগণ। বেলা যায় বহিয়া, দাও কহিয়া
কোন্ বনে যাব শিকারে।
কাজল মেঘে সজল বায়ে
হরিণ ছুটে বেণুবনচ্ছায়ে॥

চিত্রাঙ্গদা। থাক্ থাক্, মিছে কেন এই খেলা আর।
জীবনে হল বিতৃষ্ণা, আপনার ’পরে ধিক্কার।

আত্ম-উদ্দীপনার গান

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয়, আয় রে আমার
শুকনো পাতার ডালে
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের ’পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে—
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে॥

সখী। সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি!
এক পলকের আঘাতেই
খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়।
রবিকরপাতে কোরকের আবরণ টুটি
মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে॥

চিত্রাঙ্গদা। বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে!
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যলোকে!
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি,
ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে—
জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে।
অস্ফুটমঞ্জরী কুঞ্জবনে,
সঙ্গীতশূন্য বিষণ্ণ মনে
সঙ্গীরিক্ত চিরদুঃখরাতি
পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি!
সুন্দর হে, সুন্দর হে,
বরমাল্যখানি তব আনো বহে, তুমি আনো বহে।
অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে॥

প্রস্থান

বন্ধু অনুচরদের সঙ্গে অর্জুনের প্রবেশ ও নৃত্য

২

সখীদের গান

যাও, যাও যদি যাও তবে—
তোমায় ফিরিতে হবে—
হবে হবে।

ব্যর্থ চোখের জলে
আমি লুটাব না ধূলিতলে, লুটাব না।
বাতি নিবায়ে যাব না, যাব না, যাব না
জীবনের উৎসবে।
মোর সাধনা ভীরু নহে,
শক্তি আমার হবে মুক্ত দ্বার যদি রুদ্ধ রহে।
বিমুখ মুহূর্তেরে করি না ভয়—
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়,
দিনে দিনে হৃদয়ের গ্রন্থি তব
খুলিব প্রেমের গৌরবে॥

সখিসহ স্নানে আগমন

চিত্রাঙ্গদা। ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
মন রয় না—
চঞ্চল প্রাণ।
ভাসায়ে দিব আপনারে ভরা জোয়ারে,
সকল-ভাবনা-ডুবানো ধারায় করিব স্নান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ।
ঢেউ দিয়েছে জলে—
ঢেউ দিল, ঢেউ দিল, ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।
একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে, এই বাতাসে
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান।
দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে গুঞ্জরতান

সখীদের প্রতি

দে তোরা আমায় নূতন ক'রে দে নূতন আভরণে।

হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি—
বসন্তে হোক দৈন্যবিমোচন নবলাবণ্যধনে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক পল্লব-আবরণে।

সখীগণ। বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে
পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে
চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।
আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক
হিল্লোলে হিল্লোলে,
যৌবন পাক্ সম্মান বাঞ্ছিতসম্মিলনে॥

সকলের প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন
তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঙ্গদার নৃত্য

চিত্রাঙ্গদা। আমি তোমারে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন॥

অর্জুন। ক্ষমা করো আমায়— আমায়—
বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে— ব্রহ্মচারী ব্রতধারী॥

প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ
দীর্ঘকাল জীবনে আমার।
ধিক্ ধনুঃশর!
ধিক্ বাহুবল!
মুহূর্তের অশ্রুবন্যাবেগে
ভাসায়ে দিল যে মোর পৌরুষসাধনা।
অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে
বসন্তেরে করিল ব্যাকুল॥

—

রোদন-ভরা এ বসন্ত, সখী,
কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিমরাগে।

সখীগণ। তোমার বৈশাখে ছিল প্রখর রৌদ্রের জ্বালা,
কখন বাদল আনে আষাঢ়ের পালা।
হায় হায় হায়!

চিত্রাঙ্গদা। কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে।

সখীগণ। কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,
সহসা ঝরনা নামিল অশ্রুঢালা।
হায় হায় হায়!

চিত্রাঙ্গদা। দক্ষিণসমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।

সখীগণ। মৃগয়া করিতে বাহির হল যে বনে
মৃগী হয়ে শেষে এল কি অবলা বালা।
হায় হায় হায়!

চিত্রাঙ্গদা। আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে,
দেওয়া হল না যে আপনারে
এই ব্যথা মনে লাগে।

সখীগণ। যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে হায় মানিবার ডালা।
হায় হায় হায়॥

একজন সখী। ব্রহ্মচর্য!— পুরুষের স্পর্ধা এ যে!

নারীর এ পরাভবে
লজ্জা পাবে বিশ্বের রমণী।
পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয়।
জাগো হে অতনু,
সখীরে বিজয়দূতী করো তব,
নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র দাও তারে—
দাও তারে অবলার বল॥

মদনকে চিত্রাঙ্গদার পূজানিবেদন

চিত্রাঙ্গদা। আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারি পায়ে।
দিব কাঙালিনীর আঁচল
তোমার পথে পথে, পথে বিছায়ে।
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু
তারি ফুলে ফুলে, হে অতনু, তারি ফুলে
আমার পূজা-নিবেদনের দৈন্ত
দিয়ো দিয়ো দিয়ো ঘুচায়ে।
তোমার রণজয়ের অভিযানে
তুমি আমায় নিয়ো,
ফুলবাণের টিকা আমার ভালে
এঁকে দিয়ো দিয়ো—
রণজয়ের অভিযানে।
আমার শূন্যতা দাও যদি
সুধায় ভরি
দিব তোমার জয়ধ্বনি
ঘোষণ করি— জয়ধ্বনি—
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও
আমার কায়ে দক্ষিণবায়ে॥

মদনের প্রবেশ

মদন। মণিপুরনৃপদুহিতা
তোমারে চিনি তাপসিনী!
মোর পূজায় তব ছিল না মন,
তবে কেন অকারণ
তুমি মোর দ্বারে এলে তরুণী,
কহো কহো শুনি তাপসিনী!

চিত্রাঙ্গদা। পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা,
লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা—
কুসুমধনু,
অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু।
অর্জুন ব্রহ্মচারী
মোর মুখে হেরিল না নারী,
ফিরাইল, গেল ফিরে।
দয়া করো অভাগীরে—
শুধু এক বরষের জন্যে
পুষ্পলাবণ্যে
মোর দেহ পাক্ তব স্বর্গের মূল্য
মর্তে অতুল্য॥

মদন। তাই আমি দিনু বর,
কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর,
মম পঞ্চম শর—
দিবে মন মোহি,
নারীবিদ্রোহী সন্ন্যাসীরে
পাবে অচিরে—
বন্দী করিবে ভুজপাশে
বিদ্রূপহাসে।

মণিপুররাজকন্যা
কান্তহৃদয়বিজয়ে হবে ধন্যা ॥

৩

নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। এ কী দেখি!
এ কে এল মোর দেহে
পূর্ব-ইতিহাস-হারা!
আমি কোন্ গত জনমের স্বপ্ন!
বিশ্বের অপরিচিত আমি!
আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা—
আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল—
এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু,
তার পরে ধূলিশয্যা,
তার পরে ধরণীর চির-অবহেলা ॥

সরোবরতীরে

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায়, বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী
পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পূরে,
কী মাধুরীসুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি।
সহসা মনে জাগে আশা,
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি ॥

—

মীনকেতু,

কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়েছ বাঁধিয়া অঙ্গসহচরী করি।
এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত! ক্ষণিক যৌবনবন্যা
রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া উন্মাদ করেছে মোরে॥

নূতন কান্তির উত্তেজনায় নৃত্য

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা,
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা।
বহে মম শিরে শিরে   এ কী দাহ, কী প্রবাহ—
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা।
ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়,
দুরন্ত যৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে   দিগন্তে কাহার পানে,
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে—   নাহি নাহি কথা॥

—

এরে ক্ষমা কোরো সখা—
এ যে এল তব আঁখি ভুলাতে,
শুধু ক্ষণকালতরে মোহ-দোলায় দুলাতে,
আঁখি ভুলাতে।
মায়াপুরী হতে এল নাবি—
নিয়ে এল স্বপ্নের চাবি,
তব কঠিন হৃদয়দুয়ার খুলাতে,
আঁখি ভুলাতে॥

প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন।   কাহারে হেরিলাম! আহা!
সে কি সত্য, সে কি মায়া!

সে কি কায়া,
সে কি স্বর্ণকিরণে-রঞ্জিত ছায়া!

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

এসো এসো যে হও সে হও,
বলো বলো তুমি স্বপন নও, নও স্বপন নও।
অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা
বহে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা॥

চিত্রাঙ্গদা। তুমি অতিথি, অতিথি আমার।
বলো কোন্ নামে করি সৎকার॥

অর্জুন। পাণ্ডব আমি অর্জুন গাণ্ডীবধন্বা নৃপতিকন্যা!
লহো মোর খ্যাতি,
লহো মোর কীর্তি,
লহো পৌরুষগর্ব।
লহো আমার সর্ব॥

চিত্রাঙ্গদা। কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার,
এর কাছে মানিবে কি হার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্॥

বীর তুমি বিশ্বজয়ী,
নারী এ যে মায়াময়ী—
পিঞ্জর রচিবে কি এ মরীচিকার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।

লজ্জা, লজ্জা, হায় একি লজ্জা,
মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা।
এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ,
এ যে শুধু ক্ষণিকের অর্ঘ্য,
এই কি তোমার উপহার
ধিক্ ধিক্ ধিক্॥

অর্জুন। হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার
সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি।
পৌরুষের সে অধৈর্য
তাহারে গৌরব মানি আমি—
আমি তো আচারভীরু নারী নহি
শাস্ত্রবাক্যে-বাঁধা।
এসো সখী, দুঃসাহসী প্রেম
বহন করুক আমাদের
অজানার পথে॥

চিত্রাঙ্গদা। তবে তাই হোক
কিন্তু মনে রেখো,
কিংশুকদলের প্রান্তে এই-যে দুলিছে
একটু শিশির— তুমি যারে করিছ কামনা
সে এমনি শিশিরের কণা
নিমিষের সোহাগিনী॥

—

কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায়।
স্বপ্নের সাথি, এসো মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায়।
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে
বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে নৃত্যবিভঙ্গে,
মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়।

যে ফুলমালা দুলায়েছ আজি রোমাঞ্চিত বক্ষতলে,
মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া মোহের মদির জলে।
নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে
বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
দিন গত হলে নূতন প্রভাতে
মিলাবে ধুলার তলে কার অবহেলায়॥

অর্জুন। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়।
শুধু একা পূর্ণ তুমি,
সর্ব তুমি,
বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি,
অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি,
এক নারী— সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান—
সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম ॥

চিত্রাঙ্গদা। সে আমি যে আমি নই, আমি নই—
হায় পার্থ, হায়,
সে যে কোন্ দেবের ছলনা।
যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর।
শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পায়ে—
যাও যাও ফিরে যাও ॥

প্রস্থান

অর্জুন। এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ!
এ যে অগ্নিলতা পাকে পাকে
ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।
উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া ॥

—

অশান্তি আজ হানল একি দহনজ্বালা!
বিঁধল হৃদয় নিদয় বাণে বেদন-ঢালা।
বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা,
চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা,
মরণ-সুতোয় গাঁথল কে মোর বরণমালা।

চেনা ভুবন হারিয়ে গেল স্বপন-ছায়াতে,
ফাগুন-দিনের পলাশ-রঙের রঙিন মায়াতে।
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা—
পথ-হারানোর লাগল নেশা,
অচিন দেশে এবার আমার যাবার পালা॥

৪

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন—
এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন্, আর কতখন।
এ খেলা খেলাবে আর কতখন।
শেষ যাহা হবেই হবে, তারে
সহজে হতে দাও শেষ।
সুন্দর যাক রেখে স্বপ্নের রেশ।
জীর্ণ কোরো না, কোরো না, যা ছিল নূতন॥

মদন। না না না সখী, ভয় নেই সখী, ভয় নেই—
ফুল যবে সাঙ্গ করে খেলা
ফল ধরে সেই।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ
রেখে যাক মন্ত্রস্পর্শ
নবতর ছন্দস্পন্দন॥

প্রস্থান

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে—
নয়নে, নয়নে।

দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে
কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে মোদের মিলিত নয়নে—
নয়নে, নয়নে।
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো শুধু দুজনের আঁখিতে—
আঁখিতে, আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরি বাণীর বেদনা মিটিল দোঁহার নয়নে—
নয়নে, নয়নে॥

প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কেন রে ক্লান্তি আসে আবেশভার বহিয়া,
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীর্ণ অবসাদে কেন রে।
ছিন্ন করো এখনি বীর্যবিলোপী এ কুহেলিকা।
এই কর্মহারা কারাগারে রয়েছ কোন্ পরমাদে।
কেন রে॥

গ্রামবাসীগণের প্রবেশ

গ্রামবাসীগণ। হো, এল এল এল রে দস্যুর দল,
গর্জিয়া নামে যেন বন্যার জল— এল এল।
চল্ তোরা পঞ্চগ্রামী,
চল্ তোরা কলিঙ্গধামী,
মল্লপল্লী হতে চল্, চল্।
'জয় চিত্রাঙ্গদা' বল্, বল্ বল্ ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে।

অর্জুন। জনপদবাসী, শোনো শোনো,
রক্ষক তোমাদের নাই কোনো?

গ্রামবাসীগণ। তীর্থে গেছেন কোথা তিনি
গোপনব্রতধারিণী,
চিত্রাঙ্গদা তিনি রাজকুমারী।

অর্জুন। নারী! তিনি নারী!

গ্রামবাসীগণ। স্নেহবলে তিনি মাতা, বাহুবলে তিনি রাজা।
তাঁর নামে ভেরী বাজা,
'জয় জয় জয়' বলো ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে॥

—

সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ— আ! আহা!
মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়— আ! আহা!
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়— আ! আহা!
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়— আ! আহা॥

প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ॥

অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
কেমন না জানি
আমি তাই ভাবি মনে মনে।

শুনি স্নেহে সে নারী,
শুনি বীর্যে সে পুরুষ,
শুনি সিংহাসনা যেন সে সিংহবাহিনী।
জান যদি বলো প্রিয়ে, বলো তার কথা॥

চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ সে।
হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার,
হেন উজ্জ্বলকজ্জল আঁখিতারা।
সন্ধিতে পারে লক্ষ্য কিণাঙ্কিত তার বাহু,
বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ কুটিল কটাক্ষশরে।
নাহি লজ্জা, নাহি শঙ্কা, নাহি নিষ্ঠুরসুন্দর রঙ্গ,
নাহি নীরব ভঙ্গীর সঙ্গীতলীলা ইঙ্গিতছন্দোমধুর॥

অর্জুন। আগ্রহ মোর অধীর অতি—
কোথা সে রমণী বীর্যবতী।
কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা—
দারুণ সে, সুন্দর সে
উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে—
নহে সে ভোগীর লোচনলোভা,
ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা॥

সখীগণ। নারীর ললিত লোভন লীলায় এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি, সখা, খেলা হল অবসান।
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল
সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি—
সে কি স্বপ্নের দান,
সে কি সত্যের অপমান।
দূর দুরাশায় হৃদয় ভরিছ,
কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ,
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ পৌরুষসন্ধান।
এও কি মায়ার দান।

সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে
যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন -সমান ছিন্ন করি ফেলে ধূলিতলে,
সবে না সবে না সে নৈরাশ্য—
ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য
জানি জানি, সখা, ক্ষুব্ধ করিবে লুব্ধ পুরুষপ্রাণ—
হানিবে নিঠুর বাণ ॥

অর্জুন। যদি মিলে দেখা তবে তারি সাথে
ছুটে যাব আমি আর্তত্রাণে।
ভোগের আবেশ হতে
ঝাঁপ দিব যুদ্ধস্রোতে।
আজি মোর চঞ্চল রক্তের মাঝে
ঝন নন ঝন নন ঝঞ্চনা বাজে— বাজে— বাজে।
চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
একাধারে মিলিত পুরুষ নারী ॥

চিত্রাঙ্গদা। ভাগ্যবতী সে যে,
এত দিনে তার আহ্বান এল তব বীরের প্রাণে।
আজ অমাবস্যার রাতি হোক অবসান।
কাল শুভ শুভ্র প্রাতে দর্শন মিলিবে তার,
মিথ্যায় আবৃত নারী ঘুচাবে মায়া-অবগুণ্ঠন ॥

অর্জুনের প্রতি

সখী। রমণীর মন-ভোলাবার ছলাকলা
দূর ক'রে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াক নারী
সরল উন্নত বীর্যবন্ত অন্তরের বলে
পর্বতের তেজস্বী তরুণ তরু সম—
যেন সে সম্মান পায় পুরুষের।

রজনীর নর্মসহচরী
যেন হয় পুরুষের কর্মসহচরী,
যেন বামহস্তসম দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী।
তাহে যেন পুরুষের তৃপ্তি হয় বীরোত্তম॥

৫

চিত্রাঙ্গদা ও মদন

চিত্রাঙ্গদা। লহো লহো ফিরে লহো
তোমার এই বর
হে অনঙ্গদেব!
মুক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও
এই মিথ্যার জাল
হে অনঙ্গদেব!
চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে
তোমার পায়ে
আমার অঙ্গশোভা—
অধররক্ত-রাঙিমা যাক মিলায়ে
অশোকবনে হে অনঙ্গদেব!
যাক যাক যাক এ ছলনা,
যাক এ স্বপন হে অনঙ্গদেব॥

মদন। তাই হোক তবে তাই হোক,
কেটে যাক রঙিন কুয়াশা—
দেখা দিক শুভ্র আলোক।
মায়া ছেড়ে দিক পথ,
প্রেমের আসুক জয়রথ,
রূপের অতীত রূপ
দেখে যেন প্রেমিকের চোখ-

দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক মোহনির্মোক—
যাক খসে যাক, খসে যাক মোহনির্মোক ॥

প্রস্থান

বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে—
আভরণে আজি আবরণ কেন রবে।
ভালোবাসা যদি মেশে মায়াময় মোহে,
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে।
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে—
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে।
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে—
বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে।
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে—
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ॥

৬

চিত্রাঙ্গদার সহচর-সহচরীগণ
অর্জুনের প্রতি

এসো এসো পুরুষোত্তম, এসো এসো বীর মম !
তোমার পথ চেয়ে আছে প্রদীপ জ্বালা।
আজি পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা।
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার শক্তির অভিমান,
তোমার চরণে করিবে দান আত্মনিবেদনের ডালা—
চরণে করিবে দান।

আজ পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার
দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা ॥

সখী। হে কৌন্তেয়,
ভালো লেগেছিল ব'লে
তব করযুগে সখী দিয়েছিল ভরি সৌন্দর্যের ডালি
নন্দনকানন হতে পুষ্প তুলে এনে বহু সাধনায়।
যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা করো, প্রভু,
নির্মাল্যের সাজি থাক্ পড়ে মন্দিরবাহিরে।
এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে ॥

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী ॥

অর্জুন। ধন্য ধন্য ধন্য আমি ॥

সমবেত নৃত্য

তৃষ্ণার শান্তি সুন্দরকান্তি
তুমি এসো বিরহের সন্তাপভঞ্জন।
দোলা দাও বক্ষে, এঁকে দাও চক্ষে
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।

এনে দাও চিত্তে রক্তের নৃত্যে
বকুলনিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন—
উদ্‌বেল উতরোল
যমুনার কল্লোল,
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন।
আনো নবপল্লবে নর্তন উল্লোল,
অশোকের শাখা ঘেরি বল্লরীবন্ধন॥

—

এস' এস' বসন্ত ধরাতলে—
আন' মুহু মুহু নব তান,
আন' নব প্রাণ,
নব গান,
আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,
আন' বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা।
আন' নব উল্লাসহিল্লোল,
আন' আন' আনন্দছন্দের হিন্দোলা
ধরাতলে।
এস' এস'।
ভাঙ' ভাঙ' বন্ধনশৃঙ্খল,
আন' আন' উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা
ধরাতলে।
এস' এস'।
এস' থরথরকম্পিত
মর্মরমুখরিত
মধুসৌরভপুলকিত
ফুল-আকুল মালতিবল্লিবিতানে
সুখছায়ে মধুবায়ে।
এস' এস'।

এস' বিকশিত উন্মুখ,
এস' চির-উৎসুক,
নন্দনপথচিরযাত্রী।
আন' বাঁশরিমন্ত্রিত মিলনের রাত্রি,
পরিপূর্ণ সুধাপাত্র নিয়ে এস'।
এস' অরুণচরণ কমলবরণ
তরুণ উষার কোলে।
এস' জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
এস' নীরব কুঞ্জকুটিরে,
সুখসুপ্ত সরসীনীরে।
এস' এস'।
এস' তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে,
সিন্ধুতরঙ্গদোলে।
এস' জাগরমুখর প্রভাতে,
এস' নগরে প্রান্তরে বনে,
এস' কর্মে বচনে মনে।
এস' এস'।
এস' মঞ্জিরগুঞ্জর চরণে,
এস' গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এস' মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে,
এস' কোমল কিশলয়বসনে।
এস' সুন্দর, যৌবনবেগে।
এস' দৃপ্ত বীর, নব তেজে।
ওহে দুর্মদ, কর' জয়যাত্রা।
চল' জরাপরাভব সমরে—
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে।
এস' এস'।

অর্জুন। মা মিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিম্
যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্
এবা নিহন্মি তে মনঃ।

চিত্রাঙ্গদা। যথেমে দ্যাবা পৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ
এবা পর্যেমি তে মনঃ।

উভয়ে। অক্ষৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি॥

চণ্ডালিকা

প্রথম দৃশ্য

একদল ফুলওয়ালি চলেছে ফুল বিক্রি করতে

ফুলওয়ালির দল। নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরই দ্বারে,
আয় আয় আয়
পরিবি গলার হারে।
লতার বাঁধন হারায়ে মাধবী মরিছে কেঁদে—
বেণীর বাঁধনে রাখিবি বেঁধে,
অলকদোলায় দোলাবি তারে,
আয় আয় আয়।
বনমাধুরী করিবি চুরি
আপন নবীন মাধুরীতে—
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে তারে,
আয় আয় আয়।

—

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা
বসন্তের মন্ত্রলিপি।
এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।
সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত,
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে
গন্ধে তার গুঞ্জরে।
আন্ গো ডালা, গাঁথ্ গো মালা,
আন্ মাধবী মালতী অশোকমঞ্জরী।
আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়।

আন্ করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা
প্রফুল্ল মল্লিকা।
আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়।
মালা পর্ গো মালা পর্ সুন্দরী,
ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্।
আজি পূর্ণিমা রাতে জাগিছে চন্দ্রমা,
বকুলকুঞ্জ
দক্ষিণবাতাসে দুলিছে কাঁপিছে
থরথর মৃদু মর্মরি।
নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে,
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে।
দিস নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে উদাসিনী, হায় রে।
শুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা—
সুধাপসরা
ধুলায় দেবে শূন্য করি, শুকাবে বঞ্জুলমঞ্জরী।
চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে
তন্দ্রাহারা পিকবিরহকাকলিকূজিত দক্ষিণবায়ে
মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো,
কিংশুকশাখা চঞ্চল হল দুলে দুলে দুলে গো॥

প্রকৃতি ফুল চাইতেই
তাকে ঘৃণা করে চলে গেল

দইওয়ালার প্রবেশ

দইওয়ালা। দই চাই গো, দই চাই, দই চাই গো?
শ্যামলী আমার গাই
তুলনা তাহার নাই।

কঙ্কণানদীর ধারে
ভোরবেলা নিয়ে যাই তারে—
দূর্বাদলঘন মাঠে, নদীর ধারে ধারে ধারে, তারে
সারা বেলা চরাই, চরাই গো।
দেহখানি তার চিক্কণ কালো
যত দেখি তত লাগে ভালো।
কাছে বসে যাই ব'কে, উত্তর দেয় সে চোখে,
পিঠে মোর রাখে মাথা—
গায়ে তার হাত বুলাই, হাত বুলাই গো॥

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি দই কিনতে চাইল
একজন মেয়ে সাবধান করে দিল

মেয়ে। ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি—
নষ্ট হবে যে দই সে কথা জানো না কি॥

দইওয়ালার প্রস্থান

চুড়িওয়ালার প্রবেশ

চুড়িওয়ালা। ওগো, তোমরা যত পাড়ার মেয়ে
এসো এসো, দেখো চেয়ে—
এনেছি কাঁকনজোড়া সোনালি তারে মোড়া।
আমার কথা শোনো, হাতে লহো প'রে—
যারে রাখিতে চাহ ধ'রে কাঁকন তোমার বেড়ি হয়ে
বাঁধিবে মন তাহার আমি দিলাম কয়ে॥

প্রকৃতি চুড়ি নিতে হাত বাড়াতেই

মেয়েরা। ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।

চুড়িওয়ালা প্রভৃতির প্রস্থান

প্রকৃতি। যে আমারে পাঠালো এই অপমানের অন্ধকারে
পূজিব না, পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে
পূজিব না।
কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল
আমি তারে—
যে আমারে চিরজীবন রেখে দিল এই ধিক্‌কারে।
জানি না হায় রে কী দুরাশায় রে
পূজাদীপ জ্বালি মন্দিরদ্বারে।
আলো তার নিল হরিয়া দেবতা ছলনা করিয়া,
আঁধারে রাখিল আমারে॥

পথ বেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ

ভিক্ষুগণ। যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারস্‌স সেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধি মাগঞ্ছি অনন্তঞ্‌ঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং॥

প্রস্থান

প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ

মা। কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে— নিষ্কারণে—
বেলা বহে যায়, বেলা বহে যায় যে।
রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং
বেলা বহে যায়।
রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো,
তোর আঙিনা হয় নি যে নিকোনো।
তোলা হল না জল, পাড়া হল না ফল।
কখন্‌ বা চুলো তুই ধরাবি।
কখন্‌ ছাগল তুই চরাবি।

ত্বরা কর্, ত্বরা কর্, ত্বরা কর্—
জল তুলে নিয়ে তুই চল্ ঘর্।
রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং।
ওই যে বেলা বহে যায়॥

প্রকৃতি। কাজ নেই, কাজ নেই মা,
কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়।
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে সব বন্যায়।
জন্ম কেন দিলি মোরে,
লাঞ্ছনা জীবন ভ'রে—
মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ!
কার কাছে বল্ করেছি কোন্ পাপ,
বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায়॥

মা। থাক্ তবে থাক্ তুই পড়ে,
মিথ্যা কান্না কাঁদ্ তুই মিথ্যা দুঃখ গ'ড়ে॥

প্রস্থান

প্রকৃতির জল তোলা

বুদ্ধশিষ্য আনন্দের প্রবেশ

আনন্দ। জল দাও আমায় জল দাও।
রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ, হা,
আমায় জল দাও।
আমি তাপিত পিপাসিত,
আমায় জল দাও।
আমি শ্রান্ত, হা,
আমায় জল দাও॥

প্রকৃতি। ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে—
আমি চণ্ডালের কন্যা,
মোর কূপের বারি অশুচি।
আমি চণ্ডালের কন্যা।

তোমারে দেব জল হেন পুণ্যের আমি
নহি অধিকারিণী।
আমি চণ্ডালের কন্যা॥

আনন্দ। যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।
সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে,
যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে সেই তো পবিত্র বারি।
জল দাও আমায় জল দাও।

জলদান

কল্যাণ হোক তব কল্যাণী॥

প্রস্থান

প্রকৃতি। শুধু একটি গণ্ডূষ জল,
আহা, নিলেন তাঁহার করপুটের কমলকলিকায়।
আমার কূপ যে হল অকূল সমুদ্র—
এই-যে নাচে, এই-যে নাচে তরঙ্গ তাহার
আমার জীবন জুড়ে নাচে—
টলোমলো করে আমার প্রাণ,
আমার জীবন জুড়ে নাচে।
ওগো, কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরমমুক্তি।
একটি গণ্ডূষ জল—
আমার জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুধু একটি গণ্ডূষ জল॥

মেয়ে-পুরুষের প্রবেশ

ফসল কাটার আহ্বান -গান

মাটি তোদের ডাক দিয়েছে— আয় রে চলে
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে—
মরি হায় হায় হায়।

হাওয়ায় নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ফসল-ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে ধরার আঁচলে—
মরি হায় হায় হায়।
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো, খোলো দুয়ার খোলো।
খোলো, খোলো দুয়ার খোলো।
আলোয় হাসি উঠল জেগে,
পাতায় পাতায় চমক লেগে
বনের খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে—
মরি হায় হায় হায়॥

প্রকৃতি। ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না।
আমার কাজ-ভোলা মন, আছে দূরে কোন্—
করে স্বপনের সাধনা।
ধরা দেবে না অধরা ছায়া,
রচি গেছে মনে মোহিনী মায়া—
জানি না এ কী দেবতারই দয়া,
জানি না এ কী ছলনা।
আঁধার অঙ্গনে প্রদীপ জ্বালি নি,
দগ্ধ কাননের আমি যে মালিনী,
শূন্য হাতে আমি কাঙালিনী
করি নিশিদিনযাপনা।
যদি সে আসে তার চরণছায়ে
বেদনা আমার দেব বিছায়ে,
জানাব তাহারে অশ্রুসিক্ত
রিক্ত জীবনের কামনা॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্ঘ্য নিয়ে বৌদ্ধনারীদের মন্দিরে গমন

বৌদ্ধনারীগণ। স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নব চম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমুনীন্দ্রের পাদপদ্মতলে।
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হল সুগন্ধিত,
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত॥

প্রস্থান

প্রকৃতি। ফুল বলে, ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির প'রে।
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে, দাও ভুলিতে, দাও ভুলিতে—
নাই ধূলি মোর অন্তরে—
নাই নাই ধূলি মোর অন্তরে।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরোথরো থরোথরো।
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো,
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়— দিয়ো দিয়ো দিয়ো—
ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে।

মা। তুই অবাক ক'রে দিলি আমার মেয়ে।
পুরাণে শুনি না কি তপ করেছেন উমা
রোদের জ্বলনে—
তোর কি হল তাই॥

প্রকৃতি। হাঁ মা, আমি বসেছি তপের আসনে॥

মা। তোর সাধনা কাহার জন্যে॥

প্রকৃতি। যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাক্।

যে আমারি জেনেছে নাম
ওগো তারি নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্।
আমি তারি বিচ্ছেদদহনে
তপ করি চিত্তের গহনে।
দুঃখের পাবকে হয়ে যায় শুদ্ধ
অন্তরে মলিন যাহা আছে রুদ্ধ—
অপমাননাগিনীর খুলে যায় পাক॥

মা। কিসের ডাক তোর কিসের ডাক।
কোন্ পাতালবাসী অপদেবতার ইশারা
তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে—
আমি মন্ত্র প'ড়ে কাটাব তার মায়া॥

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে—
জল দাও, জল দাও, জল দাও॥

মা। পোড়া কপাল আমার!
কে বলেছে তোকে 'জল দাও'!
সে কি তোর আপন জাতের কেউ।

প্রকৃতি। হাঁ গো মা, সেই কথাই তো ব'লে গেলেন তিনি,
তিনি আমার আপন জাতের লোক।
আমি চণ্ডালী— সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,
সে যে দারুণ মিথ্যা।
শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল'
তা ব'লে কি জাত ঘুচিবে তার,
অশুচি হবে কি তার জল।
তিনি ব'লে গেলেন আমায়—
নিজেরে নিন্দা কোরো না,
মানবের বংশ তোমার,
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।

ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা রটাস নে নিজের,
সে-যে পাপ।
রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য,
আমি সে দাসী নই।
দ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,
আমি নই চণ্ডালী॥

মা। কী কথা বলিস তুই, আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।
তোর মুখে কে দিল এমন বাণী।
স্বপ্নে কি কেউ ভর করেছে তোকে
তোর গতজন্মের সাথি।
আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে॥

প্রকৃতি। এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, 'জল দাও, জল দাও, জল দাও।'
শিউরে উঠল দেহ আমার, চমকে উঠল প্রাণ—
বল্ দেখি মা,
সারা নগরে কি কোথাও নেই জল!
কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান॥

—

বলে দাও জল, দাও জল, দাও জল।
দেব আমি কে দিয়েছে হেন সম্বল।
বলে দাও জল।
কালো মেঘ-পানে চেয়ে
এল ধেয়ে

চাতক বিহ্বল—
বলে দাও জল, দাও জল।
ভূমিতলে হারা উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।
কার সুগভীর বাণী দিল হানি
কালো শিলাতল—
বলে দাও জল, দাও জল॥

মা। বাছা, মন্ত্র করেছে কে তোকে,
তোর পথ-চাওয়া মন টান দিয়েছে কে।
মন্ত্র করেছে কে তোকে॥

প্রকৃতি। সে যে পথিক আমার,
হৃদয়পথের পথিক আমার।
হায় রে, আর সে তো এল না, এল না,
এ পথে এল না।
আর সে যে চাইল না জল।
আমার হৃদয় তাই হল মরুভূমি,
শুকিয়ে গেল তার রস—
সে যে চাইল না, চাইল না, চাইল না জল॥

—

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো,
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
চক্ষে আমার তৃষ্ণা।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন,
সন্তাপে প্রাণ যায় যায় যে পুড়ে।
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়,
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়—
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।

যে ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকালো—
কালো— কালো হয়ে সে শুকালো হায়।
ঝর্নারে কে দিল বাধা—
নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে॥

মা। বাছা, সহজ ক'রে বল্ আমাকে
মন কাকে তোর চায়।
বেছে নিস মনের মতন বর—
রয়েছে তো অনেক আপন জন।
আকাশের চাঁদের পানে
হাত বাড়াস নে।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁরে
আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান,
ঝরে-পড়া ধুতরো ফুল
ধুলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে।
ওগো প্রভু, ওগো প্রভু,
সেই ফুলে মালা গাঁথো,
পরো পরো আপন গলায়,
ব্যর্থ হতে তারে দিয়ো না, দিয়ো না॥

রাজবাড়ির অনুচরের প্রবেশ

অনুচর। সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো,
শেষকালে এই ঠাঁই
ভাগ্যে দেখা পেলেম রক্ষা তাই।

মা। কেন গো, কী চাই।

অনুচর। রানীমার পোষা পাখি কোথায় উড়ে গেছে—
সেই নিদারুণ শোকে

ঘুম নেই তাঁর চোখে ও চারণের বউ।
ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে তোকে ও চারণের বউ।

মা। উড়োপাখি আসবে ফিরে এমন কী গুণ জানি।

অনুচর। মিথ্যে ওজর শুনব না, শুনব না—
শুনবে না তোর রানী।
জাদু ক'রে মন্ত্র প'ড়ে ফিরে আনতেই হবে,
খালাস পাবি তবে ও চারণের বউ॥

প্রস্থান

প্রকৃতি। ওগো মা, ওই কথাই তো ভালো।
মন্ত্র জানিস তুই,
মন্ত্র প'ড়ে দে তাঁকে তুই এনে॥

মা। ওরে সর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস—
আগুন নিয়ে খেলা!
শুনে বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে মরি॥

প্রকৃতি। আমি ভয় করি নে মা, ভয় করি নে॥
ভয় করি, মা, পাছে সাহস যায় নেমে—
পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি।
এত বড়ো স্পর্ধা আমার একি আশ্চর্য!
এই আশ্চর্য সে'ই ঘটিয়েছে।
তারো বেশি ঘটবে না কি—
আসবে না আমার পাশে,
বসবে না আধো-আঁচলে?॥

মা। তাঁকে আনতে যদি পারি
মূল্য দিতে পারবি কি তুই তার।
জীবনে কিছুই যে তোর থাকবে না বাকি॥

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না, কিছুই থাকবে না,
কিছুই না, কিছুই না।

যদি আমার সব মিটে যায়, সব মিটে যায়,
তবেই আমি বেঁচে যাব যে চিরদিনের তরে
যখন কিছুই থাকবে না।
দেবার আমার আছে কিছু এই কথাটাই যে
ভুলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে—
আজ জেনেছি, আমি নই-যে অভাগিনী ;
দেবই আমি, দেবই আমি, দেবই
উজাড় করে দেব আমারে।
কোনো ভয় আর নেই আমার।
পড়্ তোর মন্তর, পড়্ তোর মন্তর,
ভিক্ষুরে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে,
সে'ই তারে দিবে সম্মান—
এত মান আর কেউ দিতে কি পারে॥

মা। বাছা, তুই যে আমার বুক-চেরা ধন।
তোর কথাতেই চলেছি পাপের পথে পাপীয়সী!
হে পবিত্র মহাপুরুষ,
আমার অপরাধের শক্তি যত
ক্ষমার শক্তি তোমার তারো অনেক গুণে বড়ো।
তোমারে করিব অসম্মান—
তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম॥

প্রকৃতি। দোষী করো আমায়, দোষী করো।
ধুলায়-পড়া ম্লান কুসুম পায়ের তলায় ধরো।
অপরাধে ভরা ডালি
নিজ হাতে করো খালি, আহা,
তার পরে সেই শূন্য ডালায় তোমার করুণা ভরো—
আমায় দোষী করো।
তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ ধরব তোমায় ফাঁদে
আমার অপরাধে।

আমার দোষকে তোমার পুণ্য
করবে তো কলঙ্কশূন্য গো—
ক্ষমায় গেঁথে সকল ত্রুটি গলায় তোমার পরো ॥

মা। কী অসীম সাহস তোর মেয়ে ॥

প্রকৃতি। আমার সাহস!
তাঁর সাহসের নাই তুলনা।
কেউ যে কথা বলতে পারে নি
তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে—
জল দাও, জল দাও, জল দাও।
ওই একটু বাণী তার দীপ্তি কত—
আলো করে দিল আমার সারা জন্ম—
তার দীপ্তি কত!
বুকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে,
সেটাকে ঠেলে দিল—
উথলি উঠল রসের ধারা ॥

মা। ওরা কে যায় পীতবসন-পরা সন্ন্যাসী ॥

বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল

ভিক্ষুগণ। নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়।
নমো নমো গোতমচন্দিমায়।
নমো নমোনন্তগুণণ্ণবায়।
নমো নমো সাকিয়নন্দনায় ॥

প্রকৃতি। মা, ওই-যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে!
ওই-যে তিনি চলেছেন।
ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না—
তাঁর নিজের হাতের এই নূতন সৃষ্টিরে
আর দেখিলেন না চেয়ে।
এই মাটি, এই মাটি, এই মাটি তোর আপন রে!

হতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে
শুধু এক নিমেষের জন্যে !
থাকতে হবে তোরে মাটিতে
সবার পায়ের তলায় ॥

মা। ওরে বাছা, দেখতে পারি নে তোর দুঃখ—
আনবই, আনবই, আনবই তারে মন্ত্র প'ড়ে ।

প্রকৃতি। পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র—
পাকে পাকে দাগ দিয়ে জড়ায়ে ধরুক ওর মনকে ।
যেখানেই যাক, কখনো এড়াতে আমাকে
পারবে না, পারবে না ॥

আকর্ষণমন্ত্রে যোগ দেবার জন্যে
মা তার শিষ্যাদলকে ডাক দিল

মা। আয় তোরা আয় !
আয় তোরা আয় !
আয় তোরা আয় ॥

তাদের প্রবেশ ও নৃত্য

যায় যদি যাক সাগরতীরে—
আবার আসুক, আবার আসুক, আসুক ফিরে। হায়!
রেখে দেব আসন পেতে হৃদয়েতে
পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব অশ্রুনীরে। হায় !
যায় যদি যাক শৈলশিরে—
আসুক ফিরে, আসুক ফিরে ।
লুকিয়ে রব গিরিগুহায়, ডাকব উহায়—
আমার স্বপন ওর জাগরণ রইবে ঘিরে। হায় ॥

মায়ানৃত্য

ভাবনা করিস নে তুই—
এই দেখ্ মায়াদর্পণ আমার—

হাতে নিয়ে নাচবি যখন
দেখতে পাবি তাঁর কী হল দশা।
এইবার এসো এসো রুদ্রভৈরবের সন্তান,
জাগাও তাণ্ডবনৃত্য।
এইবার এসো এসো ॥

তৃতীয় দৃশ্য

মায়ের মায়ানৃত্য

প্রকৃতি। ওই দেখ্‌ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো,
মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে—
উড়ে যাবে শুষ্ক সাধনা সন্ন্যাসীর
শুষ্ক পাতার মতন।
নিববে বাতি, পথ হবে অন্ধকার,
ঝড়ে-বাসা-ভাঙা পাখি
সে-যে ঘুরে ঘুরে পড়বে এসে মোর দ্বারে।
দুরুদুরু করে মোর বক্ষ,
মনের মাঝে ঝিলিক দিতেছে বিজুলি।
দূরে যেন ফেনিয়ে উঠেছে সমুদ্র—
তল নেই, কূল নেই তার।
মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে ॥

মা। এইবার আয়নার সামনে নাচ্‌ দেখি তুই,
দেখ্‌ দেখি কী ছায়া পড়ল ॥

প্রকৃতির নৃত্য

প্রকৃতি। লজ্জা! ছি ছি লজ্জা!
আকাশে তুলে দুই বাহু
অভিশাপ দিচ্ছেন কারে।

নিজেরে মারছেন বহ্নির বেত্র,
শেল বিঁধছেন যেন আপনার মর্মে॥

মা। ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি যদি,
শেষে তোর কী হবে দশা॥

প্রকৃতি। আমি দেখব না, আমি দেখব না,
আমি দেখব না তোর দর্পণ।
বুক ফেটে যায়, যায় গো, বুক ফেটে যায়।
আমি দেখব না।
কী ভয়ঙ্কর দুঃখের ঘূর্ণিঝঞ্ঝা—
মহান বনস্পতি ধুলায় কি লুটাবে,
ভাঙবে কি অভ্রভেদী তার গৌরব।
আমি দেখব না, আমি দেখব না,
আমি দেখব না তোর দর্পণ— না না না

মা। থাক্ থাক্ তবে, থাক্ এই মায়া।
প্রাণপণে ফিরিয়ে আনব মোর মন্ত্র—
নাড়ী যদি ছিঁড়ে যায় যাক,
ফুরায়ে যায় যদি যাক নিশ্বাস॥

প্রকৃতি। সেই ভালো, মা, সেই ভালো।
থাক্ তোর মন্ত্র, থাক্ তোর—
আর কাজ নাই, কাজ নাই, কাজ নাই।...
না না না— পড়্ মন্ত্র তুই, পড়্ তোর মন্ত্র—
পথ তো আর নেই বাকি।
আসবে সে, আসবে সে, আসবে,
আমার জীবনমৃত্যু-সীমানায় আসবে।
নিবিড় রাত্রে এসে পৌঁছবে পান্থ,
বুকের জ্বালা দিয়ে আমি জ্বালিয়ে দিব দীপখানি—
সে আসবে, ও সে আসবে॥

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার।
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার।
মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কালি—
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার॥

মা। বাছা, মোর মন্ত্র আর তো বাকি নেই,
প্রাণ মোর এল কণ্ঠে॥

প্রকৃতি। মা গো, এত দিনে মনে হচ্ছে যেন
টলেছে আসন তাঁহার।
ওই আসছে, আসছে, আসছে।
যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে,
যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে,
ওই আসছে, আসছে, আসছে—
কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে॥

মা। বল্ দেখি, বাছা, কী তুই দেখছিস আয়নায়॥

প্রকৃতি। ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে,
চারি দিকে বিদ্যুৎ চমকে,
অঙ্গ ঘিরে ঘিরে তাঁর অগ্নির আবেষ্টন—
যেন শিবের ক্রোধানলদীপ্তি!
তোর মন্ত্রবাণী ধরি কালীনাগিনীমূর্তি
গর্জিছে বিষনিশ্বাসে,
কলুষিত করে তাঁর পুণ্যশিখা॥

আনন্দের ছায়া-অভিনয়

মা। ওরে পাষাণী, কী নিষ্ঠুর মন তোর,
কী কঠিন প্রাণ—
এখনো তো আছিস বেঁচে॥

প্রকৃতি। ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া, তার
নাই ভয়, নাই লজ্জা।
নিষ্ঠুর পণ আমার,
আমি মান্‌ব না হার, মান্‌ব না হার—
বাঁধব তাঁরে মায়াবাঁধনে,
জড়াব আমারি হাসি-কাঁদনে।
ওই দেখ্‌, ওই নদী হয়েছেন পার—
একা চলেছেন ঘন বনের পথে।
যেন কিছু নাই তাঁর চোখের সম্মুখে—
নাই সত্য, নাই মিথ্যা—
নাই ভালো, নাই মন্দ।

মাকে নাড়া দিয়ে

দুর্বল হোস নে, হোস নে।
এইবার পড়্‌ তোর শেষনাগমন্ত্র—
নাগপাশবন্ধনমন্ত্র॥

মা। জাগে নি এখনো জাগে নি
রসাতলবাসিনী নাগিনী। জাগে নি।
বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ্‌ বাঁশি, বাজ্‌ রে
মহাভীমপাতালী রাগিণী।
জেগে ওঠ্‌ মায়াকালী নাগিনী। জাগে নি।
ওরে মোর মন্ত্রে কান দে—
টান দে, টান দে, টান দে, টান দে।
বিষগর্জনে ওকে ডাক দে—
পাক দে, পাক দে, পাক দে, পাক দে,
গহ্বর হতে তুই বার হ,
সপ্তসমুদ্র পার হ।
বেঁধে তারে আন্‌ রে—

টান্ রে, টান্ রে, টান্ রে, টান্ রে।
নাগিনী জাগল, জাগল, জাগল—
পাক দিতে ওই লাগল, লাগল, লাগল—
মায়াটান ওই টানল, টানল, টানল।
বেঁধে আনল, বেঁধে আনল, বেঁধে আনল॥

—

এইবার নৃত্যে করো আহ্বান—
ধর্ তোরা গান।
আয় তোরা যোগ দিবি আয় যোগিনীর দল।
আয় তোরা আয়।
আয় তোরা আয়।
আয় তোরা আয়॥

সকলে। ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন
তেমনি উঠে এসো এসো।
শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জ্বলে অগ্নি
তেমনি তুমি এসো এসো।
ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ,
তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে,
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো।
আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন-ইশারায়
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে,
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো।
সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ,
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে—
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো॥

মা। আর দেরি করিস নে, দেখ্ দর্পণ—
আমার শক্তি হল যে ক্ষয়॥

প্রকৃতি। না, দেখব না, আমি দেখব না।
আমি শুনব—
মনের মধ্যে আমি শুনব,
ধ্যানের মধ্যে আমি শুনব
তাঁর চরণধ্বনি।
ওই দেখ্, ওই এল ঝড়, এল ঝড়,
তাঁর আগমনীর ওই ঝড়—
পৃথিবী কাঁপছে থরোথরো থরোথরো,
গুরুগুরু করে মোর বক্ষ॥

মা। তোর অভিশাপ নিয়ে আসে
হতভাগিনী॥

প্রকৃতি। অভিশাপ নয় নয়,
অভিশাপ নয় নয়—
আনছে আমার জন্মান্তর,
মরণের সিংহদ্বার ওই খুলছে।
ভাঙল দ্বার,
ভাঙল প্রাচীর,
ভাঙল এ জন্মের মিথ্যা।
ওগো আমার সর্বনাশ,
ওগো আমার সর্বস্ব,
তুমি এসেছ
আমার অপমানের চূড়ায়।
মোর অন্ধকারের ঊর্ধ্বে রাখো
তব চরণ জ্যোতির্ময়॥

মা। ও নিষ্ঠুর মেয়ে,
আর সহে না, সহে না, সহে না॥

প্রকৃতি। ও মা, ও মা, ও মা, ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র—
এখনি, এখনি, এখনি।
ও রাক্ষুসী, কী করলি তুই,
কী করলি তুই—
মরলি নে কেন পাপীয়সী!
কোথা আমার সেই দীপ্ত সমুজ্জ্বল
শুভ্র সুনির্মল
সুদূর স্বর্গের আলো।
আহা, কী ম্লান, কী ক্লান্ত—
আত্মপরাভব কী গভীর!
যাক যাক যাক,
সব যাক, সব যাক—
অপমান করিস নে বীরের
জয় হোক তাঁর—
জয় হোক তাঁর, জয় হোক॥

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়,
দিলে তার এত মূল্য,
নিলে তার এত দুঃখ।
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে,
এনেছি নীচে,
ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পুণ্যলোকে।
ক্ষমা করো।
জয় হোক তোমার, জয় হোক,
জয় হোক, জয় হোক। ক্ষমা করো॥

আনন্দ। কল্যাণ হোক তব কল্যাণী ॥

সকলে বুদ্ধকে প্রণাম

সকলে। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বরঞাণলোচনো
লোকস্‌স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং ॥

শ্যামা

প্রথম দৃশ্য

বজ্রসেন ও তাহার বন্ধু

বন্ধু। তুমি ইন্দ্রমণির হার
এনেছ সুবর্ণদ্বীপ থেকে।
তোমার ইন্দ্রমণির হার—
রাজমহিষীর কানে যে তার খবর দিয়েছে কে।
দাও আমায়, রাজবাড়িতে দেব বেচে
ইন্দ্রমণির হার—
চিরদিনের মতো তুমি যাবে বেঁচে॥

বজ্রসেন। না না না বন্ধু,
আমি অনেক করেছি বেচাকেনা,
অনেক হয়েছে লেনাদেনা—
না না না,
এ তো হাটে বিকোবার নয় হার—
না না না।
কণ্ঠে দিব আমি তারি
যারে বিনা মূল্যে দিতে পারি—
ওগো, আছে সে কোথায়,
আজও তারে হয় নাই চেনা।
না না না বন্ধু॥

বন্ধু। ও জান না কি
পিছনে তোমার রয়েছে রাজার চর॥

বজ্রসেন। জানি জানি, তাই তো আমি
চলেছি দেশান্তর
এ মানিক পেলেম আমি অনেক দেবতা পূজে
বাধার সঙ্গে যুঝে—

এ মানিক দেব যারে অমনি তারে পাব খুঁজে,
চলেছি দেশ-দেশান্তর ॥

বন্ধু দূরে প্রহরীকে দেখতে পেয়ে বজ্রসেনকে মালা-সমেত পালাতে বলল

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। থামো, থামো—
কোথায় চলেছ পালায়ে
সে কোন্ গোপন দায়ে।
আমি নগর-কোটালের চর ॥

বজ্রসেন। আমি বণিক,
আমি চলেছি আপন ব্যবসায়ে,
চলেছি দেশান্তর ॥

কোটাল। কী আছে তোমার পেটিকায় ॥

বজ্রসেন। আছে মোর প্রাণ, আছে মোর শ্বাস ॥

কোটাল। খোলো, খোলো, বৃথা কোরো না পরিহাস।

বজ্রসেন। এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে—
সাবধান! সাবধান! তুমি ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না এরে
তোমার মরণ নাহয় আমার মরণ
যমের দিব্য কর যদি এরে হরণ—
ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ॥

বজ্রসেনের পলায়ন

সেই দিকে তাকিয়ে

কোটাল। ভালো ভালো, তুমি দেখব পালাও কোথা।
মশানে তোমার শূল হয়েছে পোঁতা—
এ কথা মনে রেখে
তোমার ইষ্টদেবতারে স্মরিয়ো এখন থেকে ॥

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামার সভাগৃহে কয়েকটি সহচরী বসে আছে
নানা কাজে নিযুক্ত

সখীরা। হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব—
নীরবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে,
কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া।
স্বপনরূপিণী অলোকসুন্দরী
অলক্ষ্য-অলকাপুরী-নিবাসিনী,
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে॥

উত্তীয়ের প্রবেশ

সখীরা। ফিরে যাও, কেন ফিরে ফিরে যাও
বহিয়া— বহিয়া বিফল বাসনা।
চিরদিন আছ দূরে
অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে।
কাছে আস তবু আস না,
বহিয়া বিফল বাসনা।
পারি না তোমায় বুঝিতে—
ভিতরে কারে কি পেয়েছ,
বাহিরে চাহ না খুঁজিতে?
না-বলা তোমার বেদনা যত
বিরহপ্রদীপে শিখারই মতো,
নয়নে তোমার উঠেছে জ্বলিয়া নীরব কী সম্ভাষণা
বহিয়া বিফল বাসনা॥

উত্তীয়। মায়াবনবিহারিণী হরিণী
গহনস্বপনসঞ্চারিণী,
কেন তারে ধরিবারে করি পণ অকারণ।

থাক্ থাক্ নিজমনে দূরেতে,
আমি শুধু বাঁশরির সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন
অকারণ।

সখীরা। হতাশ হোয়ো না, হোয়ো না, হোয়ো না সখা।
নিজেরে ভুলায়ে লোয়ো না, লোয়ো না
আঁধার গুহার তলে॥

উত্তীয়। চমকিবে ফাগুনের পবনে,
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে,
চিত্ত আকুল হবে অনুখন
অকারণ।
দূর হতে আমি তারে সাধিব,
গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব—
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন
অকারণ॥

সখীরা। হবে সখা, হবে তব হবে জয়—
নাহি ভয়, নাহি ভয়, নাহি ভয়।
হে প্রেমিক তাপস, নিঃশেষে আত্ম-আহুতি
ফলিবে চরম ফলে॥

প্রস্থান

সখীসহ শ্যামার প্রবেশ

সখী। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
কোরো না হেলা হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা—
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি
হে গরবিনী।
মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে, হায়—

হেসে চলে যায় জোয়ারজলে ভাসিয়ে ভেলা।
দুর্লভ ধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি
হে গরবিনী।
ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা,
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা
হে বিরহিণী।
বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায়
কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণ ফেলা দিনযামিনী,
হে গরবিনী॥

শ্যামা। ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই—
কোথা সে যে আছে সঙ্গোপনে
প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে আড়ালে।
এসো মম সার্থক স্বপ্ন,
করো মম যৌবন সুন্দর,
দক্ষিণবায়ু আনো পুষ্পবনে।
ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা,
নব প্রাণমন্ত্রের আনো বাণী।
পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা—
শূন্যে পথহারা পবনের ছন্দে,
ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধে॥

সখীদের নৃত্যচর্চা, শেষে শ্যামার সজ্জা-সাধন। এমন সময়
বজ্রসেন ছুটে এল। পিছনে কোটাল

কোটাল। ধর্‌ ধর্‌, ওই চোর, ওই চোর।

বজ্রসেন। নই আমি নই চোর, নই চোর, নই চোর।
অন্যায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে—

কোটাল। ওই বটে, ওই চোর, ওই চোর, ওই চোর॥

উভয়ের প্রস্থান

বজ্রসেন যে দিকে গেল
শ্যামা সে দিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল

শ্যামা। আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।
শীঘ্র যা লো, সহচরী, যা লো, যা লো—
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।
বন্দী সাথে লয়ে একবার,
আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি॥

শ্যামা ও সখীদের প্রস্থান

সখী। সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে। কে!
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চোখে
মুছাবে কে। কে!
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা—
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে,
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে॥

সহচরীর প্রস্থান

বজ্রসেন ও কোটাল -সহ শ্যামার পুনঃপ্রবেশ

শ্যামা। তোমাদের একি ভ্রান্তি—
কে ওই পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি।
এমন করে কি ওকে বাঁধে!
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে॥

কোটাল। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে—
চোর চাই যে ক'রেই হোক, চোর চাই।
হোক-না সে যে-কোনো লোক, চোর চাই।
নহিলে মোদের যাবে মান॥

শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,
দুই দিন মাগিনু সময়॥

কোটাল। রাখিব তোমার অনুনয়—
দুই দিন কারাগারে রবে,
তার পর যা হয় তা হবে॥

বজ্রসেন। এ কী খেলা হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক।
দাও অপমানদুখ, কেন দাও অপমানদুখ—
মোরে নিয়ে কেন, কেন, কেন এ কৌতুক॥

শ্যামা। নহে নহে, এ নহে কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলঙ্কার
সঁপি দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে।
তব অপমানে মোর অন্তরাত্মা আজি
অপমান মানে॥

বজ্রসেনকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান

সঙ্গে শ্যামা কিছু দূর গিয়ে ফিরে এসে

শ্যামা। রাজার প্রহরী ওরা অন্যায় অপবাদে
নিরীহের প্রাণ বধিবে ব'লে কারাগারে বাঁধে।
ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো—
আছ কি বীর কোনো,
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে॥

উত্তীয়ের প্রবেশ

উত্তীয়। ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে—
শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি
ওগো সুন্দরী।
চাও কি প্রেমের চরম মূল্য— দেব আনি,
দেব আনি ওগো সুন্দরী।
প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,
নেবে মোর প্রাণঋণ—
তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন
মরণডোরে।
কেমনে ছাড়িবে মোরে, ছাড়িবে মোরে
ওগো সুন্দরী॥

শ্যামা। এতদিন তুমি, সখা, চাহ নি কিছু—
সখা, চাহ নি কিছু—
নীরবে ছিলে করি নয়ন নিচু,
চাহ নি কিছু।
রাজ-অঙ্গুরী মম করিলাম দান,
তোমারে দিলাম মোর শেষ সম্মান।

তব বীর-হাতে এই ভূষণের সাথে
আমার প্রণাম যাক তব পিছু পিছু।
তুমি চাহ নি কিছু, সখা, চাহ নি কিছু ॥

উত্তীয়। আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।
রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে,
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।
বিদায় নেবার সময় এবার হল—
প্রসন্ন মুখ তোলো,
মুখ তোলো, মুখ তোলো—
মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে।
যারে জান নাই, যারে জান নাই,
যারে জান নাই,
তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান ॥

শ্যামা হাত ধ'রে উত্তীয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল
অল্পক্ষণ পরে হাত ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল

সখী। তোমার প্রেমের বীর্যে
তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান।
তব মরণের ডোরে বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে
অসীম পাপে অনন্ত শাপে।
তোমার চরম অর্ঘ্য
কিনিল সখীর লাগি নারকী প্রেমের স্বর্গ ॥

উত্তীয়। প্রহরী, ওগো প্রহরী, লহো লহো লহো মোরে বাঁধি।
বিদেশী নহে সে তব শাসনপাত্র—

আমি একা অপরাধী।

কোটাল। তুমিই করেছ তবে চুরি?

উত্তীয়। এই দেখো রাজ-অঙ্গুরী—
রাজ-আভরণ দেহে করেছি ধারণ আজি,
সেই পরিতাপে আমি কাঁদি॥

উত্তীয়কে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

সখী। বুক যে ফেটে যায় হায় হায় রে।
তোর তরুণ জীবন দিলি নিষ্কারণে
মৃত্যুপিপাসিনীর পায় রে ওরে সখা।
মধুর দুর্লভ যৌবনধন ব্যর্থ করিলি কেন অকালে
পুষ্পবিহীন গীতিহারা মরণমরুর পারে ওরে সখা॥

প্রস্থান

কারাগারে উত্তীয়। প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। নাম লহো দেবতার। দেরি তব নাই আর—
দেরি তব নাই আর।
ওরে পাষণ্ড, লহো চরম দণ্ড। তোর
অন্ত যে নাই আস্পর্ধার॥

শ্যামার দ্রুত প্রবেশ

শ্যামা। থাম্‌ রে, থাম্‌ রে তোরা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—
দোষী ও-যে নয় নয়, মিথ্যা, মিথ্যা সবই—
আমারি ছলনা ও যে—
বেঁধে নিয়ে যা মোরে রাজার চরণে॥

প্রহরী। চুপ করো, দূরে যাও, দূরে যাও নারী—
বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না॥

দুই হাতে মুখ ঢেকে শ্যামার প্রস্থান

প্রহরীর উত্তীয়কে হত্যা

সখী। কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো
দেখা দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি দুর্দিনদুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাঁশি।
অকরুণ নির্মম ভুবনে দেখিনু এ কী সহসা—
কোন্ আপনা-সমর্পণ, মুখে নির্ভয় হাসি॥

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামা। বাজে গুরু গুরু শঙ্কার ডঙ্কা,
ঝঞ্ঝা ঘনায় দূরে ভীষণনীরবে।
কত রব সুখস্বপ্নের ঘোরে আপনা ভুলে—
সহসা জাগিতে হবে॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

হে বিদেশী, এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো— এসো এসো—
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি,
হে হৃদয়স্বামী, জীবনে মরণে প্রভু॥

বজ্রসেন। আহা, এ কী আনন্দ!
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতসুগন্ধ।
এলে কারাগারে রজনীর পারে উষাসম,
মুক্তিরূপা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময়ী॥

শ্যামা। বোলো না, বোলো না, বোলো না— আমি দয়াময়ী!
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা বোলো না।
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।

আমি দয়াময়ী!
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা বোলো না॥

বজ্রসেন। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে
জেনো প্রিয়ে।
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে
জেনো প্রিয়ে।
কলঙ্ক যাহা আছে দূর হয় তার কাছে,
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে
জেনো প্রিয়ে॥

—

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে—
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও, দাও।
ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাব না,
পাল তুলে দাও, দাও দাও, দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল—
হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল।
পাগল হে নাবিক,
ভুলাও দিগ্‌বিদিক,
পাল তুলে দাও, দাও দাও, দাও॥

সখী। হায়, হায় রে, হায় পরবাসী, হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি।
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে
কোন্‌ বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি।
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি হা-হা॥

চতুর্থ দৃশ্য

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরসুন্দরী
কোথা তারে ধরি— কোথা তারে ধরি।
রক্ষা রবে না, রক্ষা রবে না—
এমন ক্ষতি রাজার সবে না, রক্ষা রবে না।
বন হতে কেন গেল অশোকমঞ্জরী
ফাল্গুনের অঙ্গন শূন্য করি।
ওরে কে তুই ভুলালি, তারে কে তুই ভুলালি—
ফিরিয়ে দে তারে, মোদের বনের দুলালী
তারে কে তুই ভুলালি॥

প্রস্থান

মেয়েদের প্রবেশ। শেষে প্রহরীর প্রবেশ

সখীগণ। রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে
এল আমাদের সখী।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না—
কেমনে যাবে অজানা পথে
অন্ধকারে দিক্ নিরখি হায়।
অচেনা প্রেমের চমক লেগে
প্রলয়রাতে সে উঠেছে জেগে— অচেনা প্রেমে।
ধ্রুবতারাকে পিছনে রেখে
ধূমকেতুকে চলেছে লখি হায়।
কাল সকালে পুরোনো পথে
আর কখনো ফিরিবে ও কি হায়।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না॥

প্রহরী। দাঁড়াও, কোথা চলো, তোমরা কে বলো বলো॥

সখীগণ। আমরা আহিরিনী, সারা হল বিকিকিনি—
দূর গাঁয়ে চলি ধেয়ে আমরা বিদেশী মেয়ে॥

প্রহরী। ঘাটে বসে হোথা ও কে॥

সখীগণ। সাথি মোদের ও যে নেয়ে—
যেতে হবে দূর পারে, এনেছি তাই ডেকে তারে।
নিয়ে যাবে তরী বেয়ে সাথি মোদের ও যে নেয়ে—
ওগো প্রহরী, বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না
মিনতি করি ওগো প্রহরী॥

প্রস্থান

সখী। কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল দুই অজানারে
এ কী সংশয়েরই অন্ধকারে।
দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায়
মিলনতরণীখানি ধায় রে কোন্ বিচ্ছেদের পারে॥

বজ্রসেন ও শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন। হৃদয়বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল
সেই প্রেম এই মালিকায় রূপ নিল, রূপ নিল, রূপ নিল।
এই ফুলহারে, প্রেয়সী, তোমারে বরণ করি—
অক্ষয়মধুর সুধাময় হোক মিলনবিভাবরী।
প্রেয়সী, তোমায় প্রাণবেদিকায় প্রেমের পূজায় বরণ করি॥

কহো কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনী,
তোমার কাছে আমি কত ঋণে ঋণী॥

শ্যামা। নহে নহে নহে— সে কথা এখনো নহে॥

সহচরী। নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে থাকিস
তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা
তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস।
দয়িতেরে দিয়েছিলি সুধা,
আজিও তাহার মেটে নি ক্ষুধা—
এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ।
যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে
কেন তারে বাহিরে ডাকিস॥

বজ্রসেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
জানি যদি, প্রিয়ে, শোধ দিব এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ॥

শ্যামা। তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা।
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর—
মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ নিজ-'পরে লয়ে
সঁপেছে আপন প্রাণ॥

বজ্রসেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা, জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে—ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে॥

শ্যামা। হে, ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো॥

বজ্রসেন। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত!
কলঙ্কিনী, ধিক্ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী
কলঙ্কিনী॥

শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই, দোষ করি নাই।
দোষী আমি বিধাতার পায়ে,
তিনি করিবেন রোষ— সহিব নীরবে।
তুমি যদি না কর দয়া সবে না, সবে না, সবে না॥

বজ্রসেন। তবু ছাড়িবি নে মোরে?

শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না।
তোমা লাগি পাপ নাথ, তুমি করো মর্মাঘাত।
ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না॥

শ্যামাকে বজ্রসেনের আঘাত ও শ্যামার পতন

বজ্রসেনের প্রস্থান

নেপথ্যে। হায়, এ কী সমাপন!
অমৃতপাত্র ভাঙিলি, করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ!
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো হারালো
কলঙ্কে, অসম্মানে॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

পল্লীরমণীরা। তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা,
হায়, বিদেশী পান্থ।
এই দারুণ রৌদ্রে, এই তপ্ত বালুকায়
তুমি কি পথভ্রান্ত।
দুই চক্ষুতে একি দাহ—
জানি নে, জানি নে, জানি নে কী যে চাহ।
চলো চলো আমাদের ঘরে,
চলো চলো ক্ষণেকের তরে—
পাবে ছায়া, পাবে জল।
সব তাপ হবে তব শান্ত।

—

ও কথা কেন নেয় না কানে—

কোথা চ'লে যায় কে জানে।
মরণের কোন্ দূত ওরে করে দিল বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত হা॥

সকলের প্রস্থান

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন। এসো এসো, এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন, নীরস মম ভুবন,
শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীসুধা দিয়ে॥

সহসা নূপুর দেখিয়া কুড়াইয়া লইল

হায় রে, হায় রে নূপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞ্জনসুর।
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে রাখিলি ধরিয়া
বিরহ ভরিয়া স্মরণ সুমধুর—
তার কোমলচরণস্মরণ সুমধুর।
তোর ঝঙ্কারহীন ধিক্কারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর॥

প্রস্থান

নেপথ্যে। সব-কিছু কেন নিল না, নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
আপনাতে কেন মিটালো না যত কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা,
সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা।
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন। এসো, এসো, এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে ॥

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এসেছি প্রিয়তম, ক্ষম মোরে ক্ষম,
গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম—
তব নিঠুর করুণ করে! ক্ষম মোরে ॥

বজ্রসেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে।
যাও যাও যাও, যাও চলে যাও ॥

শ্যামা চলে যাচ্ছে। বজ্রসেন চুপ করে দাঁড়িয়ে
শ্যামা একবার ফিরে দাঁড়ালো। বজ্রসেন একটু এগিয়ে

বজ্রসেন। যাও যাও যাও, যাও, চলে যাও ॥

বজ্রসেনকে প্রণাম করে শ্যামার প্রস্থান

বজ্রসেন। ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু!
মরিছে তাপে, মরিছে লাজে প্রেমের বলহীনতা—
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু!
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা পাপীজনশরণ প্রভু ॥

ভানুসিংহ ঠাকুরের
পদাবলী

১

বসন্ত আওল রে !

মধুকর গুন গুন, অমুয়ামঞ্জরী   কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী, হৃদয় প্রাণ মম   হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুঃখদহন সব   দূর দূর চলি গেল।
মরমে বহই বসন্তসমীরণ,   মরমে ফুটই ফুল,
মরমকুঞ্জ-'পর বোলই কুহুকুহু   অহরহ কোকিলকুল।
সখি রে, উচ্ছল প্রেমভরে অব   ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,
মুগ্ধ নিখিলমন দক্ষিণপবনে   গায় রভসরসগান !
বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন   কহিছে— দুখিনী রাধা,
কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,   হৃদিবসন্ত সো মাধা।
ভানু কহে— অতি গহন রয়ন অব,   বসন্তসমীরশ্বাসে
মোদিত বিহ্বল চিত্তকুঞ্জতল   ফুল্লবাসনা-বাসে ॥

২

শুন লো শুন লো বালিকা,   রাখ কুসুমমালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি, শ্যামচন্দ্র নাহি রে ॥
দুলই কুসুমমুঞ্জরি,   ভমর ফিরই গুঞ্জরী,
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে ॥
শশিসনাথ যামিনী,   বিরহবিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে।
অধর উঠই কাঁপিয়া   সখিকরে কর আপিয়া—
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে ॥
মৃদু সমীর সঞ্চলে   হরয়ি শিথিল অঞ্চলে
বালিহৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহি রে।
কুঞ্জ-পানে হেরিয়া   অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায়— শূন্যকুঞ্জ, শ্যামচন্দ্র নাহি রে ॥

৩

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে, কণ্ঠে শুখাওল মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গল রয়নী, নহি নহি আওল কালা॥
বুঝনু বুঝনু, সখি, বিফল বিফল সব, বিফল এ পীরিতি লেহা।
বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন, বিফল রে এ মঝু দেহা॥
চল সখি, গৃহ চল, মুঞ্চ নয়নজল— চল সখি, চল গৃহকাজে।
মালতিমালা রাখহ বালা— ছি ছি সখি, মরু মরু লাজে।
সখি লো, দারুণ আধিভরাতুর এ তরুণ যৌবন মোর।
সখি লো, দারুণ প্রণয়হলাহল জীবন করল অঘোর॥
তৃষিত প্রাণ মম দিবসযামিনী শ্যামক দরশন-আশে।
আকুল জীবন থেহ ন মানে, অহরহ জ্বলত হুতাশে।
সজনি, সত্য কহি তোয়,
খোয়ব কব হম শ্যামক প্রেম সদা ডর লাগয় মোয়॥
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব, সো দিন আসব সখি রে—
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে! মরিব হলাহল ভখি রে!
ঐস বৃথা ভয় না কর বালা ভানু নিবেদয় চরণে—
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি, নহি টুটে জীবনে মরণে॥

৪

শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর!
বিরহ সাথি করি দুঃখিনী রাধা রজনী করত হি ভোর।
একলি নিরল বিরল-'পর বৈঠত, নিরখত যমুনা-পানে—
বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত, পরান থেহ ন মানে।
গহনতিমির নিশি, ঝিল্লিমুখর দিশি' শূন্য কদমতরুমূলে
ভূমিশয়ন-'পর আকুলকুন্তল রোদই আপন ভুলে।
মুগুধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু পরিহরি সব গৃহকাজে,
চাহি শূন্য-'পর কহে করুণস্বর— বাজে বাঁশরি বাজে।

নিঠুর শ্যাম রে, কৈসন অব তুঁহু রহই দূর মথুরায়—
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি, কৈস দিবস তব যায় !
কৈস মিটাওসি প্রেমপিপাসা, কঁহা বজাওসি বাঁশি !
পীতবাস তুঁহু কথি রে ছোড়লি, কথি সো বঙ্কিম হাসি !
কনকহার অব পহিরলি কণ্ঠে, কথি ফেকলি বনমালা !
হৃদিকমলাসন শূন্য করলি রে; কনকাসন কর আলা !
এ দুখ চিরদিন রহল চিত্তমে, ভানু কহে— ছি ছি কালা !
ঝটিতি আও তুঁহু হমারি সাথে, বিরহব্যাকুলা বালা।

৫

সজনি সজনি রাধিকা লো, দেখ অবহুঁ চাহিয়া
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া ॥
পিনহ ঝটিত কুসুমহার, পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দুর দেকে সীঁথি করহ রাঙিয়া ॥
সহচরি সব নাচ নাচ মৃদুলগীত গাও রে,
চঞ্চল মঞ্জীররাব কুঞ্জগগন ছাও রে।
সজনি, অব উজার' মঁদির কনকদীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জভবন গন্ধসলিল ঢালিয়া ॥
মল্লিকা চমেলি বেলি কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূথি, গাঁথ জাতি, গাঁথ বকুলমালিকা ;
তৃষিতনয়ন ভানুসিংহ কুঞ্জপথম চাহিয়া—
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া ॥

৬

বঁধুয়া, হিয়া-পর আও রে !
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি, হমার মুখ-'পর চাও রে !
যুগ-যুগ-সম কত দিবস ভেল গত, শ্যাম, তু আওলি না—
চন্দ-উজর মধু-মধুর কুঞ্জ-'পর মুরলি বজাওলি না !

লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে, লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ!
শূন্য কুঞ্জবন, শূন্য হৃদয় মন, কঁহি তব ও মুখচন্দ!
ইথি ছিল আকুল গোপনয়নজল, কথি ছিল ও তব হাসি!
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট, কথি ছিল ও তব বাঁশি!
তুঝ মুখ চাহয়ি শতযুগভর দুখ ক্ষণে ভেল অবসান।
লেশ হাসি তুঝ দূর করল রে, বিপুল খেদ-অভিমান।
ধন্য ধন্য রে, ভানু গাহিছে, প্রেমক নাহিক ওর।
হরখে পুলকিত জগত-চরাচর দুঁহুঁক প্রেমরস-ভোর॥

৭

শুন, সখি, বাজই বাঁশি।
শশিকরবিহ্বল নিখিল শূন্যতল এক হরষরসরাশি।
দক্ষিণপবনবিচঞ্চল তরুগণ, চঞ্চল যমুনাবারি।
কুসুমসুবাস উদাস ভইল সখি উদাস হৃদয় হমারি।
বিগলিত মরম, চরণ খলিতগতি, শরম ভরম গয়ি দূর।
নয়ন বারিভর, গরগর অন্তর, হৃদয় পুলকপরিপূর।
কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি, সো কি হমারি শ্যাম॥
গগনে গগনে ধ্বনিছে বাঁশরি সো কি হমারি নাম।
কত কত যুগ, সখি, পুণ্য করনু হম, দেবত করনু ধেয়ান—
তব্‌ত মিলল, সখি, শ্যামরতন মম— শ্যাম পরানক প্রাণ।
শুনত শুনত তব্‌ মোহন বাঁশি জপত জপত তব্‌ নামে
সাধ ভইল ময়্‌ প্রাণ মিলায়ব চাঁদ-উজল যমুনামে!
চলহ তুরিতগতি, শ্যাম চকিত অতি— ধরহ সখীজন-হাত।
নীদমগন মহী, ভয় ডর কছু নহি, ভানু চলে তব সাথ॥

৮

গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো॥

পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয়ে প্রণয়কুসুমরাশ,
হরিণনেত্রে বিমল হাস, কুঞ্জবনমে আও লো ॥
ঢালে কুসুম সুরভভার, ঢালে বিহগসুরবসার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার বিমল রজতভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি, পুঞ্জে পুঞ্জে বকুল যূথি জাতি রে ॥
দেখ, লো সখি, শ্যামরায় নয়নে প্রেম উথল যায়—
মধুর বদন অমৃতসদন চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনিবৃন্দ, হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ—
শ্যামকো পদারবিন্দ ভানুসিংহ বন্দিছে ॥

৯

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী শূন্য নিকুঞ্জ-অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে বালা বিরহবিষণ্ণ ॥
নীল আকাশে তারক ভাসে, যমুনা গাওত গান।
পাদপ-মরমর, নির্ঝর-ঝরঝর, কুসুমিত বল্লিবিতান।
তৃষিত নয়ানে বনপথপানে নিরখে ব্যাকুল বালা—
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে, গাঁথে বনফুলমালা!
সহসা রাধা চাহল সচকিত, দূরে খেপল মালা—
কহল, সজনি, শুন বাঁশরি বাজে, কুঞ্জে আওল কালা।
চকিত গহন নিশি দূর দূর দিশি বাজত বাঁশি সুতানে—
কণ্ঠ মিলাওল ঢলঢল যমুনা কলকল কল্লোলগানে।
ভনে ভানু— অব শুন গো কানু, পিয়াসিত গোপিনিপ্রাণ
তোঁহার পীরিত বিমল অমৃতরস হরষে করবে পান ॥

১০

বজাও রে মোহন বাঁশি।
সারা দিবসক বিরহদহনদুখ
মরমক তিয়াষ নাশি ॥

রিঝ-মন-ভেদন বাঁশরিবাদন
কঁহা শিখলি রে কান !—
হানে থিরথির মরম-অবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।
ধসধস করতহ উরহ বিয়াকুলু,
ঢুলু ঢুলু অবশ নয়ান।
কত শত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরান।
কত শত আশা পূরল না বঁধু,
কত সুখ করল পয়ান।
পহু গো, কত শত পীরিতযাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয় নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় ইহ যমুনা-বারিম
ডারব দগধ পরান।
সাধ যায়, বঁধু, রাখি চরণ তব
হৃদয়মাঝ হৃদয়েশ—
হৃদয়জুড়াওন বদনচন্দ্র তব
হেরব জীবনশেষ।
সাধ যায় ইহ চাঁদমকিরণে
কুসুমিত কুঞ্জবিতানে
বসন্তবায়ে প্রাণ মিশায়ব
বাঁশিক সুমধুর তানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু॥

১১

আজু, সখি, মুহু মুহু গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু দোঁহার পানে চায়।
যুবনমদবিলসিত পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত মূরছি জনু যায়।
আজু মধু চাঁদনী প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী, শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর, কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর কুসুমবনমাঝ।
মলয় মৃদু কলয়িছে, চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে, অঞ্চল লুটায়।
আধফুট শতদল বায়ুভরে টলমল
আঁখি জনু ঢলঢল চাহিতে নাহি চায়।
অলকে ফুল কাঁপয়ি কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি খসয়ি পড়ু পায়।
ঝরই শিরে ফুলদল, যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল— ভানু মরি যায়॥

১২

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে হাস বিকাশত কায়,
কোন স্বপন অব দেখত মাধব, কহবে কোন হমায়!
নীদ-মেঘ-'পর স্বপন-বিজলি-সম রাধা বিলসত হাসি।
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব তুঁহুক প্রেমঋণরাশি।
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি, শ্যাম ঘুমায় হমারা।
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব শীতল জোছনধারা।
তারকমালিনী সুন্দরযামিনী অবহুঁ ন যাও রে ভাগি—
নিরদয় রবি অব কাহ তু আওলি, জ্বাললি বিরহক আগি।
ভানু কহত অব, রবি অতি নিষ্ঠুর, নলিনমিলন-অভিলাষে
কত নরনারীক মিলন টুটাওত, ডারত বিরহহুতাশে॥

১৩

বাদরবরখন, নীরদগরজন, বিজুলীচমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে আও তু কুঞ্জে নিতিনিতি মাধব মোর।
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু, বজরপাত যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম, ডর অতি লাগত মোয়।
অঙ্গবসন তব ভীঁখত মাধব, ঘন ঘন বরখত মেহ,
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয় কাহ উপেখবি দেহ॥
বইস বইস, পহু, কুসুমশয়ন-'পর পদযুগ দেহ পসারি।
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে কুন্তলভার উঘারি।
শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর, রাখ বক্ষ-'পর মোর।
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে বাহুমৃণালক ডোর।
ভানু কহে, বৃকভানুনন্দিনী, প্রেমসিন্ধু মম কালা
তোঁহার লাগয় প্রেমক লাগয় সব কছু সহবে জ্বালা॥

১৪

সখি রে, পিরীত বুঝবে কে!

আঁধার হৃদয়ক দুঃখকাহিনী বোলব, শুনবে কে।
রাধিকার অতি অন্তরবেদন কে বুঝবে অয়ি সজনী।
কে বুঝবে, সখি, রোয়ত রাধা কোন দুখে দিনরজনী।
কলঙ্ক রটায়ব জনি, সখি, রটাও— কলঙ্ক নাহিক মানি,
সকল তয়াগব লভিতে শ্যামক একঠো আদরবাণী।
মিনতি করি লো সখি, শত শত বার, তু শ্যামক না দিহ গারি-
শীল মান কুল অপনি, সজনি, হম চরণে দেয়নু ডারি।
সখি লো, বৃন্দাবনকো দুরুজন মানুখ পিরীত নাহিক জানে,
বৃথাই নিন্দা কাহ রটায়ত হমার শ্যামক নামে।
কলঙ্কিনী হম রাধা, সখি লো, ঘৃণা করহ জনি মনমে।
ন আসিও তব্ কবহুঁ, সজনি লো, হমার আঁধা ভবনমে।
কহে ভানু অব, বুঝবে না, সখি, কোহি মরমকো বাত—
বিরলে শ্যামক কহিও বেদন বক্ষে রাখয়ি মাথ॥

১৫

হম, সখি, দারিদ নারী।

জনম অবধি হম পীরিতি করনু, মোচনু লোচনবারি।
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গুণ, দুখিনী আহির জাতি—
নাহি জানি কছু বিলাস-ভঙ্গিম যৌবনগরবে মাতি—
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি পীরিত করনে জানি।
এক নিমিখ পল নিরখি শ্যাম জনি, সোই বহুত করি মানি।
কুঞ্জপথে যব নিরখি সজনি হম শ্যামক চরণক চীনা
শত শত বেরি ধূলি চুম্বি সখি, রতন পাই জনু দীনা।
নিঠুর বিধাতা, এ দুখজনমে মাঙব কি তুয়া-পাশ।
জনম-অভাগী উপেখিতা হম বহুত নাহি করি আশ—
দূর থাকি হম রূপ হেরইব, দূরে শুনইব বাঁশি,
দূর দূর রহি সুখে নিরীখিব শ্যামক মোহন হাসি।
শ্যামপ্রেয়সি রাধা! সখি লো! থাক' সুখে চিরদিন—
তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি, অভাগিনী গুণহীন।
আপন দুখে, সখি, হম রোয়ব লো, নিভৃতে মুছইব বারি।
কোহি ন জানব, কোন বিষাদে তন-মন দহে হমারি।

ভানুসিংহ ভনয়ে, শুন কালা,
দুখিনী অবলা বালা—

উপেখার অতি তিখিনী বাণে না দিহ না দিহ জ্বালা॥

১৬

মাধব, না কহ আদরবাণী, না কর প্রেমক নাম।
জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা ছলনা না কর শ্যাম।
কপট, কাহ তুঁহু ঝূট বোলসি, পীরিত করসি তু মোয়।
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্ননু, না পতিয়াব রে তোয়।
ছিদল-তরী-সম কপট প্রেম-'পর ডারনু যব মনপ্রাণ
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে, অব কুত নাহিক ত্রাণ।

মাধব, কঠোর বাত হমারা মনে লাগল কি তোর।
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ, ক্ষমহ গো কুবচন মোর!
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব, তুঁহুঁ মম প্রাণক প্রাণ।
অতিশয় নির্মম, ব্যথিনু হিয়া তব ছোড়য়ি কুবচনবাণ।
মিটল মান অব— ভানু হাসতহিঁ হেরই পীরিতলীলা।
কভু অভিমানিনী আদরিণী কভু পীরিতিসাগর বালা॥

১৭

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব মথুরাপুর যব যায়
করল বিষম পণ মানিনী রাধা রোয়বে না সো, না দিবে বাধা,
কঠিন-হিয়া সই হাসয়ি হাসয়ি শ্যামক করব বিদায়।
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা, বয়ন-পান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল— দণ্ড দণ্ড, সখি, চাহয়ি রহল—
মন্দ মন্দ, সখি— নয়নে বহল বিন্দু বিন্দু জলধার।
মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে, কহল শ্যাম কত মৃদু মধু ভাষে।
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান, গদগদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদিল রাধা— গদগদ ভাষ নিকাশল আধা—
শ্যামক চরণে বাহু পসারি কহল, শ্যাম রে, শ্যাম হমারি,
রহ তুঁহু, রহ তুঁহু, বঁধু গো রহ তুঁহু, অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু-
তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব, আছয় কোন হমার!
পড়ল ভূমি-'পর শ্যামচরণ ধরি, রাখল মুখ তছু শ্যামচরণ-'পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি রজনী করল প্রভাত।
মাধব বৈসল, মৃদু মধু হাসল,
কত অশোয়াস-বচন মিঠ ভাবল, ধরইল বালিক হাত।
সখি লো, সখি লো, বোল ত সখি লো, যত দুখ পাওল রাধা,
নিঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে পাওল তছু কছু আধা।
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি দূর দূর চলি গেল।

অব সো মথুরাপুরক পন্থমে ইহ যব রোয়ত রাধা।
মরমে কি লাগল তিলভর বেদন, চরণে কি তিলভর বাধা।
বরখি আঁখিজল ভানু কহে, অতি দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু কাঁদিবার কো নাই॥

১৮

বার বার, সখি, বারণ করনু ন যাও মথুরাধাম
বিসরি প্রেমদুখ রাজভোগ যথি করত হমারই শ্যাম।
ধিক্ তুঁহু দাম্ভিক, ধিক্ রসনা ধিক্, লইলি কাহারই নাম।
বোল ত সজনি, মথুরা-অধিপতি সো কি হমারই শ্যাম।
ধনকো শ্যাম সো, মথুরাপুরকো, রাজ্যমানকো হোয়।
নহ পীরিতিকো, ব্রজকামিনীকো, নিচয় কহনু ময় তোয়।
যব তুঁহু ঠারবি সো নব নরপতি জনি রে করে অবমান—
ছিন্নকুসুমসম ঝরব ধরা-'পর, পলকে খোয়ব প্রাণ।
বিসরল বিসরল সো সব বিসরল বৃন্দাবনসুখসঙ্গ—
নব নগরে, সখি, নবীন নাগর— উপজল নব নব রঙ্গ।
ভানু কহত, অয়ি বিরহকাতরা, মনমে বাঁধহ থেহ—
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলি না হমার শ্যামক লেহ॥

১৯

হম যব না রব, সজনী,
নিভৃত বসন্তনিকুঞ্জবিতানে আসবে নির্মল রজনী—
মিলনপিপাসিত আসবে যব, সখি, শ্যাম হমারি আশে,
ফুকারবে যব 'রাধা রাধা' মুরলি ঊরধ শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই যব হম আওব না,
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই যব হম জাগব না,
তব কি কুঞ্জপথ হমারি আশে হেরবে আকুল শ্যাম।
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে 'রাধা রাধা' নাম।
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম, শ্যামক শত শত নারী—
হম যব যাওব শত শত রাধা চরণে রহবে তারি।

তব্ সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে, কাহ তয়াগব দে।
হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে কহ, সখি, রোয়ব কে।
ভানু কহে চুপি, মানভরে রহ, আও বনে ব্রজনারী-
মিলবে শ্যামক থরথর আদর, ঝরঝর লোচনবারি॥

২০

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন, আঁখ-উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম-সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয়কমল তব চরণে টলমল, নয়নযুগল মম উছলে ছলছল
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়! কো তুঁহু বোলবি মোয়!
বাঁশরিধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল, শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল
চরণকমলযুগ ছোঁয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়!
গোপবধূজন বিকশিতযৌবন, পুলকিত যমুনা মুকুলিত উপবন,
নীল নীর-'পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়!
তৃষিত আঁখি তব মুখ-'পর বিহরই, মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা থোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়!
'কো তুঁহু' 'কো তুঁহু' সবজন পুছয়ি, অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু সব সংশয় ঘুচয়ি—
জনম চরণ-'পর গোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়॥

নাট্যগীতি

১

জল্ জল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ—

পরান সঁপিবে বিধবা বালা।

জলুক জলুক চিতার আগুন,

জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥

শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,

যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে

সাক্ষী র'লেন দেবতা তার—

এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,

দেখ্ রে চন্দ্রমা, দেখ্ রে গগন,

স্বর্গ হতে সব দেখো দেবগণ—

জলদ্-অক্ষরে রাখো গো লিখে।

স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে,

সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ

রাজপুত-সতী আজিকে কেমন

সঁপিছে পরান অনলশিখে॥

২

হৃদয়ে রাখো গো দেবী, চরণ তোমার।

এসো মা করুণারানী, ও বিধুবদনখানি

হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।

এসো আদরিনী বাণী, সমুখে আমার॥

মৃদু মৃদু হাসি হাসি বিলাও অমৃতরাশি,

আলোয় করেছ আলো, জ্যোতিপ্রতিমা—

তুমি গো লাবণ্যলতা, মূর্তি-মধুরিমা।
বসন্তের বনবালা অতুল রূপের ডালা,
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার—
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার॥
অদর্শন হলে তুমি ত্যেজি লোকালয়ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে।
হেরে মোরে তরুলতা বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুলবনে।
'হা দেবী' 'হা দেবী' বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার—
হেরিব জগত শুধু আঁধার— আঁধার॥

৩

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে গাও গো॥
ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়—
রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো॥
নিশার কুহকবলে নীরবতাসিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্বচরাচর—
প্রশান্ত সাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর।
তটিনী কী শান্ত আছে— ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদুহস্ত-পরশে এমনি
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বনধ্বনি শুনে চমকে আপনি।
তাই বলি, অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো—
রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো॥

৪

ক্ষমা করো মোরে সখী, শুধায়ো না আর—
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার ॥
যে গোপন কথা, সখী, সতত লুকায়ে রাখি
ইষ্টদেবমন্ত্রসম পূজি অনিবার।
তাহা মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে—
লুকানো থাক তা, সখী, হৃদয়ে আমার ॥
ভালোবাসি, শুধায়ো না কারে ভালোবাসি।
সে নাম কেমনে, সখী, কহিব প্রকাশি।
আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ— সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার ॥
ক্ষুদ্র এই বনফুল পৃথিবীকাননে
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন-দিন পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি,
আজন্ম-নীরবে বহি যায় প্রাণ তার ॥

৫

সখী, আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন
হাহা করে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লয়ে।
পারি নে, পারি নে আর— পাষাণ মনের ভার
বহিয়া পড়েছি, সখী, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে।
সম্মুখে জীবন মম হেরি মরুভূমিসম,
নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস।
উঠিতে শকতি নাই যে দিকে ফিরিয়া চাই
শূন্য— শূন্য— মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ।
কে আছে, কে আছে সখী, এ শ্রান্ত মস্তক মম
বুকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননীসম।
মন, যত দিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়—
শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি ॥

৬

কত দিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে,
তবু জানিতাম নাকো ভালোবাসি তোরে।
মনে আছে ছেলেবেলা কত যে খেলেছি খেলা,
কুসুম তুলেছি কত দুইটি আঁচল ভ'রে।
ছিনু সুখে যতদিন দুজনে বিরহহীন
তখন কি জানিতাম ভালোবাসি তোরে!
অবশেষে এ কপাল ভাঙিল যখন,
ছেলেবেলাকার যত ফুরালো স্বপন,
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী—
তখন জানিনু, সখী, কত ভালোবাসি॥

৭

নাচ্ শ্যামা, তালে তালে॥
রুনু রুনু ঝুনু বাজিছে নূপুর, মৃদু মৃদু মধু উঠে গীতস্বর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি, তালে তালে উঠে করতালিধ্বনি—
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে॥
নিরালয় তোর বনের মাঝে সেথা কি এমন নূপুর বাজে!
এমন মধুর গান? এমন মধুর তান?
কমলকরের করতালি হেন দেখিতে পেতিস কবে?—
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে॥

৮

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই, প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা-ঘেরা জানালা-মাঝারে একটি মধুর মুখ॥
চারি দিকে তার ফুটে আছে ফুল— কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল,
দুয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া, দুয়েকটি আছে কপোলে নুইয়া,
কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়ে চুমিয়া আছে চিবুক।
বসন্তপ্রভাতে লতার মাঝারে মুখানি মধুর অতি—
অধর-দুটির শাসন টুটিয়া রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটি আঁখি-'পরে মেলিছে মিশিছে তরল চপল জ্যোতি॥

৯

খেলা কর্, খেলা কর্ তোরা কামিনীকুসুমগুলি।
দেখ্ সমীরণ লতাকুঞ্জে গিয়া কুসুমগুলির চিবুক ধরিয়া
ফিরায়ে এ ধার, ফিরায়ে ও ধার, দুইটি কপোল চুমে বারবার
মুখানি উঠায়ে তুলি।
তোরা খেলা কর্, তোরা খেলা কর্ কামিনীকুসুমগুলি।
কভু পাতা-মাঝে লুকায়ে মুখ, কভু বায়ু-কাছে খুলে দে বুক,
মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ্ কভু নাচ্ বায়ু-কোলে দুলি দুলি।
দু দণ্ড বাঁচিবি, খেলা তবে খেলা— প্রতি নিমিষেই ফুরাইছে বেলা,
বসন্তের কোলে খেলাশ্রান্ত প্রাণ ত্যজিবি ভাবনা ভুলি॥

১০

আঁধার শাখা উজল করি হরিত-পাতা-ঘোমটা পরি
বিজন বনে, মালতীবালা, আছিস কেন ফুটিয়া॥
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু আসে না হেথা ছুটিয়া॥
মলয় তব প্রণয়-আশে ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে,
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর শরমে-মাখা মুখানি।
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি মধুর স্বরে বনের পাখি
লভিয়া তোর সুরভিশ্বাস যায় না তোরে বাখানি॥

১১

সখী, ভাবনা কাহারে বলে। সখী, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বলো দিবস-রজনী 'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা'—
সখী, ভালোবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময়।
সে কি কেবলই চোখের জল? সে কি কেবলই দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কী সুখেরই তরে এমন দুখের আশ।

আমার চোখে তো সকলই শোভন,
সকলই নবীন, সকলই বিমল, সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল— সকলই আমার মতো।
তারা কেবলই হাসে, কেবলই গায়, হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়-
না জানে বেদন, না জানে রোদন, না জানে সাধের যাতনা যত।
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে, জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোকসাগরে আকাশের তারা তেয়াগে কায়।
আমার মতন সুখী কে আছে। আয় সখী, আয় আমার কাছে—
সুখী হৃদয়ের সুখের গান শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল একদিন নয় হাসিবি তোরা—
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা॥

১২

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি,
তবু হরষের হাসি ফুটে-ফুটে ফুটে না।
কখনো বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা শরমে বাধে, মন উঠে উঠে না।
রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি—
চরণ-বারণ-তরে উঠে-উঠে উঠে না।
কাতর নিশ্বাস ফেলি আকুল নয়ন মেলি
চাহি থাকে, লাজবাঁধ তবু টুটে টুটে না।
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না।
সহসা উঠিলে জাগি তখন কিসের লাগি
শরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না।
লাজময়ী, তোর চেয়ে দেখি নি লাজুক মেয়ে,
প্রেমবরিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না॥

১৩

যে ভালোবাসুক সে ভালোবাসুক সজনি লো, আমরা কে!
দীনহীন এই হৃদয় মোদের কাছেও কি কেহ ডাকে।
তবে কেন বলো ভেবে মরি মোরা কে কাহারে ভালোবাসে!
আমাদের কিবা আসে যায় বলো কেবা কাঁদে কেবা হাসে!
আমাদের মন কেহই চাহে না, তবে মনখানি লুকানো থাক্—
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্।
যদি, সখী, কেহ ভুলে মনখানি লয় তুলে,
উলটি-পালটি ক্ষণেক ধরিয়া পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখনি ধূলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে নিদারুণ উপেখায়।
কাজ কী লো, মন লুকানো থাক্, প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্—
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্।

১৪

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙে গেল— গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর।
তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার—
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার
নাই বা দিলে তা মোরে, থাকো হৃদি আলো করে,
হৃদয়ে থাকুক জেগে সৌন্দর্য তোমার।

১৫

কিছুই তো হল না।
সেই সব— সেই সব— সেই হাহাকাররব,
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা।
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই।
ভালো তো গো বাসিলাম, ভালোবাসা পাইলাম,
এখনো তো ভালোবাসি— তবুও কী নাই।

১৬

কী করিব বলো, সখা, তোমার লাগিয়া।
কী করিলে জুড়াইতে পারিব ও হিয়া॥
এই পেতে দিনু বুক, রাখো, সখা, রাখো মুখ—
ঘুমাও তুমি গো, আমি রহিনু জাগিয়া।
খুলে বলো, বলো সখা, কী দুঃখ তোমার—
অশ্রুজলে মিলাইব অশ্রুজলধার!
একদিন বলেছিলে মোর ভালোবাসা
পাইলে পুরিবে তব হৃদয়ের আশা।
কই সখা, প্রাণ মন করেছি তো সমর্পণ—
দিয়েছি তো যাহা-কিছু আছিল আমার।
তবু কেন শুকালো না অশ্রুজলধার॥

১৭

না সখা, মনের ব্যথা কোরো না গোপন।
যবে অশ্রুজল হায় উচ্ছুসি উঠিতে চায়
রুধিয়া রেখো না তাহা আমারি কারণ।
চিনি, সখা, চিনি তব ও দারুণ হাসি—
ওর চেয়ে কত ভালো অশ্রুজলরাশি।
মাথা খাও— অভাগীরে কোরো না বঞ্চনা,
ছদ্মবেশে আবরিয়া রেখো না যন্ত্রণা।
মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে,
ভালো যদি বাস তবে রাখো এ প্রার্থনা॥

১৮

বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙেছে প্রণয়!
ও মিছে আদর তবে না করিলে নয়?।
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা— সে-সব পুরানো কথা
মনে ক'রে দেয় শুধু, ভাঙে এ হৃদয়॥

প্রতি হাসি প্রতি কথা প্রতি ব্যবহার
আমি যত বুঝি তত কে বুঝিবে আর।
প্রেম যদি ভুলে থাক সত্য ক'রে বলো-নাকো—
করিব না মুহূর্তের তরে তিরস্কার॥
আমি তো ব'লেই ছিনু, ক্ষুদ্র আমি নারী
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী।
আর-কারে ভালোবেসে সুখী যদি হও শেষে
তাই ভালোবেসো নাথ, না করি বারণ।
মনে ক'রে মোর কথা মিছে পেয়ো নাকো ব্যথা,
পুরানো প্রেমের কথা কোরো না স্মরণ॥

১৯

তুই রে বসন্তসমীরণ।
তোর নহে সুখের জীবন॥
কিবা দিবা কিবা রাতি পরিমলমদে মাতি
কাননে করিস বিচরণ।
নদীরে জাগায়ে দিস লতারে রাগায়ে দিস
চুপিচুপি করিয়া চুম্বন
তোর নহে সুখের জীবন॥

শোন্ বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়।
নিভৃত নিকুঞ্জ ছায় হেলিয়া ফুলের গায়
শুনিয়া পাখির মৃদু গান
লতার-হৃদয়ে-হারা সুখে-অচেতন-পারা
ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ।
তাই বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়॥

২০

বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার, চাহিয়া দেখিল চারি ধার ॥
উষারানী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা। হরষে কপোল তার রাঙা ॥
মধুকর গান গেয়ে বলে, 'মধু কই। মধু দাও দাও।'
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে ফুল বলে, 'এই লও লও।'
বায়ু আসি কহে কানে কানে, 'ফুলবালা, পরিমল দাও।'
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল, 'যাহা আছে সব লয়ে যাও।'
হরষ ধরে না তার চিতে, আপনারে চাহে বিলাইতে,
বালিকা আনন্দে কুটি-কুটি পাতায় পাতায় পড়ে লুটি ॥

২১

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল—
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার, চাহিয়া দেখিল চারি ধার ॥
শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারি দিকে কেহ নাই আর— নিরদয় অসীম সংসার ॥
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
একবিন্দু শিশিরের কণা— কেহ না, কেহ না ॥
মধুকর কাছে এসে বলে, 'মধু কই। মধু চাই, চাই।'
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল বলে, 'কিছু নাই, নাই।'
'ফুলবালা, পরিমল দাও' বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
মলিন বদন ফিরাইয়া ফুল বলে, 'আর কী বা আছে।'
মধ্যাহ্নকিরণ চারি দিকে খরদৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে—
ফুলটির মৃদু প্রাণ হায়,
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় ॥

২২

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে!
বিভূতিভূষিত শুভ্র দেহ, নাচিছ দিক্-বসনে ॥
মহা-আনন্দে পুলক কায়, গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়—
জটাজূট ছায় গগনে ॥

২৩

ভিক্ষে দে গো, ভিক্ষে দে।
দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে।
লক্ষ্মী তোদের সদয় হোন, ধনের উপর বাড়ুক ধন—
আমি একটি মুঠো অন্ন চাই গো, তাও কেন পাই নে।
ওই রে সূর্য উঠল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে।
পিপাসাতে ফাটছে ছাতি, চলতে আর যে পারি নে।
ওরে তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে—
একটি মুঠো দিবি শুধু আর কিছু চাহি নে ॥

২৪

আয় রে আয় রে সাঁঝের বা, লতাটিরে দুলিয়ে যা—
ফুলের গন্ধ দেব তোরে আঁচলটি তোর ভ'রে ভ'রে ॥
আয় রে আয় রে মধুকর, ডানা দিয়ে বাতাস কর্—
ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে ফুলের মধু যাবি নিয়ে ॥
আয় রে চাঁদের আলো আয়, হাত বুলিয়ে দে রে গায়—
পাতার কোলে মাথা থুয়ে ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে।
পাখি রে, তুই কোস্ নে কথা— ওই-যে ঘুমিয়ে প'ল লতা ॥

২৫

প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে
রাঙা চরণতলে নেচে নেচে ॥

টিপ্‌টিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা—
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে ॥

২৬

কথা কোস্‌ নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন ক'রে মন কেড়েছে ॥
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি—
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে ॥

২৭

ওই জানালার কাছে বসে আছে করতলে রাখি মাথা—
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে, সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা ॥
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায় তার কানে কানে কী যে কহে যায়-
তাই আধো শুয়ে আধো বসিয়ে ভাবিতেছে কত কথা ॥
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়, উড়ে উড়ে যায় পাখি—
সারা দিন ধ'রে বকুলের ফুল ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস, মধুর আবেশ, মধুর মুখের হাসিটি—
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে বাজিছে মধুর বাঁশিটি ॥

২৮

সাধ ক'রে কেন, সখা, ঘটাবে গেরো।
এই বেলা মানে-মানে ফেরো ফেরো।
পলক যে নাই আঁখির পাতায়,
তোমার মনটা কি খরচের খাতায়,—
হাসি ফাঁসি দিয়ে প্রাণে বেঁধেছে গেরো।
সখা, ফেরো ফেরো ॥

২৯

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো হে,
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসো হে ॥

হৃদয়কাননে ফুল ফুটাও। আধো নয়নে, সখী, চাও চাও—
পরান কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো হে ॥

৩০

তুমি আছ কোন্ পাড়া? তোমার পাই নে যে সাড়া।
পথের মধ্যে হাঁ ক'রে যে রইলে হে খাড়া ॥
রোদে প্রাণ যায় দুপুর বেলা, ধরেছে উদরে জ্বালা—
এর কাছে কি হৃদয়জ্বালা।
তোমার সকল সৃষ্টিছাড়া ॥
রাঙা অধর, নয়ন কালো ভরা পেটেই লাগে ভালো—
এখন পেটের মধ্যে নাড়ীগুলো দিয়েছে তাড়া ॥

৩১

দেখো ওই কে এসেছে।— চাও সখী, চাও।
আকুল পরান ওর আঁখিহিল্লোলে নাচাও।— সখী, চাও ॥
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখ-পানে,
হাসিসুধা-দানে বাঁচাও।— সখী, চাও ॥

৩২

ভালো যদি বাস, সখী, কী দিব গো আর—
কবির হৃদয় এই দিব উপহার ॥
এত ভালোবাসা, সখী, কোন্ হৃদে বলো দেখি—
কোন্ হৃদে ফুটে এত ভাবের কুসুমভার ॥
তা হলে এ হৃদিধামে তোমারি তোমারি নামে
বাজিবে মধুর স্বরে মরমবীণার তার।
যা-কিছু গাহিব গান ধ্বনিবে তোমারি নাম—
কী আছে কবির বলো, কী তোমারে দিব আর ॥

৩৩

ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে ওলো সজনী।
হাসি খেলি রে মনের সুখে,
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার-মুখে
দিনরজনী॥

৩৪

ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরষিল।
দাঁড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে, সহসা দেখিলেম তারে—
নয়ন দুটি তুলে কেন মুখের পানে চেয়ে গেল॥

৩৫

হা, কে বলে দেবে সে ভালোবাসে কি মোরে।
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়,
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী—
যাব কি কাছে তার। শুধাব চরণ ধ'রে ?।

৩৬

কেন রে চাস ফিরে ফিরে, চলে আয় রে চলে আয়॥
এরা প্রাণের কথা বোঝে না যে, হৃদয়কুসুম দলে যায়॥
হেসে হেসে গেয়ে গান দিতে এসেছিলি প্রাণ,
নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয় রে চলে আয়॥

৩৭

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে।
চারি দিকে হাসিরাশি, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে॥
আন্ সখী, বীণা আন্, প্রাণ খুলে কর্ গান,
নাচ্ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে—
তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে॥

বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস নে—
কেমনে যাবে বেদনা।
কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি,
জোছনা কেমন ফুটেছে—
তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে॥

৩৮

সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ
তাহা বুঝিলে না তুমি— মনে রয়ে গেল দুখ॥
অভিমান-আঁখিজল, নয়ন ছলছল—
মুছাতে লাগে ভালো কত
তাহা বুঝিলে না তুমি— মনে রয়ে গেল দুখ॥

৩৯

এত ফুল কে ফোটালে কাননে!
লতাপাতায় এত হাসি -তরঙ্গ মরি কে ওঠালে॥
সজনীর বিয়ে হবে ফুলেরা শুনেছে সবে—
সে কথা কে রটালে॥

৪০

আমাদের সখীরে কে নিয়ে যাবে রে—
তারে কেড়ে নেব, ছেড়ে দেব না— না— না।
কে জানে কোথা হতে কে এসেছে।
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে— দেব' না॥
সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব, হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,
বেঁধে তায় রেখে দেব' কুসুমবনে— সখীরে নিয়ে যেতে দেব' না॥

৪১

কোথা ছিলি সজনী লো,
মোরা যে তোরি তরে বসে আছি কাননে।

এসো সখী, এসো হেথা বসি বিজনে
আঁখি ভরিয়ে হেরি হাসিমুখানি ॥
সাজাব সখীরে সাধ মিটায়ে,
ঢাকিব তনুখানি কুসুমেরই ভূষণে।
গগনে হাসিবে বিধু, গাহিব মৃদু মৃদু—
কাটাব প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী ॥

৪২

ও কী কথা বল সখী, ছি ছি, ও কথা মনে এনো না ॥
আজি সুখের দিনে জগত হাসিছে,
হেরো লো দশ দিশি হরষে ভাসিছে—
আজি ও ম্লান মুখ প্রাণে যে সহে না।
সুখের দিনে, সখী, কেন ও ভাবনা ॥

৪৩

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেছে হাসি, নয়নে নয়ন ॥
মরমর মৃদু বাণী মরমর মরমে,
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর শরমে— নয়নে স্বপন ॥
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে—
বাতাস চুপিচুপি ফিরিছে কাছে কাছে।
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে, আড়ালে লুকাইয়ে
সখীরা নেহারিছে দোঁহার আনন—
হেসে আকুল হল বকুলকানন, আ মরি মরি ॥

৪৪

মা, একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন।
আঁধার ক'রে কোথায় যাবি শূন্যভবন ॥

মধুর মুখ হাসি-হাসি অমিয়া রাশি-রাশি, মা—
ও হাসি কোথায় নিয়ে যাস রে।
আমরা কী নিয়ে জুড়াব জীবন॥

৪৫

মা আমার, কেন তোরে ম্লান নেহারি—
আঁখি ছলছল, আহা।
ফুলবনে সখী-সনে খেলিতে খেলিতে হাসি হাসি দে রে করতালি।
আয় রে বাছা, আয় রে কাছে আয়।
দু দিন রহিবি, দিন ফুরায়ে যায়—
কেমনে বিদায় দেব' হাসিমুখ না হেরি॥

৪৬

ওই আঁখি রে!
ফিরে ফিরে চেয়ো না, চেয়ো না, ফিরে যাও—
কী আর রেখেছ বাকি রে।
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ—
কী সুখে পরান আর রাখি রে॥

৪৭

আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজবে বাঁশি যমুনাতীরে
আমরা কী করব। কী বেশ ধরব।
কী মালা পরব। বাঁচব কি মরব সুখে।
কী তারে বলব। কথা কি রবে মুখে।
শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে
দাঁড়ায়ে ভাসব নয়ননীরে॥

৪৮

রাজ-অধিরাজ, তব ভালে জয়মালা—
ত্রিপুরপুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা॥
ক্ষীণজনভয়তরণ তব অভয় বাণী, দীনজনদুখহরণনিপুণ, তব পাণি,
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণরস-ঢালা॥
গুণিরসিকসেবিত উদার তব দ্বারে মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে—
গুণ-অরুণ-কিরণে তব সব ভুবন আলা॥

৪৯

ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটা মুণ্ডু বেয়ে।
ধরণী রাঙা হল রক্তে নেয়ে॥
ডাকিনী নৃত্য করে প্রসাদ -রক্ত-তরে—
তৃষিত ভক্ত তোমার আছে চেয়ে॥

৫০

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে। আমরা নৃত্য করি সঙ্গে॥
দশ দিক আঁধার ক'রে মাতিল দিক্‌-বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা—
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে॥
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে।
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে—
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে॥

৫১

থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই।
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কই॥
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে—
মুখ তো ফিরালি শেষে। অভয় চরণ কাড়লি কই॥

৫২

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই, বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি আয়, খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'
বনের পাখি বলে, 'না, আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়, আমি কেমনে বনে বাহিরিব।'

বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি বনের গান ছিল যত,
খাঁচার পাখি গাহে শিখানো বুলি তার— দোঁহার ভাষা দুইমত।
বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই, বনের গান গাও দেখি।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি ভাই, খাঁচার গান লহো শিখি।'
বনের পাখি বলে, 'না, আমি শিখানো গান নাহি চাই।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায় আমি কেমনে বনগান গাই।'

বনের পাখি বলে, 'আকাশ ঘন নীল কোথাও বাধা নাহি তার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'খাঁচাটি পরিপাটি কেমন ঢাকা চারি ধার।'
বনের পাখি বলে, 'আপনা ছাড়ি দাও মেঘের মাঝে একেবারে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'নিরালা কোণে বসে বাঁধিয়া রাখো আপনারে।'
বনের পাখি বলে, 'না, সেথা কোথায় উড়িবারে পাই!'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়, মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।'

এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে, তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে, বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা— কাতরে কহে, 'কাছে আয়!'
বনের পাখি বলে, 'না, কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার!'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়, মোর শকতি নাহি উড়িবার।'

৫৩

একদা প্রাতে কুঞ্জতলে অন্ধ বালিকা
পত্রপুটে আনিয়া দিল পুষ্পমালিকা ॥
কণ্ঠে পরি অশ্রুজল ভরিল নয়নে,
বক্ষে লয়ে চুমিনু তার স্নিগ্ধ বয়নে ॥
কহিনু তারে, 'অন্ধকারে দাঁড়ায়ে রমণী,
কী ধন তুমি করিছ দান না জানো আপনি।
পুষ্পসম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা,
দেখ নি নিজে মোহন কী যে তোমার মালিকা।'

৫৪

কেন নিবে গেল বাতি।
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে জাগিয়া বাসররাতি,
তাই নিবে গেল বাতি ॥

কেন ঝরে গেল ফুল।
আমি বক্ষে চাপিয়া ধরেছিনু তারে চিন্তিত ভয়াকুল,
তাই ঝরে গেল ফুল ॥

কেন মরে গেল নদী ॥
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি ধরিবারে পাইবারে নিরবধি,
তাই মরে গেল নদী ॥

কেন ছিঁড়ে গেল তার।
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে দিয়েছিনু ঝঙ্কার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার ॥

৫৫

তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।

যৌবনসমুদ্রমাঝে কোন্ পূর্ণিমায় আজি
এসেছে জোয়ার।
উচ্ছল পাগল নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে
এ মোর নির্জন তীরে কী খেলা তোমার!
মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে কত নৃত্যে কত সুরে
এস কাছে যাও দূরে শতলক্ষবার॥

কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ-'পরে
গোপন শিশিরছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত ক'রে।
নিঃশব্দ সৌরভরাশি পরানে পশিছে আসি
সুখস্বপ্ন পরকাশি নিভৃত অন্তরে।
পরশপুলকে ভোর চোখে আসে ঘুমঘোর,
তোমার চুম্বন মোর সর্বাঙ্গে সঞ্চরে।

৫৬

আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো চৈত্রনিশীথশশী।
তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে কী দেখিছ একা বসি
চৈত্রনিশীথশশী॥

কত নদীতীরে কত মন্দিরে কত বাতায়নতলে
কত কানাকানি, মন-জানাজানি সাধাসাধি কত ছলে।
শাখা-প্রশাখার দ্বার-জানালার আড়ালে আড়ালে পশি
কত সুখদুখ কত কৌতুক দেখিতেছ একা বসি
চৈত্রনিশীথশশী॥

মোরে দেখো চাহি— কেহ কোথা নাহি, শূন্যভবনছাদে
নৈশ পবন কাঁদে।
তোমারি মতন একাকী আপনি চাহিয়া রয়েছি বসি
চৈত্রনিশীথশশী॥

৫৭

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।'
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু, 'যাও!'
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি, তবু সে গেল না চলি।

দাঁড়ালো সমুখে ; কহিনু তাহারে, 'সরো!'
ধরিল দু হাত ; কহিনু, 'আহা, কী কর!'
সখী ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে, তবু ছাড়িল না মোরে।

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছিমিছি।
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, 'ছি ছি!'
সখী ওলো সখী, কহি লো শপথ ক'রে তবু সে গেল না স'রে।

অধরে কপোল পরশ করিল তবু।
কাঁপিয়া কহিনু, 'এমন দেখি নি কভু।'
সখী ওলো সখী, একি তার বিবেচনা, তবু মুখ ফিরালো না।

আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল।
কহিনু তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল!'
সখী ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়, মিছে তারে অনুনয়॥

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে।
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে।
সখী ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁখিনীরে— কেন সে এল না ফিরে॥

৫৮

এ কি সত্য সকলই সত্য, হে আমার চিরভক্ত॥
মোর নয়নের বিজুলি-উজল আলো
যেন ঈশান কোণের ঝটিকার মতো কালো এ কি সত্য।
মোর মধুর অধর বধূর নবীন অনুরাগ-সম রক্ত
হে আমার চিরভক্ত, এ কি সত্য॥

অতুল মাধুরী ফুটেছে আমার মাঝে,
মোর চরণে চরণে সুধাসঙ্গীত বাজে এ কি সত্য।
মোরে না হেরিয়া নিশির শিশির ঝরে,
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারি তরে এ কি সত্য।
মোর তপ্তকপোল-পরশে-অধীর সমীর মদিরমত্ত
হে আমার চিরভক্ত, এ কি সত্য॥

৫৯

এবার চলিনু তবে॥
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কলকোলাহল,
তরণীপতাকা চলচঞ্চল কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর, নির্মম আমি আজি।
আর নাই দেরি, ভৈরবভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

অরুণ তোমার তরুণ অধর করুণ তোমার আঁখি—
অমিয়রচন সোহাগবচন অনেক রয়েছে বাকি।
পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারে-বার আমারে ডাকিছে সবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর।
কিসেরই বা সুখ, ক' দিনের প্রাণ!
ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

৬০

বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি
আমরা দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জানো ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা নাইকো তাহে প্রতারণা,
টানো যখন মরণ-ফাঁসি বল নাকো মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

ধরার যারা সেরা সেরা মানুষ তারা তোমার ঘরে।
তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে॥
আমরা বরপুত্র তব যাহাই দিবে তাহাই লব,

তোমায় দিব ধন্যধ্বনি মাথায় বহি সর্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা, লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধ ভালে প্রলয়শিখা দিক্‌ মা, এঁকে তোমার টিকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা— জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে কপট সখার শূন্য হাসি।
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা-কাশী।
আত্মপরের-প্রভেদ-ভোলা জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,
থাকবে তুমি থাকব আমি সমানভাবে বারো মাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

শঙ্কা-তরাস লজ্জা-শরম চুকিয়ে দিলেম স্তুতি-নিন্দে।
ধুলো সে তোর পায়ের ধুলো তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, 'ঠাকুরানী, তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি তারেও ফাঁকি দিতে চাস।'
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

মৃত্যু যেদিন বলবে 'জাগো, প্রভাত হল তোমার রাতি'
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ—
বিদায়কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস॥

৬১

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না বীণার তন্ত্রী বিরতা।

সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ তোমার আরতিবারতা।
তব মন্দির স্থিরগম্ভীর, ভাঙা দেউলের দেবতা॥
তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ নববসন্তপবনে।
যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য, রাখে নি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার জনহীন ভাঙা ভবনে॥
পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারা দিন ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারি।
গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায় চির-উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে পূজাহীন তব পূজারি॥
ভাঙা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব, কত পূজানিশা বিগতা।
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা কত যায় কত কব তা—
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন ভাঙা দেউলের দেবতা॥

৬২

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ।
ডিশের পরে ডিশ
শুধু মটন কারি ফিশ,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়াল ডোজ।
পরের তহবিল
চোকায় উইল্‌সনের বিল—
থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে, কে কার রাখে খোঁজ॥

৬৩

অভয় দাও তো বলি আমার
wish কী—

একটি ছটাক সোডার জলে
পাকী তিন পোয়া হুইস্কি ॥

৬৪

কত কাল রবে বল' ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য ক'রে।
দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন—
ধর' হুইস্কি-সোডা আর মুর্গি-মটন।
যাও ঠাকুর চৈতন-চুট্‌কি নিয়া—
এস' দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিয়া।

৬৫

কী জানি কী ভেবেছ মনে
খুলে বলো ললনে।
কী কথা হায় ভেসে যায়
ওই ছলোছলো দুটি নয়নে।

৬৬

পাছে চেয়ে বসে আমার মন,
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা,
আমি তাই তো তুলি নে আঁখি ॥

৬৭

বড়ো থাকি কাছাকাছি,
তাই ভয়ে ভয়ে আছি।
নয়ন বচন কোথায় কখন
বাজিলে বাঁচি না-বাঁচি ॥

৬৮

যারে মরণ-দশায় ধরে
সে যে শতবার ক'রে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে
তত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে॥

৬৯

দেখব কে তোর কাছে আসে—
তুই রবি একেশ্বরী,
একলা আমি রইব পাশে॥

৭০

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক—
দেবে লিখে রাজার টিকে
প্রসন্ন ওই চোখ॥

৭১

চির-পুরানো চাঁদ,
চিরদিবস এমনি থেকো আমার এই সাধ॥
পুরানো হাসি পুরানো সুধা মিটায় মম পুরানো ক্ষুধা—
নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ॥

৭২

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে—
পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে,
ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধ'রে
বিষ্ণুদূতের মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে॥

৭৩

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়।
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে
ফুলে ফুলে হোক ফুলময়।
আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে
উছলিয়া হোক কূলময়॥

৭৪

সকলই ভুলেছে ভোলা মন।
ভোলে নি, ভোলে নি শুধু
ওই চন্দ্রানন॥

৭৫

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে।
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে॥

৭৬

বিরহে মরিব ব'লে ছিল মনে পণ,
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ॥
ভেবেছিনু অশ্রুজলে ডুবিব অকূলতলে—
কাহার সোনার তরী করিল তারণ॥

৭৭

কার হাতে যে ধরা দেব, প্রাণ,
তাই ভাবতে বেলা অবসান॥
ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন—
বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান॥

৭৮

ওগো হৃদয়বনের শিকারী,
মিছে তারে জালে ধরা যে তোমারি ভিখারি ॥
সহস্রবার পায়ের কাছে আপনি যে জন ম'রে আছে
নয়নবাণের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী ॥

৭৯

ওগো দয়াময়ী চোর, এত দয়া মনে তোর !
বড়ো দয়া ক'রে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর ।
বড়ো দয়া ক'রে চুরি ক'রে লও শূন্য হৃদয় মোর ॥

৮০

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া, বেগে বহে শিরাধমনী ।
হায় হায় হায়, ধরিবারে তায় পিছে পিছে ধায় রমণী ॥
বায়ুবেগভরে উড়ে অঞ্চল, লটপট বেণী দুলে চঞ্চল—
একি রে রঙ্গ ! আকুল-অঙ্গ ছুটে কুরঙ্গগমনী ॥

৮১

আমি কেবল ফুল জোগাব
তোমার দুটি রাঙা হাতে ।
বুদ্ধি আমার খেলে নাকো
পাহারা বা মন্ত্রণাতে ॥

৮২

মনোমন্দিরসুন্দরী ! মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা ! অয়ি মঞ্জুলা মুঞ্জরী !
রোষারুণরাগরঞ্জিতা ! বঙ্কিম-ভুরু-ভঞ্জিতা !
গোপনহাস্য-কুটিল-আস্য কপটকলহগঞ্জিতা !
সঙ্কোচনত-অঙ্গিনী ! ভয়ভঙ্গুরভঙ্গিনী !

চকিত চপল নবকুরঙ্গ যৌবনবনরঙ্গিণী!
অয়ি খলছলগুণ্ঠিতা! মধুকরভরকুণ্ঠিতা
লুব্ধপবন -ক্ষুব্ধ-লোভন মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা!
চুম্বনধনবঞ্চিনী দুরূহগর্বমঞ্চিনী!
রুদ্ধকোরক -সঞ্চিত-মধু কঠিনকনককঞ্জিনী॥

৮৩

তোমার কটি তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া—
কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া॥
বিহানবেলা আঙিনাতলে এসেছ তুমি কী খেলাছলে—
চরণ দুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া।
তোমার কটি-তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া॥

কিসের সুখে সহাস মুখে নাচিছ বাছনি—
দুয়ার-পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনি।
তাথেই-থেই তালির সাথে কাঁকন বাজে মায়ের হাতে—
রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে বেণুর পাঁচনি।
কিসের সুখে সহাস মুখে নাচিছ বাছনি।

নিখিল শোনে আকুল-মনে নূপুর-বাজনা,
তপন-শশী হেরিছে বসি তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে নয়ন-মাজনা।
নিখিল শোনে আকুল-মনে নূপুর-বাজনা॥

৮৪

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে।
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে॥
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী, শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি—
সঙ্কটশরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী
মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে॥

৮৫

আমরা বসব তোমার সনে—
তোমার শরিক হব রাজার রাজা,
তোমার আধেক সিংহাসনে ॥
তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত—
তারা জানে না যে মোদের গরব কত।
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি,
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে ॥

৮৬

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ।
সকলই যে স্বপ্ন ব'লে হতেছে বিশ্বাস ॥
তুমি গগনেরই তারা মর্তে এলে পথহারা—
এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরই হাস ॥

৮৭

কবরীতে ফুল শুকালো
কাননের ফুল ফুটল বনে ॥
দিনের আলো প্রকাশিল,
মনের সাধ রহিল মনে ॥

৮৮

মলিন-মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু নয়ন।
মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ।
অশ্রু-ধোওয়া কাজল-রেখা আবার চোখে দিক-না দেখা,
শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে কুসুমবন্ধন ॥

৮৯

ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি টুটবে না।
ওর মনের বেদন থাকবে মনে, প্রাণের কথা ফুটবে না?॥

কঠিন পাষাণ বুকে লয়ে নাই রহিল অটল হয়ে
প্রেমেতে ওই পাথর ক'য়ে চোখের জল কি ছুটবে না ?।

৯০

আজ আমার আনন্দ দেখে কে !
কে জানে বিদেশ হতে কে এসেছে—
ঘরে আমার কে এসেছে ! আকাশে উঠেছে চাঁদা,
সাগর কি থাকে বাঁধা— বসন্তরায়ের প্রাণে ঢেউ উঠেছে ॥

৯১

আর কি আমি ছাড়ব তোরে।
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম,
জোর ক'রে রাখিব ধ'রে।
শূন্য করে হৃদয়পুরী মন যদি করিলে চুরি
তুমিই তবে থাকো সেথায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ ক'রে ॥

৯২

যেখানে রূপের প্রভা নয়ন-লোভা
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে ঠাকুরদাদা।
যেখানে রসিকসভা পরম-শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে ঠাকুরদাদা।
যেখানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচা-কেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে ॥
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে ঠাকুরদাদা ॥

৯৩

এই একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর,
এই আমাদের মজার মানুষ দাদাঠাকুর॥
এই তো নানা কাজে, এই তো নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ দাদাঠাকুর।
সব মিলনে মেলার মানুষ দাদাঠাকুর॥
এই তো হাসির দলে, এই তো চোখের জলে,
এই তো সকল ক্ষণের মানুষ দাদাঠাকুর।
এই তো ঘরে ঘরে, এই তো বাহির করে
এই আমাদের কোণের মানুষ দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মনের মানুষ দাদাঠাকুর॥

৯৪

বাজে রে বাজে রে
ওই রুদ্রতালে বজ্রভেরী—
দলে দলে চলে প্রলয়রঙ্গে বীরসাজে রে!
দ্বিধা ত্রাস আলস নিদ্রা ভাঙে লাজে রে!
উড়ে দীপ্ত বিজয়কেতু শূন্য মাঝে রে!
আছে কে পড়িয়া পিছে মিছে কাজে রে॥

৯৫

মোরা চলব না।
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না॥
সূর্যতারা আগুন ভুগে জ্ব'লে মরুক যুগে যুগে—
আমরা যতই পাই-না জ্বালা জ্বলব না॥
বনের শাখা কথা বলে, কথা জাগে সাগরজলে—
এই ভুবনে আমরা কিছুই বলব না।
কোথা হতে লাগে রে টান, জীবন-জলে ডাকে রে বান—
আমরা তো এই প্রাণের টলায় টলব না॥

৯৬

পথে যেতে তোমার সাথে মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।
দেখা তোমায় হোক বা না-হোক
তাহার লাগি করব না শোক—
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার চরণ ঢাকি এলো কেশে॥

৯৭

আমার নিকড়িয়া-রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।
আমার ঘর বলে, 'তুই কোথায় যাবি, বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি!'
আমার প্রাণ বলে, 'তোর যা আছে সব যাক্-না উড়ে পুড়ে।'
ওগো, যায় যদি তো যাক্-না চুকে, সব হারাব হাসিমুখে—
আমি এই চলেছি মরণসুধা নিতে পরান পূরে।
ওগো, আপন যারা কাছে টানে এ রস তারা কেই বা জানে—
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে ডাক দিয়েছে দূরে।
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা পড়ুক ভেঙে-চুরে॥

৯৮

যখন দেখা দাও নি, রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি!
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি!
তখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
এখন আমার সকল কান্না রাধার রূপে উঠল হাসি॥

৯৯

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্তে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।

বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে, সবার কানে বাজবে না সে—
দেখ্ লো চেয়ে যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল ॥

১০০

মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে—
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।
যায় যে জনা সেই শুধু যায়, ফুল ফোটা তো ফুরোয় না হায়—
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলই ঝরে পড়ে বেলাশেষে ॥
যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান—
এখন আমার দূরে যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দান।
পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে—
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে ॥

১০১

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী—
কূলে ভিড়বে না রে ॥
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে—
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে ॥

১০২

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে হৃদয়মাঝে, হৃদয়মাঝে।
নাচে রে নাচে চরণ নাচে প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।
প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে— তারায় তারায় কাঁপন লাগে।
মরমে মরমে বেদনা ফুটে— বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে ॥

১০৩

আমার মনের বাঁধন ঘুচে যাবে যদি ও ভাই রে,
থাক্ বাইরে বাঁধন তবে নিরবধি।
যদি সাগর যাবার হুকুম থাকে
থাক্ তটের বাঁধন বাঁকে বাঁকে,
তবে বাঁধে বাঁধে গান গাবে নদী ভাই রে॥

১০৪

এতদিন পরে মোরে
আপন হাতে বেঁধে দিলে মুক্তিডোরে।
সাবধানীদের পিছে পিছে
দিন কেটেছে কেবল মিছে,
ওদের বাঁধা পথের বাঁধন হতে টেনে নিলে আপন ক'রে॥

১০৫

নূতন পথের পথিক হয়ে আসে, পুরাতন সাথি,
মিলন-উষায় ঘোমটা খসায় চিরবিরহের রাতি।
যারে বারে বারে হারিয়ে ফেলে
আজ প্রাতে তার দেখা পেলে
নূতন করে পায়ের তলে দেব হৃদয় পাতি॥

১০৬

কাজ ভোলাবার কে গো তোরা!
রঙিন সাজে কে যে পাঠায়
কোন্ সে ভুবন-মনো-চোরা!
কঠিন পাথর সারে সারে
দেয় পাহারা গুহার দ্বারে,
হাসির ধারায় ডুবিয়ে তারে
ঝরাও রসের সুধা-ঝোরা!

স্বপন-তরীর তোরা নেয়ে
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
পাগ্‌লা পরান চলে গেয়ে।
কোন্‌ উদাসীর উপবনে
বাজল বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে,
ভুলিয়ে দিল ঈশান কোণে
ঝঞ্ঝা ঘনায় ঘনঘোরা।

১০৭

শেষ ফলনের ফসল এবার
কেটে লও, বাঁধো আঁটি।
বাকি যা নয় গো নেবার
মাটিতে হোক তা মাটি॥

১০৮

বাঁধন কেন ভূষণ-বেশে
তোরে ভোলায়, হায় অভাগী।
মরণ কেন মোহন হেসে
তোরে দোলায়, হায় অভাগী॥

১০৯

দয়া করো, দয়া করো প্রভু, ফিরে ফিরে
শত শত অপরাধে অপরাধিনীরে॥
অন্তরে রয়েছ জাগি, তোমার প্রসাদ-লাগি
দুর্বল পরান বাধা ঘটায় বাহিরে॥
শঙ্কা আসে, লজ্জা আসে, মরি অবসাদে।
দৈন্যরাশি ফেলে গ্রাসি, ঘেরে পরমাদে।
ক্লান্ত দেহে তন্দ্রা লাগে, ধুলায় শয়ন মাগে—
অপথে জাগিয়া উঠি ভাসি আঁখিনীরে॥

১১০

জয় জয় জয় হে জয় জ্যোতির্ময়—
মোহকলুষঘন কর' ক্ষয়, কর' ক্ষয় ॥
অগ্নিপরশ তব কর' কর' দান,
কর' নির্মল মম তনুমন প্রাণ—
বন্ধনশৃঙ্খল নাহি সয়, নাহি সয় ॥
গূঢ় বিঘ্ন যত কর' উৎপাটিত।
অমৃতদ্বার তব কর' উদ্‌ঘাটিত।
যাচি যাত্রিদল, হে কর্ণধার,
সুপ্তিসাগর কর' কর' পার—
স্বপ্নের সঞ্চয় হোক লয়, হোক লয় ॥

১১১

বাজো রে বাঁশরি, বাজো।
সুন্দরী, চন্দনমাল্যে মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজো ॥
বুঝি মধুফাল্গুনমাসে চঞ্চল পান্থ সে আসে—
মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক অঙ্গনে ফোটে নি কি আজও ॥
রক্তিম অংশুক মাথে, কিংশুককঙ্কণ হাতে,
মঞ্জীরঝঙ্কৃত পায়ে সৌরভমন্থর বায়ে
বন্দনসঙ্গীতগুঞ্জনমুখরিত নন্দনকুঞ্জে বিরাজো ॥

১১২

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে ॥
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা, কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর— চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে ॥
সখীরে সাজাব সখার প্রেমে অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে।
সাজাব সকরুণ বিরহবেদনায়, সাজাব অক্ষয় মিলনসাধনায়—
মধুর লজ্জা রচিব সজ্জা যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে ॥

১১৩

নমো নমো শচীচিতরঞ্জন, সন্তাপভঞ্জন-
নবজলধরকান্তি, ঘননীল-অঞ্জন— নমো হে, নমো নমো ॥
নন্দনবীথির ছায়ে তব পদপাতে নব পারিজাতে
উড়ে পরিমল মধুরাতে— নমো হে, নমো নমো ।
তোমার কটাক্ষের ছন্দে মেনকার মঞ্জীরবন্ধে
জেগে ওঠে গুঞ্জন মধুকরগঞ্জন— নমো হে, নমো নমো ॥

১১৪

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বালো সন্ধ্যাদীপখানি ।
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল লজ্জিত বাসরশয্যাতে অর্ধরাতে।
উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা তুমি অকুণ্ঠিতা ॥
সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারি ভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গ-সম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে উদ্দাম গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি চলো আকুল-অঞ্চলা বিদ্যুতচঞ্চলা ॥

১১৫

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস—
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ ॥
এ সংসারের নিত্য খেলায় প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়
বাটে ঘাটে হাজার লোকের হাস্য-পরিহাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ ॥

আমের বনে দোলা লাগে, মুকুল পড়ে ঝ'রে—
চিরকালের চেনা গন্ধ হাওয়ায় ওঠে ভ'রে।
মঞ্জরিত শাখায় শাখায়, মউমাছিদের পাখায় পাখায়,
ক্ষণে ক্ষণে বসন্তদিন ফেলেছে নিশ্বাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ॥

১১৬

বলেছিল 'ধরা দেব না', শুনেছিল সেই বড়াই।
বীরপুরুষের সয় নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই।
তার পরে শেষে কী যে হল কার,
কোন্ দশা হল জয়পতাকার।—
কেউ বলে জিৎ, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই॥

১১৭

গুরুপদে মন করো অর্পণ, ঢালো ধন তাঁর ঝুলিতে।
লঘু হবে ভার, রবে নাকো আর ভবের দোলায় দুলিতে।
হিসাবের খাতা নাড়ো ব'সে ব'সে, মহাজনে নেয় সুদ ক'ষে ক'ষে—
খাঁটি যেই জন সেই মহাজনে কেন থাক হায় ভুলিতে।
দিন চলে যায় ট্যাঁকে টাকা হায় কেবলই খুলিতে তুলিতে॥

১১৮

শোন্ রে শোন্ অবোধ মন,—
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তিমুক্তা কর্ অন্বেষণ,
ওরে ও ভোলা মন॥

১১৯

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস!
ক্রীড়াসরসীনীরে রাজহংস॥

তাম্রকূটঘনধূম্রবিলাসী! তন্দ্রাতীরনিবাসী!
সব-অবকাশ-ধ্বংস! যমরাজেরই অংশ॥

১২০

তোলন-নামন পিছন-সামন।
বাঁয়ে ডাইনে চাই নে, চাই নে।
বোসন-ওঠন ছড়ান-গুটন।
উল্টো-পাল্টা ঘূর্ণি চালটা— বাস্! বাস্! বাস্!

১২১

আমরা চিত্র অতি বিচিত্র,
অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র।
আমাদের যুদ্ধ নহে কেহ ক্রুদ্ধ।
ওই দেখো গোলাম অতিশয় মোলাম।
নাহি কোনো অস্ত্র খাকি-রাঙা বস্ত্র।
নাহি লোভ, নাহি ক্ষোভ।
নাহি লাফ, নাহি ঝাঁপ।
যথারীতি জানি, সেই মতো মানি।
কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র।
কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা॥

১২২

চিঁড়েতন হর্তন ইস্কাবন
অতি সনাতন ছন্দে কর্‌তেছে নর্তন।
কেউ বা উঠে কেউ পড়ে,
কেউ বা একটু নাহি নড়ে,
কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে করে কালকর্তন॥

নাহি কহে কথা কিছু—
একটু না হাসে, সামনে যে আসে
চলে তারি পিছু পিছু।
বাঁধা তার পুরাতন চালটা,
নাই কোনো উল্টা-পাল্টা— নাই পরিবর্তন॥

১২৩

চলো নিয়ম-মতে।
দূরে তাকিয়ো নাকো, ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো!
চলো সমান পথে।
'হেরো অরণ্য ওই, হোথা শৃঙ্খলা কই—
পাগল ঝর্নাগুলো দক্ষিণপর্বতে।'
ও দিক চেয়ো না, চেয়ো না— যেয়ো না, যেয়ো না।
চলো সমান পথে॥

১২৪

হা-আ-আ-আই।
নাই কাজ নাই।
দিন যায়, দিন যায়।
আয় আয়, আয় আয়।
হাতে কাজ নাই॥

১২৫

হাঁচ্ছোঃ!— ভয় কী দেখাচ্ছ।
ধরি টিপে টুঁটি, মুখে মারি মুঠি—
বলো দেখি কী আরাম পাচ্ছ।
হাঁচ্ছো। হাঁচ্ছো॥

১২৬

ইচ্ছে!— ইচ্ছে!
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে॥
সেই তো আঘাত করছে তালায়, সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়-
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে॥

১২৭

আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল ঘরভোলা সব যত—
বকুলবনের গন্ধে আকুল মউমাছিদের মতো॥
সূর্য ওঠার আগে মন আমাদের জাগে—
বাতাস থেকে ভোর-বেলাকার সুর ধরি সব কত॥
কে দেয় রে হাতছানি
নীল পাহাড়ের মেঘে মেঘে, আভাস বুঝি জানি।
পথ যে চলে বেঁকে বেঁকে অলখ-পানে ডেকে ডেকে
ধরা যারে যায় না তারি ব্যাকুল খোঁজেই রত॥

১২৮

বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে,
নীল আকাশে পাড়ি দেব খ্যাপা হাওয়ার স্রোতে॥
আমের মুকুল ফুটে ফুটে যখন পড়ে ঝ'রে ঝ'রে
মাটির আঁচল ভ'রে ভ'রে—
ঝরাই আমার মনের কথা ভরা ফাগুন-চোতে॥
কোথা তুই প্রাণের দোসর বেড়াস ঘুরি ঘুরি—
বনবীথির আলোছায়ায় করিস লুকোচুরি।
আমার একলা বাঁশি পাগলামি তার পাঠায় দিগন্তরে
তোমার গানের তরে—
কবে বসন্তেরে জাগিয়ে দেব আমাতে আর তোতে॥

১২৯

শুনি ওই রুনুঝুনু পায়ে পায়ে নূপুরধ্বনি
চকিত পথে বনে বনে॥
নির্ঝর ঝরো ঝরো ঝরিছে দূরে,
জলতলে বাজে শিলা ঠুনু-ঠুনু ঠুনু-ঠুনু॥
ঝিল্লিঝঙ্কৃত বেণুবনছায়া পল্লবমর্মরে কাঁপে,
পাপিয়া ডাকে, পুলকিত শিরীষশাখে
দোল দিয়ে যায় দক্ষিণবায় পুন পুন॥

১৩০

এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে ফুলের ডালা।
ভরা হল— কে নিবি কে নিবি গো, গাঁথিবি বরণমালা।
চম্পা চামেলি সেঁউতি বেলি
দেখে যা সাজি আজি রেখেছি মেলি—
নবমালতীগন্ধ-ঢালা॥
বনের মাধুরী হরণ করো তরুণ আপন দেহে।
নববধূ, মিলনশুভলগন-রাত্রে লও গো বাসরগেহে—
উপবনের সৌরভভাষা,
রসতৃষিত মধুপের আশা।
রাত্রিজাগর রজনীগন্ধা—
করবী রূপসীর অলকানন্দা—
গোলাপে গোলাপে মিলিয়া মিলিয়া রচিবে মিলনের পালা॥

১৩১

সুরের জালে কে জড়ালে আমার মন,
আমি ছাড়াতে পারি নে সে বন্ধন॥
আমায় অজানা গহনে টানিয়া নিয়ে যে যায়,
বরন-বরন স্বপনছায়ায় করিল মগন॥

জানি না কোথায় চরণ ফেলি, মরীচিকায় নয়ন মেলি—
কী ভুলে ভুলালো দূরের বাঁশি! মন উদাসী
আপনারে হারালো, ধ্বনিতে আবৃত চেতন॥

১৩২

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে!
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপ-কথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ-কথার—
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা মনে মনে॥
সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি মেঘে মেঘে আকাশ-কুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
আমি যাই ভেসে দূর দিশে—
পরীর দেশে বন্ধ দুয়ার দিই হানা মনে মনে॥

জাতীয় সংগীত

১

ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যত দিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি   তত দিন তুই কাঁদ্ রে।
এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ   প্রাচীন হিন্দুর কীর্তি-ইতিহাস
যত দিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে   অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে
তত দিন তুই কাঁদ্ রে॥

যে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া   সে দিন তো আর আসিবে না।
যে রবি পশ্চিমে পড়েছে ঢলিয়া   সে আর পুরবে উঠিবে না।
এমনি সকল নীচ হীনপ্রাণ   জনমেছে তোর কলঙ্কী সন্তান
একটি বিন্দু অশ্রুও কেহ   তোমার তরে দেয় না ঢালি।
যে দিন   তোমার তরে শোণিত ঢালিত   সে দিন যখন গিয়াছে চলি
তখন, ভারত, কাঁদ্ রে॥

তবে কেন বিধি এত অলঙ্কারে   রেখেছ সাজায়ে ভারতকায়।
ভারতের বনে পাখি গায় গান,   স্বর্ণমেঘ-মাখা ভারতবিমান—
হেথাকার লতা ফুলে ফুলে ভরা,   স্বর্ণশস্যময়ী হেথাকার ধরা—
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায়।
কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি   রোগশুষ্কমুখে হাসিরাশি ভরি
রূপের গরব করিস হায়।
যে দিন গিয়াছে সে তো ফিরিবে না,
তবে, রে ভারত, কাঁদ্ রে॥

ভারত, তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া   শরমে মলিন মুখ লুকাইয়া
আমরা যে কবি বিজনে কাঁদিব,   বিজনে বিষাদে বীণা ঝঙ্কারিব,
তাতেও যখন স্বাধীনতা নাই
তখন, ভারত, কাঁদ্ রে॥

২

অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী, গা লো সেই-সব পুরানো গান-
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে ভরিয়া দে-না লো আঁধার প্রাণ ॥
হা রে হতবিধি, মনে পড়ে তোর সেই একদিন ছিল
আমি আর্যলক্ষ্মী এই হিমালয়ে এই বিনোদিনী বীণা করে লয়ে
যে গান গেয়েছি সে গান শুনিয়া জগত চমকি উঠিয়াছিল ॥
আমি অর্জুনেরে— আমি যুধিষ্ঠিরে করিয়াছি স্তনদান।
এই কোলে বসি বাল্মীকি করেছে পুণ্য রামায়ণ গান।
আজ অভাগিনী— আজ অনাথিনী
ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকায়ে লুকায়ে নীরবে নীরবে কাঁদি,
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া একটি সন্তান উঠে রে জাগিয়া!
কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি ॥
হায় রে বিধাতা, জানে না তাহারা সে দিন গিয়াছে চলি
যে দিন মুছিতে বিন্দু-অশ্রুধার কত-না করিত সন্তান আমার—
কত-না শোণিত দিত রে ঢালি ॥

৩

শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেবদেব, প্রভু, দয়াময়—
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয় ॥
চিরদিন আঁধার না রয়— রবি উঠে, নিশি দূর হয়—
এ দেশের মাথার উপরে এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন? চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?।
মরমে লুকানো কত দুখ, ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ—
কাঁদিবার নাই অবসর— কথা নাই, শুধু ফাটে বুক।
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ, দশ দিশি বিভীষিকাময়—
হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ॥

কোনো কালে তুলিব কি মাথা। জাগিবে কি অচেতন প্রাণ।
ভারতের প্রভাতগগনে উঠিবে কি তব জয়গান।
আশ্বাসবচন কোনো ঠাঁই কোনোদিন শুনিতে না পাই—
শুনিতে তোমার বাণী তাই মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া।
বলো, প্রভু, মুছিবে এ আঁখি, চিরদিন ফাটিবে না হিয়া॥

৪

একি অন্ধকার এ ভারতভূমি!
বুঝি, পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি।
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে— কে তারে উদ্ধার করিবে॥
চারি দিকে চাই, নাহি হেরি গতি। নাহি যে আশ্রয়, অসহায় অতি।
আজি এ আঁধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে।
তুমি চাও পিতা, ঘুচাও এ দুখ। অভাগা দেশেরে হোয়ো না বিমুখ—
নহিলে আঁধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে।

দেখো চেয়ে তব সহস্র সন্তান লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান— লাজ মান আর থাকে না।
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া, তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া,
দয়াময় ব'লে আকুলহৃদয়ে তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা, তুমি চাও চাও। এ হীনতা-পাপ এ দুখ ঘুচাও।
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও— নহিলে এ দেশ থাকে না।

তুমি যবে ছিলে এ পুণ্যভবনে কী সৌরভসুধা বহিত পবনে,
কী আনন্দগান উঠিত গগনে, কী প্রতিভাজ্যোতি জ্বলিত।
ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান অনন্তসদনে করিত প্রয়াণ—
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া সকলে মিলিয়া চলিত।
আজ কী হয়েছে! চাও পিতা, চাও। এ তাপ এ পাপ এ দুখ ঘুচাও।
মোরা তো রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত॥

৫

ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে।

বিহগেরা থামো থামো। আঁধারে কাঁদো গো তুমি ধরা॥

গাবে যদি গাও রে সবে গাও রে শত অশনি-মহানিনাদে—

ভীষণ প্রলয়সঙ্গীতে জাগাও জাগাও, জাগাও রে এ ভারতে।

বনবিহঙ্গ, তুমি ও সুখগীতি গেয়ো না। প্রমোদমদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে

আনন্দরাগিণী আজি কেন বাজিছে এত হরষে—

ছিঁড়ে ফেল্ বীণা আজি বিষাদের দিনে॥

৬

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে

নগরে প্রান্তরে বনে বনে। অশ্রু ঝরে দু নয়নে,

পাষাণ হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।

জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক গান গায়—

নয়নে অনল ভায়— শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্রনির্ঘোষে!

ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে॥

ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই।

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলই।

তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুঃখে কাঁদাব।

তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব।

সকল দুঃখ সহিব সুখে

তোমারি মুখ চাহিয়ে॥

৭

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,

এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—

বন্দে মাতরম্॥

আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—
বন্দে মাতরম্ ॥
আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব-হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন—
বন্দে মাতরম্ ॥

৮

তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ। তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ ॥
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাহিবে গান ॥
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল তোমারি কার্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে ॥
যদিও, হে দেবী, শোণিতে আমার কিছুই তোমার হবে না
তবু, ওগো মাতা পারি তা ঢালিতে একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে—
নিভাতে তোমার যাতনা।
যদিও, জননী, যদিও আমার এ বীণায় কিছু নাহিক বল
কী জানি যদি, মা, একটি সন্তান জাগি উঠে শুনি এ বীণাতান ॥

৯

তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভালো, সহি পদে পদে অপমান ॥
কথার বাঁধুনি, কাঁদুনির পালা— চোখে নাহি কারো নীর।
আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ, ছি ছি একি লাজ! জগতের মাঝে ভিখারির সাজ—
আপনি করি নে আপনার কাজ, পরের 'পরে অভিমান ॥
আপনি নামাও কলঙ্কপশরা, যেয়ো না পরের দ্বার—
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার।

'দাও দাও' ব'লে পরের পিছু পিছু কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু—
মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে করো দান ॥

১০

কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে, আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না— মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভাণে ॥
তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমারি— স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।
এরা কী দেবে তোরে! কিছু না, কিছু না। মিথ্যা কবে শুধু হীনপরানে॥
মনের বেদনা রাখো, মা, মনে। নয়নবারি নিবারো নয়নে ॥
মুখ লুকাও, মা, ধূলিশয়নে— ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।
শূন্য-পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি দেখো কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী।
দুঃখ জানায়ে কী হবে, জননী, নির্মম চেতনাহীন পাষাণে ॥

১১

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক— মুখ তুলে আজি চাহো রে ॥
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি, হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি—
প্রভাতগগনে কোটি শির তুলি নির্ভয়ে আজি গাহো রে ॥
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে দশ দিক সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন— আসিবে সে দিন আসিবে ॥
আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে, আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ— না থাকে কলহ, না থাকে বিষাদ—
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ— বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥

১২

কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে।
কে বৃথা আশাভরে চাহিছে মুখ'পরে।
সে যে আমার জননী রে॥

কাহার সুধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি।
কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায়।
সে যে আমার জননী রে॥

ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে॥

পুণ্য কুটিরে বিষণ্ণ কে বসি সাজাইয়া অন্ন।
সে স্নেহ-উপহার রুচে না মুখে আর।
সে যে আমার জননী রে॥

১৩

হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ—
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান॥

কাঞ্চনথালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিকো জুটে।
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন— দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন—
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন চরণের ধুলা লুটে।
সুরদুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে॥

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন, মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন— তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র, অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র, দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে, যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব॥

১৪

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা—
তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ, পরের বসন, তেয়াগিব আজ পরের অশন—
যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা॥

না থাকে প্রাসাদ আছে তো কুটির কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন ফলে ফুলে সুবিচিত্র।
তোমা হতে যত দূরে গেছি স'রে তোমারে দেখেছি তত ছোটো ক'রে।
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়রাজ, তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস, তব পর্ণকুটির কল্যাণে সুপবিত্র।

পরের বাক্যে তব পর হয়ে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ, পরেছি পরের সজ্জা।
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি' জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি—
তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থিমজ্জা।
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা॥

সে-সকল লাজ তেয়াগিব আজ, লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম, তব মন্ত্রের গভীর মর্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব, লইব তোমার দীক্ষা॥

১৫

ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না।
হবার নয় যা কোনোমতেই হবেই না সে, হতে দেব না॥
পড়ব না রে ধুলায় লুটে, যাবে না রে বাঁধন টুটে— যেতে দেব না।
মাথা যাতে নত হবে এমন বোঝা মাথায় নেব না॥
দুঃখ আছে, দুঃখ পেতেই হবে—
যত দূরে যাবার আছে সে তো যেতেই হবে।
উপর-পানে চেয়ে ওরে ব্যথা নে রে বক্ষে ধ'রে— নে রে সকলে।
নিঃসহায়ের সহায় যিনি বাজবে তাঁরে তোদের বেদনা॥

১৬

আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে থাকে—
এবার যার খুশি সে বাঁধন কাটুক, আমরা বাঁধব মাকে।
আমরা পরান দিয়ে আপন করে বাঁধব তাঁরে সত্যডোরে,
সন্তানেরই বাহুপাশে বাঁধব লক্ষ পাকে।
আজ ধনী গরিব সবাই সমান। আয় রে হিন্দু, আয় মুসলমান—
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক্, আয় রে লাখে লাখে।
আজ দাও গো সবার দুয়ার খুলে, যাও গো সকল ভাবনা ভুলে—
সকল ডাকের উপরে আজ মা আমাদের ডাকে॥

পূজা ও প্রার্থনা

১

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে ॥
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে ॥
কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥

২

এ হরিসুন্দর, এ হরিসুন্দর, মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ॥
সেবকজনের সেবায় সেবায়, প্রেমিকজনের প্রেমমহিমায়,
দুঃখীজনের বেদনে বেদনে, সুখীর আনন্দে সুন্দর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ॥

কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল, সাগরে সাগরে গম্ভীর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।

চন্দ্র সূর্য জ্বালে নির্মল দীপ— তব জগমন্দির উজল করে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ॥

৩

আমরা যে শিশু অতি, অতিক্ষুদ্র মন—
পদে পদে হয়, পিতা, চরণস্খলন ॥
রুদ্রমুখ কেন তবে দেখাও মোদের সবে।
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ ॥

ক্ষুদ্র আমাদের 'পরে করিয়ো না রোষ—
স্নেহবাক্যে বলো, পিতা, কী করেছি দোষ!

শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে—
কী আর করিতে পারে দুর্বল যে জন ॥

পৃথ্বীর ধূলিতে, দেব, মোদের ভবন—
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন।
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে, খেলা করি ধূলি লয়ে—
মোদের অভয় দাও দুর্বলশরণ ॥

একবার ভ্রম হলে আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন।
তা হলে যে আর কভু উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন ॥

৪

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ, হে বিশ্বপিত,
তোমারি রচিত ছন্দে মহান্ বিশ্বের গীত ॥
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত ॥
কিছু নাহি চাহি, দেব, কেবল দর্শন মাগি।
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যেথা রবি শশী সেই সভামাঝে বসি
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত ॥

৫

দিবানিশি করিয়া যতন
হৃদয়েতে রচেছি আসন—
জগতপতি হে, কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমন ॥
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই—
হৃদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রক্ষালন।

বাহিরের দীপ রবি তারা ঢালে না সেথায় করধারা—
তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিরণবরিষন।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ-কোলাহল—
বিষয়ের মান-অভিমান করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা—
তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন—
নীরবে বসিয়া অবিরল চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা মুদিয়া সজল দু'নয়ন॥

৬

কোথা আছ, প্রভু, এসেছি দীনহীন,
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে!
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে 'প্রভু প্রভু' ব'লে ডাকি কাতরে॥
সাড়া কি দিবে না। দীনে কি চাবে না। রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানি নে, রজনী আসিছে, একেলা আমি যে এ বনমাঝারে॥
জগতজননী, লহো লহো কোলে, বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ।
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি— জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে॥
ত্যজি সে তোমারে গেছিল চলিয়ে, কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে—
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ-সাথ ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে॥
এসো তবে, প্রভু, স্নেহনয়নে এ-মুখ-পানে চাও— ঘুচিবে যাতনা,
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল, চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা॥

৭

কী করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি, পথ হারাইলি গহনে॥
ওই সময় চলে গেল, আঁধার হয়ে এল, মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না, বিঁধিছে কণ্টক চরণে॥
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে, এখন ফিরিব কেমনে।

'পথ বলে দাও' 'পথ বলে দাও' কে জানে কারে ডাকি সঘনে॥
বন্ধু যাহারা ছিল সকলে চলে গেল, কে আর রহিল এ বনে।
ওরে, জগতসখা আছে, যা রে তাঁর কাছে, বেলা যে যায় মিছে রোদনে॥
দাঁড়ায়ে গৃহদ্বারে জননী ডাকিছে, আয় রে ধরি তাঁর চরণে।
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর, মায়েরে দেখেও দেখিলি নে।
কোথা গো কোথা তুমি জননী, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হতে এ জনে।
হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চলো তোমার অমৃতভবনে॥

৮

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব।
শোন্ রে অনন্তকাল উঠে জয়-জয় রব॥
জগতের যত কবি গ্রহ তারা শশী রবি
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কী সৌন্দর্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান কী মহা অমৃতধারা।
না জানি কাহার কাছে ছুটে তারা চলিয়াছে—
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখ্ রে আকাশে চেয়ে, কিরণে কিরণময়।
দেখ্ রে জগতে চেয়ে, সৌন্দর্যপ্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে—
কী কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব॥

৯

আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃতসদনে চলো যাই,
চলো চলো, চলো ভাই॥
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে আনন্দের নিকেতনে—
চলো চলো, চলো যাই॥

মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কী আনন্দ উথলিল—
চলো চলো, চলো ভাই ॥
দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান গাহো সবে একতান—
বলো সবে জয়-জয় ॥

১০

বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী ॥
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো।
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, চরণতলে বসে থাকিব।
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা, কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব—
ওই-যে হেরি তমসঘনঘোরা গহন রজনী ॥

১১

বর্ষ ওই গেল চলে।
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা করো— লহো কোলে ॥
শুধু আপনারে লয়ে সময় গিয়েছে বয়ে—
চাহি নি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা ব'লে ॥
অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে—
অনিমেষ আঁখি তব মুখপানে চেয়ে আছে।
স্মরিয়ে তোমার স্নেহ পুলকে পূরিছে দেহ—
প্রভু গো, তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে ॥

১২

তুমি কি গো পিতা আমাদের!
ওই-যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের ॥
ওই-যে নয়নে তব অরুণকিরণ নব,
বিমল চরণতলে ফুল ফুটে প্রভাতের ॥

ওই কি স্নেহের রবে ডাকিছ মোদের সবে।
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া!
হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি
দিবে কি বিমল করি প্রসাদসলিল দিয়া॥

১৩

প্রভু, এলেম কোথায়।
কখন বয়ষ গেল, জীবন বহে গেল—
কখন কী-যে হল জানি নে হায়।
আসিলাম কোথা হতে, যেতেছি কোন্ পথে
ভাসিয়ে কালস্রোতে তৃণের প্রায়।
মরণসাগর-পানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন।
এ জীবন অবহেলে আঁধারে দিনু ফেলে—
কত-কী গেল চলে, কত-কী যায়।
শোকে তাপে জরজর অসহ যাতনায়
শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরুপ্রায়।
কাঁদিয়ে হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা—
কোথা গো ধ্রুবতারা কোথা গো হায়॥

১৪

সংসারেতে চারি ধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই॥
চৌদিকে বিষাদঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,
তোমার আনন্দমুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই॥
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃতমুরতি রাজে,
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখপানে চাই॥

তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু,
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব—
তোমার অভয়-কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই॥

১৫

কী দিব তোমায়। নয়নেতে অশ্রুধার,
শোকে হিয়া জরজর হে॥
দিয়ে যাব হে, তোমারি পদতলে
আকুল এ হৃদয়ের ভার॥

১৬

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব!
সুখে-দুখে-শোকে আঁধারে-আলোকে চরণে চাহিয়া রহিব॥
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমিই জান তা প্রভু গো।
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে, সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব॥
যদি বনে কভু পথ হারাই, প্রভু, তোমারি নাম লয়ে ডাকিব।
বড়োই প্রাণ যবে আকুল হইবে চরণ হৃদয়ে লইব॥
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য যা সাধিব—
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে। বিরাম আর কোথা পাইব॥

১৭

হাতে লয়ে দীপ অগণন চরাচর কার সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ॥
চারি দিকে কোটি কোটি লোক লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক
চরণে চাহিয়া চিরদিন॥
সূর্য তাঁরে কহে অনিবার, 'মুখপানে চাহো একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি।'

চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে, 'হাসো প্রভু, মোর পানে চেয়ে,
জ্যোৎস্নাসুধা বিতরিব স্বামী।'
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার 'দেহো, প্রভু, করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টিজল।'
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ, 'কহো তুমি আশ্বাসবচন,
শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল।'
করজোড়ে কহে নরনারী, 'হৃদয়ে দেহো গো প্রেমবারি,
জগতে বিলাব ভালোবাসা।'
'পূরাও পূরাও মনস্কাম' কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা॥

১৮

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা।
কহো কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গলবারতা॥
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে, সদাই ভাবনা।
যা-কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা॥
সুখ-আশে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায় এ মরুপ্রান্তরে॥
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে—
কাঁদে তখন আকুল-মন, কাঁপে তরাসে॥
কী হবে গতি, বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে—
তোমারে দাও, আশা পূরাও, তুমি এসো কাছে॥

১৯

রজনী পোহাইল— চলেছে যাত্রীদল,
আকাশ পূরিল কলরবে।
সবাই যেতেছে মহোৎসবে॥
কুসুম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাখিগণে—
এমন প্রভাত কি আর হবে।

নিদ্রা আর নাই চোখে বিমল অরুণালোকে
জাগিয়া উঠেছে আজি সবে ॥
চলো গো পিতার ঘরে, সারা বৎসরের তরে
প্রসাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে ॥
ওই হেরো তাঁর দ্বার জগতের পরিবার
হোথায় মিলেছে আজি সবে—
ভাই বন্ধু সবে মিলি করিতেছে কোলাকুলি,
মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে ॥
যত চায় তত পায়— হৃদয় পূরিয়া যায়,
গৃহে ফিরে জয়-জয়-রবে।
সবার মিটেছে সাধ— লভিয়াছে আশীর্বাদ,
সম্বৎসর আনন্দে কাটিবে ॥

২০

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ প্রভাতকিরণে।
পবিত্র করপরশ পেয়ে ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে ॥
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা, কুসুম ফুটাইছে শত বরনে ॥
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে—
কী ভয়, কী ভয় দুঃখ-তাপ-মরণে ॥

২১

চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধুলা অবসান।
ডেকে লও, ডেকে লও, বড়ো শ্রান্ত মন প্রাণ ॥
ধুলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস—
মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছি পান ॥
খেলিতে সংসারের খেলা কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যায়।
ধুলাঘর গড়ি যত ভেঙে ভেঙে পড়ে তত—
চলেছি নিরাশ-মনে, সান্ত্বনা করো গো দান ॥

২২

দিন তো চলি গেল, প্রভু, বৃথা— কাতরে কাঁদে হিয়া।
জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ— কী হল এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ, কাছে যাব কী লইয়া
প্রভু হে, যাইবে ভয়, পাব ভরসা
তুমি যদি ডাকো এ অধমে ॥

২৩

ভবকোলাহল ছাড়িয়ে
বিরলে এসেছি হে ॥
জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি,
সুধারসে মগন হব হে ॥

২৪

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে।
চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান—
বিরহ নাহি তার, নাহি রে দুখতাপ,
সে প্রেমের নাহি অবসান ॥

২৫

তবে কি ফিরিব ম্লানমুখে সখা,
জরজর প্রাণ কি জুড়াবে না ॥
আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব ?
হৃদয়ের আশা পুরাবে না ?।

২৬

দেখা যদি দিলে ছেড়ো না আর, আমি অতি দীনহীন ॥
নাহি কি হেথা পাপ মোহ বিপদরাশি।
তোমা বিনা একেলা নাহি ভরসা ॥

২৭

দুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ ॥
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে চাহিয়ে—
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন ॥

২৮

দাও হে হৃদয় ভরে দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে,
সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও ॥
যেই সুধারসপানে ত্রিভুবন মাতে তাহা মোরে দাও ॥

২৯

দুয়ারে বসে আছি, প্রভু, সারা বেলা— নয়নে বহে অশ্রুবারি।
সংসারে কী আছে হে, হৃদয় না পূরে—
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে, বিমুখ হোয়ো না দীনহীনে—
যা করো হে রব প'ড়ে ॥

৩০

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে।
ডাকিতে এসেছি তাই, চলো ত্বরা ক'রে ॥
তাপিতহৃদয় যারা মুছিবি নয়নধারা,
ঘুচিবে বিরহতাপ কত দিন পরে ॥
আজি এ আকাশমাঝে কী অমৃতবীণা বাজে,
পুলকে জগত আজি কী মধু শোভায় সাজে!
আজি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে—
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে ॥

৩১

চলেছে তরণী প্রসাদপবনে, কে যাবে এসো হে শান্তিভবনে।
এ ভবসংসারে ঘিরেছে আঁধারে, কেন রে ব'সে হেথা ম্লানমুখ।
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না, হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ।
এ ভবকোলাহল, এ পাপহলাহল, এ দুখশোকানল দূরে যাক।
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে চলো রে শুনে চলি তাঁর ডাক।
বিষয়ভাবনা লইয়া যাব না, তুচ্ছ সুখদুখ প'ড়ে থাক্‌।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে, তখন কার মুখ চাহিবে।
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জন কিসের আশে প্রাণ রাখিবে॥

৩২

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান।
এসো, ভাই, এসো প্রাণে প্রাণে আজি রেখো না রে ব্যবধান॥
সংসারের ধুলা ধুয়ে ফেলে এসো, মুখে লয়ে এসো হাসি।
হৃদয়ের থালে লয়ে এসো, ভাই, প্রেমফুল রাশি রাশি॥
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে—
অনাথ জনের মুখপানে, আহা, চাহিলে না মুখ তুলে!
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ—
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান॥
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না।
হৃদয়মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না।
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি—
পিতার অসীম ধনরতনের সকলেই অধিকারী॥

৩৩

তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে—
প্রেমকুসুমের মধুসৌরভে, নাথ, তোমারে ভুলাব হে।

তোমার প্রেমে, সখা, সাজিব সুন্দর—
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে ॥
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর—
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে ॥

৩৪

আইল আজি প্রাণসখা, দেখো রে নিখিলজন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগনতলে,
গ্রহ তারা সভা ঘেরিয়ে দাঁড়াইল।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবসকোলাহল ॥

৩৫

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ ভুলেছি ও করপরশে।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে, নাথ, সুখে আছি, আছি হরষে ॥
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব, হেথা আমি আছি এ কী স্নেহ তব—
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন মধুর কিরণ বরষে ॥
কত নব হাসি ফুটে ফুলবনে প্রতিদিন নবপ্রভাতে।
প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তারা তোমার নীরব সভাতে।
জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি শত ধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেমমধুরমাধুরী ডুবায় অমৃতসরসে ॥
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ, দিয়েছ তোমার অভয় শরণ—
শোক তাপ সব হয় হে হরণ তোমার চরণদরশে।
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালোবাসা, প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা—
পাই নব প্রাণ— জাগে নব আশা নব নব নব-বরষে ॥

৩৬

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এসো সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে ॥

সে আনন্দে উপবন বিকশিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দবারতা ক'য়ে ॥
সে পুণ্যনির্ঝরস্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখো সে অমৃতধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে— শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ননীরে ডুবিবে তৃষিত হয়ে ॥
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দরসপানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহে না সংসারতাপ সংসার-মাঝারে র'য়ে ॥

৩৭

হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাই হে ॥
সদা মনে হয় 'কী করি' 'কী করি',
কখন আসিবে কালবিভাবরী—
তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি! হরি!
হরি বিনে কেহ নাই হে ॥
নয়নের জল হবে না বিফল,
তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল—
সেই আশা মনে করেছি সম্বল,
বেঁচে আছি শুধু তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তব আঁখিতারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা—
প্রাণ তোমায় চাহে, তুমি ধ্রুবতারা—
আর কার পানে চাই হে ॥

৩৮

আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি হে॥
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ—
শত লোকের শত বুলি হে॥
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি—
পাই নে চরণধুলি হে॥
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়—
কারে সামালিব, একি হল দায়—
একা যে অনেকগুলি হে।
আমায় এক করো তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে—
ধাঁদার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে—
চরণেতে লহো তুলি হে॥

৩৯

ঘোরা রজনী, এ মোহঘনঘটা—
কোথা গৃহ হায়। পথে ব'সে।
সারাদিন করি' খেলা, খেলা যে ফুরাইল— গৃহ চাহিয়া প্রাণ কাঁদে॥

৪০

সুমধুর শুনি আজি, প্রভু, তোমার নাম।
প্রেমসুধাপানে প্রাণ বিহ্বলপ্রায়,
রসনা অলস অবশ অনুরাগে॥

৪১

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেমসুধা, চলো রে ঘরে লয়ে যাই।
সেথা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, তৃষিত আছে কত ভাই॥
ডাকো রে তাঁর নামে সবারে নিজধামে, সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখি কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে, হৃদয়ে সবে দেহো ঠাঁই॥
সতত চাহি তাঁরে ভোলো রে আপনারে, সবারে করো রে আপন।
শান্তি-আহরণে, শান্তি বিতরণে, জীবন করো রে যাপন।
এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে! চলো রে সবারে শুনাই।
বলো রে ডেকে বলো 'পিতার ঘরে চলো, হেথায় শোকতাপ নাই'॥

৪২

তারো তারো, হরি, দীনজনে।
ডাকো তোমার পথে, করুণাময়, পূজনসাধনহীন জনে॥
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ—
মরণমাঝারে শরণ দাও হে, রাখো এ দুর্বল ক্ষীণজনে॥
ঘেরিল যামিনী, নিভিল আলো, বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো—
পথ নাহি, প্রভু, পাথেয় নাহি— ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিকহারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হতে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতলপুরে— অন্ধ এ লোচন মোহঘনে॥

৪৩

তব প্রেম সুধারসে মেতেছি,
ডুবেছে মন ডুবেছে॥
কোথা কে আছে নাহি জানি—
তোমার মাধুরীপানে মেতেছি, ডুবেছে মন ডুবেছে॥

৪৪

আমারেও করো মার্জনা।
আমারেও দেহো, নাথ, অমৃতের কণা॥

গৃহ ছেড়ে পথে এসে বসে আছি ম্লানবেশে,
আমারো হৃদয়ে করো আসন রচনা ॥
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান—
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে—
শুন গো আমারো এই মরমবেদনা ॥

৪৫

ফিরো না ফিরো না আজি— এসেছ দুয়ারে।
শূন্য প্রাণে কোথা যাও শূন্য সংসারে ॥
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনো গো ডেকে—
অমৃত ভরিয়া লও মরমমাঝারে ॥
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও।
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।
তোমার কথা তাঁরে কয়ে তাঁর কথা যাও লয়ে—
চলে যাও তাঁর কাছে রাখি আপনারে ॥

৪৬

সবে মিলি গাও রে, মিলি মঙ্গলাচরো।
ডাকি লহো হৃদয়ে প্রিয়তমে ॥
মঙ্গল গাও আনন্দমনে। মঙ্গল প্রচারো বিশ্বমাঝে ॥

৪৭

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল—
অযুত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে ॥
তিনি নিজ অনুপম মহিমামাঝে নিলীন—
সন্ধান তাঁর কে করে, নিষ্ফল বেদ বেদান্ত।
পরব্রহ্ম, পরিপূর্ণ, অতি মহান—
তিনি আদিকারণ, তিনি বর্ণন-অতীত ॥

৪৮

তোমারে জানি নে হে, তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়॥
অসীম সৌন্দর্য তব কে করেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চিরনব—
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়॥
তুমি জ্যোতির জ্যোতি, আমি অন্ধ আঁধারে।
তুমি মুক্ত মহীয়ান, আমি মগ্ন পাথারে।
তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন— কী অপূর্ব মিলন তোমায় আমায়॥

৪৯

এবার বুঝেছি সখা, এ খেলা কেবলই খেলা—
মানবজীবন লয়ে এ কেবলই অবহেলা॥
তোমারে নহিলে আর ঘুচিবে না হাহাকার—
কী দিয়ে ভুলায়ে রাখো, কী দিয়ে কাটাও বেলা॥
বৃথা হাসে রবিশশী, বৃথা আসে দিবানিশি—
সহসা পরান কাঁদে শূন্য হেরি দিশি দিশি।
তোমারে খুঁজিতে এসে কী লয়ে রয়েছি শেষে—
ফিরি গো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা॥

৫০

চাহি না সুখে থাকিতে হে, হেরো কত দীনজন কাঁদিছে॥
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে, জীবনবন্ধন নিমেষে টুটিছে,
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন শরমে চাহে ঢাকিতে হে॥
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ, শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয়বেদন করিতে মোচন কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে॥
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে, আশীর্বাদ করো আতুর সন্তানে—
পথহারা জনে ডাকি গৃহপানে চরণে হবে রাখিতে হে।

প্রেম দাও শোকে করিতে সান্ত্বনা— ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে ॥

৫১

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল ॥
কত দিন পরে মন মাতিল গানে,
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই ব'লে ডাকি সবারে— ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল ॥

৫২

হে মন, তাঁরে দেখো আঁখি খুলিয়ে
যিনি আছেন সদা অন্তরে ॥
সবারে ছাড়ি প্রভু করো তাঁরে,
দেহ মন ধন যৌবন রাখো তাঁর অধীনে ॥

৫৩

জয় রাজরাজেশ্বর ! জয় অরূপসুন্দর !
জয় প্রেমসাগর ! জয় ক্ষেম-আকর !
তিমিরতিরস্কর হৃদয়গগনভাস্কর ॥

৫৪

আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয়মাঝারে ।
সকল কামনা সঁপিব চরণে অভিষেক-উপহারে ॥
তোমারে, বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব তোমার ভকতেরই এ অভিমান ।
ফিরিবে বাহিরে সর্ব চরাচর— তুমি চিত্ত-আগারে ॥

৫৫

হে অনাদি অসীম সুনীল অকূল সিন্ধু, আমি ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু ॥
তোমার শীতল অতলে ফেলো গো গ্রাসি,
তার পরে সব নীরব শান্তিরাশি—
তার পরে শুধু বিস্মৃতি আর ক্ষমা—

শুধাব না আর কখন্ আসিবে অমা,
কখন্ গগনে উদিবে পূর্ণ ইন্দু ॥

৫৬

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব কী লাগি একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ বিশ্বেশ্বর সুরপতি অসীম রহস্যে
নীরবে একাকী তব আলয়ে।
আমি চাহি তোমা-পানে—
তুমি মোরে নিয়ত হেরিছ, নিমেষবিহীন নত নয়নে ॥

৫৭

আইল শান্ত সন্ধ্যা, গেল অস্তাচলে শ্রান্ত তপন ॥
নমো স্নেহময়ী মাতা, নমো সুপ্তিদাতা,
নমো অতন্দ্র জাগ্রত মহাশান্তি ॥

৫৮

উঠি চলো, সুদিন আইল— আনন্দসৌগন্ধ উচ্ছ্বসিল ॥
আজি বসন্ত আগত স্বরগ হতে
ভক্তহৃদয়পুষ্পনিকুঞ্জে— সুদিন আইল ॥

৫৯

আমারে করো জীবনদান,
প্রেরণ করো অন্তরে তব আহ্বান ॥
আসিছে কত যায় কত, পাই শত হারাই শত—
তোমারি পায়ে রাখো অচল মোর প্রাণ ॥
দাও মোরে মঙ্গলব্রত, স্বার্থ করো দূরে প্রহত—
থামায়ে বিফল সন্ধান জাগাও চিত্তে সত্য জ্ঞান।
লাভে ক্ষতিতে সুখে-শোকে অন্ধকারে দিবা-আলোকে
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান ॥

৬০

রক্ষা করো হে।
আমার কর্ম হইতে আমায় রক্ষা করো হে।
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে,
আপন চিন্তা গ্রাসিছে আমায়— রক্ষা করো হে।
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যাজালে—
ছলনাডোর হইতে মোরে রক্ষা করো হে।
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার রয়েছে রোধিয়া হে—
আপনা হতে আপনার, মোরে রক্ষা করো হে॥

৬১

মহানন্দে হেরো গো সবে গীতরবে চলে শ্রান্তিহারা
জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশী তারা॥
তাঁহা হতে নামে জড়জীবনমনপ্রবাহ।
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া অসীম সৃজনধারা॥

৬২

প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা— এবে তোমার ক্রোড় চাহি।
শ্রান্ত হৃদয়ে, হে, তোমারি প্রসাদ চাহি॥
আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে তব শান্তিবারি চাহি॥
আজি সর্ববিত্ত ছাড়ি তোমায় নিত্য-নিত্য চাহি॥

৬৩

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে।
আমি যেতে চাই তব পথপানে, ওহে কত বাধা পায় পায় হে।
(তোমার অমৃতপথে, যে পথে তোমার আলো জ্বলে সেই অভয়পথে।)
চারি দিকে হেরো ঘিরেছে কারা, শত বাঁধনে জড়ায় হে।
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো— ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।

(তারা বাঁধিয়া রাখে, তোমার বাহুর বাঁধন হতে তারা বাঁধিয়া রাখে।)
দাও ভেঙে দাও এ ভবের সুখ, কাজ নেই এ খেলায় হে।
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মতো বেলা বহে তত যায় হে।
(ভুলে যে থাকি, দিন যে মিলায়, খেলা যে ফুরায়, ভুলে যে থাকি।)
হানো তব বাজ হৃদয়গহনে, দুখানল জ্বালো তায় হে।
তুমি নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে সে জল দাও মুছায়ে হে।
(নয়নজলে— তোমার-হাতের-বেদনা-দেওয়া নয়নজলে—
প্রাণের-সকল-কলঙ্ক-ধোওয়া নয়নজলে।)
শূন্য ক'রে দাও হৃদয় আমার, আসন পাতো সেথায় হে।
ওহে তুমি এসো এসো, নাথ হয়ে বোসো, ভুলো না আমায় হে।
(আমার শূন্য প্রাণে— চির-আনন্দে ভরে থাকো আমার শূন্য প্রাণে।)

৬৪

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ।
আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ।
(দয়া ক'রে দুখ দিলে আমায়, দয়া ক'রে।)
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তিবাঁধনে।
(কুড়ায়ে এনে, শতখান হতে কুড়ায়ে এনে,
ধুলা হতে তারে কুড়ায়ে এনে।)
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বোঝালে।
(বুঝায়ে দিলে, হৃদয়ে আসি বুঝায়ে দিলে,
তুমি কে হও আমার বুঝায়ে দিলে।)
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে— এনেছ তোমারি দুয়ারে।
(আমি না জানিতে, কোথা দিয়ে আমায় এনেছ
আমি না জানিতে।)

৬৫

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে, ছিলাম নিদ্রামগন।
সংসার মোরে মহামোহঘোরে ছিল সদা ঘিরে সঘন।
(ঘিরে ছিল, ঘিরেছিল হে আমায়—
মোহঘোরে— মহামোহে।)
আপনার হাতে দিবে যে বেদনা, ভাসাবে নয়নজলে,
কে জানিত হবে আমার এমন শুভদিন শুভলগন।
(জানি নে, জানি নে হে, আমি স্বপনে—
আমার এমন ভাগ্য হবে আমি জানি নে, জানি নে হে।)
জানি না কখন্ করুণা-অরুণ উঠিল উদয়াচলে,
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল আমার হৃদয়গগন।
(আমার হৃদয়গগন পূরিল তোমার চরণকিরণে—
তোমার করুণা-অরুণে।)
তোমার অমৃতসাগর হইতে বন্যা আসিল কবে—
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল কখন হইল ভগন।
(যত বাঁধ ছিল যেখানে, ভেঙে গেল, ভেসে গেল হে।)
সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েছ, পরানে দিয়েছ আশা—
আমার জীবনতরণী হইবে তোমার চরণে মগন।
(তোমার চরণে গিয়ে লাগিবে আমার জীবনতরণী—
অভয়চরণে গিয়ে লাগিবে।)

৬৬

তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো, সখা, তাই
'আমি বড়ো' 'আমি বড়ো' বলিছে সবাই।
(সবাই বড়ো হল হে।
সবার বড়ো কাছে নেই ব'লে সবাই বড়ো হল হে।
তোমায় দেখি নে ব'লে তোমায় পাই নে ব'লে,
সবাই বড়ো হল হে।)

নাথ, তুমি একবার এসো হাসিমুখে,
এরা ম্লান হয়ে যাক তোমার সম্মুখে।
(লাজে ম্লান হোক হে।
আমারে যারা ভুলায়েছিল লাজে ম্লান হোক হে।
তোমারে যারা ঢেকেছিল লাজে ম্লান হোক হে।)
কোথা তব প্রেমমুখ, বিশ্ব-ঘেরা হাসি—
আমারে তোমার মাঝে করো গো উদাসী।
(উদাস করো হে, তোমার প্রেমে—
তোমার মধুর রূপে উদাস করো হে।)
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড়ো অহংকার—
ভাঙো ভাঙো ভাঙো, নাথ, অভিমান তার।
(অভিমান চূর্ণ করো হে।
তোমার পদতলে মান চূর্ণ করো হে—
পদানত ক'রে মান চূর্ণ করো হে।)

৬৭

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। (নয়নের নয়ন!)
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে। (হৃদয়বিহারী!)
বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশ দিশে পাগলের মতো,
স্থির-আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে।
(তোমার বিরাম নাই, তুমি অবিরাম জাগিছ শয়নে স্বপনে।
তোমার নিমেষ নাই, তুমি অনিমেষ জাগিছ শয়নে স্বপনে।)
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ—
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ সেও আছে তব ভবনে।
(যে পথের ভিখারি সেও আছে তব ভবনে।
যার কেহ কোথাও নেই সেও আছে তব ভবনে।)
তুমি ছাড়া কেহ সাথি নাই আর, সমুখে অনন্ত জীবনবিস্তার—
কালপারাবার করিতেছ পার কেহ নাহি জানে কেমনে।

(তরী বহে নিয়ে যাও কেহ নাহি জানে কেমনে।
জীবনতরী বহে নিয়ে যাও কেহ নাহি জানে কেমনে।)
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি— যত জানি তত জানি নে।
(জেনে শেষ মেলে না— মন হার মানে হে।)
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর—
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে।
(তোমার আমার মাঝে কোনো বাধা নাই ভুবনে।)

৬৮

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।
(মোহমেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না।
অন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না।)
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে
ওহে 'হারাই হারাই' সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।
(আশ না মিটিতে হারাইয়া— পলক না পড়িতে হারাইয়া—
হৃদয় না জুড়াতে হারাইয়া ফেলি চকিতে।)
কী করিলে বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে—
ওহে এত প্রেম আমি কোথা পাব, নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
(আমার সাধ্য কিবা তোমারে—
দয়া না করিলে কে পারে—
তুমি আপনি না এলে কে পারে হৃদয়ে রাখিতে।)
আর-কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ—
ওহে তুমি যদি বলো এখনি করিব বিষয় -বাসনা বিসর্জন।
(দিব শ্রীচরণে বিষয়— দিব অকাতরে বিষয়—
দিব তোমার লাগি বিষয় -বাসনা বিসর্জন।)

৬৯

ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ,
আমি মর্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব—
শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহো সব।
(দিনু চরণতলে— কথা যা ছিল দিনু চরণতলে—
প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দিনু চরণতলে।)
আমি কী আর কব॥

এই সংসারপথসঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেমমুরতি তব।
(নীরবে যাব— পথের কাঁটা মানব না, নীরবে যাব।
হৃদয়ব্যথায় কাঁদব না, নীরবে যাব।)
আমি কী আর কব॥

আমি সুখদুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয়-অপ্রিয় হে—
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।
(আমি মাথায় লব— যাহা দিবে তাই মাথায় লব—
সুখ দুখ তব পদধূলি ব'লে মাথায় লব।)
আমি কী আর কব॥

অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না করো যদি ক্ষমা,
তবে পরানপ্রিয় দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।
(দিয়ো বেদনা— যদি ভালো বোঝ দিয়ো বেদনা—
বিচারে যদি দোষী হই দিয়ো বেদনা।)
আমি কী আর কব॥

তবু ফেলো না দূরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে—
তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার! মৃত্যু-আঁধার ভব।
(নিয়ো চরণে— ভবের খেলা সারা হলে নিয়ো চরণে—
দিন ফুরাইলে, দীননাথ, নিয়ো চরণে।)
আমি কী আর কব॥

৭০

ওগো দেবতা আমার, পাষাণদেবতা, হৃদিমন্দিরবাসী,
তোমারি চরণে উজাড় করেছি সকল কুসুমরাশি।
প্রভাত আমার সন্ধ্যা হইল, অন্ধ হইল আঁখি।
এ পূজা কি তবে সবই বৃথা হবে। কেঁদে কি ফিরিবে দাসী।
এবার প্রাণের সকল বাসনা সাজায়ে এনেছি থালি।
আঁধার দেখিয়া আরতির তরে প্রদীপ এনেছি জ্বালি।
এ দীপ যখন নিবিবে তখন কী রবে পূজার তরে।
দুয়ার ধরিয়া দাঁড়ায়ে রহিব নয়নের জলে ভাসি॥

৭১

গভীর রাতে ভক্তিভরে কে জাগে আজ, কে জাগে।
সপ্ত ভুবন আলো করে লক্ষ্মী আসেন, কে জাগে।
ষোলো কলায় পূর্ণ শশী, নিশার আঁধার গেছে খসি—
একলা ঘরের দুয়ার-'পরে কে জাগে আজ, কে জাগে।
ভরেছ কি ফুলের সাজি। পেতেছ কি আসন আজি।
সাজিয়ে অর্ঘ্য পূজার তরে কে জাগে আজ, কে জাগে।
আজ যদি রোস্ ঘুমে মগন চলে যাবে শুভলগন,
লক্ষ্মী এসে যাবেন স'রে— কে জাগে আজ, কে জাগে॥

৭২

যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ আমায় রাখতে ধরে॥
দুঃখসুখের বাঁধন সবই মিছে, বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়বোঝা টানে আমায় নীচে— ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে॥
যাত্রী আমি ওরে,
চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভ'রে।
দেহদুর্গে খুলবে সকল দ্বার, ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভালো মন্দ কাটিয়ে হব পার— চলতে রব লোকে লোকান্তরে॥

যাত্রী আমি ওরে,
যা-কিছু ভার যাবে সকল সরে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল-সাঁঝে আমার পরান টানে কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে॥
যাত্রী আমি ওরে,
বাহির হলেম না জানি কোন্ ভোরে।
তখন কোথাও গায় নি কোনো পাখি, কী জানি রাত কতই ছিল বাকি,
নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি জেগে ছিল অন্ধকারের প'রে॥
যাত্রী আমি ওরে,
কোন্ দিনান্তে পৌঁছব কোন্ ঘরে।
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে, বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু'নয়ানে অনাদিকাল চাহে আমার তরে॥

৭৩

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো— গভীর শান্তি এ যে
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে॥
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায় জন্মমরণপারে—
এল পথিক সেজে॥
চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে
আলো-আঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে।
এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে,
ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভ'রে—
কালিমা যায় মেজে।

৭৪

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভ'রে।

হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলনঘোরে ॥
চিরজীবন আমার বীণা-তারে
তোমার আঘাত লাগল বারে বারে,
তাইতে আমার নানা সুরের তানে
প্রাণে তোমার পরশ নিলেম ধ'রে ॥
আজ তো আমি ভয় করি নে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধুপারে
তবু তুমি সেই তো আমার তুমি—
আবার তোমায় চিনব নূতন ক'রে ॥

৭৫

বলো বলো, বন্ধু, বলো তিনি তোমার কানে কানে
নাম ধরে ডাক দিয়ে গেছেন ঝড়-বাদলের মধ্যখানে ॥
স্তব্ধ দিনের শান্তিমাঝে জীবন যেথায় বর্মে সাজে
বলো সেথায় পরান তিনি বিজয়মাল্য তোমার প্রাণে।
বলো তিনি সাথে সাথে ফেরেন তোমার দুখের টানে ॥
বলো বলো, বন্ধু, বলো নাম বলো তাঁর যাকে তাকে—
শুনুক তারা ক্ষণেক থেমে ফেরে যারা পথের পাকে।
বলো বলো তাঁরে চিনি ভাঙন দিয়ে গড়েন যিনি—
বেদন দিয়ে বাঁধো বীণা আপন-মনে সহজ গানে।
দুখীর আঁখি দেখুক চেয়ে সহজ সুখে তাঁহার পানে ॥

৭৬

মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা।
একটা বাঁধন কাটে যদি বেড়ে ওঠে চারখানা ॥

কেমন ক'রে নামবে বোঝা, তোমার আপদ নয় যে সোজা—
অন্তরেতে আছে যখন ভয়ের ভীষণ ভারখানা॥

রাতের আঁধার ঘোচে বটে বাতির আলো যেই জ্বালো,
মূর্ছাতে যে আঁধার ঘটে রাতের চেয়ে ঘোর কালো।
ঝড়-তুফানে ঢেউয়ের মারে তবু তরী বাঁচতে পারে,
সবার বড়ো মার যে তোমার ছিদ্রটার ওই মারখানা॥

পর তো আছে লাখে লাখে, কে তাড়াবে নিঃশেষে।
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে পর করে দেয় বিশ্বে সে।
কারাগারের দ্বারী গেলে তখনি কি মুক্তি মেলে।
আপনি তুমি ভিতর থেকে চেপে আছ দ্বারখানা॥

শূন্য ঝুলির নিয়ে দাবি রাগ ক'রে রোস্ কার 'পরে।
দিতে জানিস তবেই পাবি, পাবি নে তো ধার ক'রে।
লোভে ক্ষোভে উঠিস মাতি, ফল পেতে চাস রাতারাতি—
আপন মুঠো করলে ফুটো আপন থাঁড়ার ধারখানা॥

৭৭

খেলার সাথি, বিদায়দ্বার খোলো—
এবার বিদায় দাও।
গেল যে খেলার বেলা॥
ডাকিল পথিকে দিকে বিদিকে,
ভাঙিল রে সুখমেলা॥

৭৮

যাওয়া-আসারই এই কি খেলা
খেলিলে, হে হৃদিরাজা, সারা বেলা॥
ডুবে যায় হাসি আঁখিজলে—
বহু যতনে যারে সাজালে
তারে হেলা॥

৭৯

বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে
নিশীথেরই সমীরণ হায়— হায় ॥
মম মন হল উদাসী, দ্বার খুলিল—
বুঝি খেলারই বাঁধন ওই যায় ॥

৮০

কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে।
ভরসা কি মোর সামনে শুধু। নাহয় আমায় রাখবি পিছে ॥
আমায় দূরে যেই তাড়াবি সেই তো রে তোর কাজ বাড়াবি—
তোমায় নীচে নামতে হবে আমায় যদি ফেলিস নীচে ॥
যাচাই ক'রে নিবি মোরে এই খেলা কি খেলবি ওরে।
যে তোর হাত জানে না, মারকে জানে, ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে—
যে তোর মার ছেড়ে তোর হাতটি দেখে আসল জানা সেই জানিছে ॥

৮১

হৃদয়-আবরণ খুলে গেল তোমার পদপরশে হরষে ওহে দয়াময়।
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে
লোকে লোকে, দিকে দিকে, আঁধারে আলোকে, সুখে দুখে—
হেরিনু হে ঘরে পরে, জগতময়, চিত্তময় ॥

৮২

মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে হৃদয়স্বামী,
সংসারের সুখ দুখ সকলই ভুলিব আমি।
সকল সুখ দাও তোমার প্রেমসুখে—
তুমি জাগি থাকো জীবনে দিনযামী ॥

৮৩

শুভ্র প্রভাতে
পূর্বগগনে উদিল
কল্যাণী শুকতারা॥
তরুণ অরুণরশ্মি
ভাঙে অন্ধতামসী
রজনীর কারা॥

আনুষ্ঠানিক সংগীত

১

আজি কাঁদে কারা ওই শুনা যায়, অনাথেরা কোথা করে হায়-হায়,
দিন মাস যায়, বরষ ফুরায়— ফুরাবে না হাহাকার ?।
ওই কারা চেয়ে শূন্য নয়ানে সুখ-আশা-হীন নববর্ষ-পানে,
কারা শুয়ে শুষ্ক ভূমিশয়ানে— মরুময় চারি ধার ॥
আশ্বাসবচন সকলেরে ক'য়ে এসেছিল বর্ষ কত আশা লয়ে,
কত আশা দ'লে আজ যায় চ'লে— শূন্য কত পরিবার।
কত অভাগার জীবনসম্বল মুছে লয়ে গেল, রেখে অশ্রুজল—
নব বরষের উদয়ের পথে রেখে গেল অন্ধকার ॥
হায়, গৃহে যার নাই অন্নকণা মানুষের প্রেম তাও কি পাবে না—
আজি নাই কি রে কাতরের তরে করুণার অশ্রুধার।
কেঁদে বলো, 'নাথ, দুঃখ দূরে যাক, তাপিত ধরার হৃদয় জুড়াক—
বর্ষ যদি যায় সাথে লয়ে যাক বরষের শোকভার।'

২

জয় তব হোক জয়।
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে যশোমালা অক্ষয়।
বহুদিন হতে ভারতের বাণী আছিল নীরবে অপমান মানি,
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া রটালে বিশ্বময়।
জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি যে নব আলোকশিখা
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে দিল উজ্জ্বল টিকা।
অবারিতগতি তব জয়রথ ফিরে যেন আজি সকল জগৎ,
দুঃখ দীনতা যা আছে মোদের তোমারে বাঁধি না রয় ॥

৩

বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ কর' মহোজ্জ্বল আজ হে।
বরপুত্রসংঘ বিরাজ' হে।
ঘন তিমিররাত্রির চিরপ্রতীক্ষা পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতির্দীক্ষা।
যাত্রিদল সব সাজ' হে। দিব্যবীণা বাজ' হে।
এস' কর্মী, এস' জ্ঞানী, এস' জনকল্যাণধ্যানী,
এস' তাপসরাজ হে!
এস' হে ধীশক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে॥

৪

জগতের পুরোহিত তুমি— তোমার এ জগৎ-মাঝারে
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অরুণে উষায়।
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম, প্রভু হে, তোমারি হল জয়—
তোমার কৃপায় এক হল আজি এই যুগলহৃদয়।
যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে শশধরে ধরার প্রণয়ে
সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে।
জগত গাহিছে জয়-জয়, উঠেছে হরষকোলাহল,
প্রেমের বাতাস বহিতেছে— ছুটিতেছে প্রেমপরিমল।
পাখিরা গাও গো গান, কহো বায়ু চরাচরময়—
মহেশের প্রেমের জগতে প্রেমের হইল আজি জয়॥

৫

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর
যত করো বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
দুজনের আঁখি-'পরে তুমি থাকো আলো ক'রে—
তা হলে আঁধারে আর বলো হে কিসের ডর।

তোমারে হারায় যদি দুজনে হারাবে দোঁহে—
দুজনে কাঁদিবে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে,
এমনি আঁধার হবে পাশাপাশি বসে রবে
তবুও দোঁহার মুখ চিনিবে না পরস্পর।
দেখো, প্রভু, চিরদিন আঁখি-'পরে থেকো জেগে—
তোমারে ঢাকে না যেন সংসারের ঘন মেঘে।
তোমারি আলোকে বসি উজল-আনন-শশী
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিতকলেবর॥

৬

শুভদিনে শুভক্ষণে পৃথিবী আনন্দমনে
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ—
ওই চরণের কাছে দেখো গো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণহস্তে তুলে লও রাজরাজ।
এক সূত্রে দিয়ে, দেব, গেঁথে রাখো এক সাথে—
টুটে না ছিঁড়ে না যেন, থাকে যেন ওই হাতে।
তোমার শিশির দিয়ে রাখো তারে বাঁচাইয়ে—
কী জানি শুকায় পাছে সংসাররৌদ্রের মাঝ॥

৭

দুজনে এক হয়ে যাও, মাথা রাখো একের পায়ে—
দুজনের হৃদয় আজি মিলুক তাঁরি মিলন-ছায়ে।
তাঁহারি প্রেমের বেগে দুটি প্রাণ উঠুক জেগে—
যা-কিছু শীর্ণ মলিন টুটুক তাঁরি চরণ-ঘায়ে।
সমুখে সংসারপথ, বিঘ্নবাধা কোরো না ভয়—
দুজনে যাও চলে যাও— গান করে যাও তাঁহারি জয়।
ভকতি লও পাথেয়, শকতি হোক অজেয়—
অভয়ের আশিসবাণী আসুক তাঁরি প্রসাদ-বায়ে॥

৮

তাঁহার অসীম মঙ্গললোক হতে
তোমাদের এই হৃদয়বনচ্ছায়ে
অনন্তেরই পরশরসের স্রোতে
দিয়েছে আজ বসন্ত জাগায়ে।
তাই সুধাময় মিলনকুসুমখানি
উঠল ফুটে কখন নাহি জানি—
এই কুসুমের পূজার অর্ঘ্যখানি
প্রণাম করো দুইজনে তাঁর পায়ে।
সকল বাধা যাক তোমাদের ঘুচে,
নামুক তাঁহার আশীর্বাদের ধারা।
মলিন ধুলার চিহ্ন সে দিক মুছে,
শান্তিপবন বহুক বন্ধহারা।
নিত্যনবীন প্রেমের মাধুরীতে
কল্যাণফল ফলুক দোঁহার চিতে,
সুখ তোমাদের নিত্য রহুক দিতে
নিখিলজনের আনন্দ বাড়ায়ে॥

৯

নবজীবনের যাত্রাপথে দাও দাও এই বর
হে হৃদয়েশ্বর—
প্রেমের বিত্ত পূর্ণ করিয়া দিক চিত্ত ;
যেন এ সংসারমাঝে তব দক্ষিণমুখ রাজে ;
সুখরূপে পাই তব ভিক্ষা, দুখরূপে পাই তব দীক্ষা ;
মন হোক ক্ষুদ্রতামুক্ত, নিখিলের সাথে হোক যুক্ত,
শুভকর্মে যেন নাহি মানে ক্লান্তি
শান্তি শান্তি শান্তি॥

১০

প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি অন্তর্যামী
নমি তাঁরে আমি— নমি নমি।
বিপদে সম্পদে সুখে দুখে সাথি যিনি দিনরাতি অন্তর্যামী
নমি তাঁরে আমি— নমি নমি।
তিমিররাত্রে যাঁর দৃষ্টি তারায় তারায়,
যাঁর দৃষ্টি জীবনের মরণের সীমা পারায়,
যাঁর দৃষ্টি দীপ্ত সূর্য-আলোকে অগ্নিশিখায়, জীব-আত্মায় অন্তর্যামী
নমি তাঁরে আমি— নমি নমি।
জীবনের সব কর্ম সংসারধর্ম করো নিবেদন তাঁর চরণে।
যিনি নিখিলের সাক্ষী, অন্তর্যামী
নমি তাঁরে আমি— নমি নমি॥

১১

সুমঙ্গলী বধূ, সঞ্চিত রেখো প্রাণে স্নেহমধু। আহা।
সত্য রহো তুমি প্রেমে, ধ্রুব রহো ক্ষেমে—
দুঃখে সুখে শান্ত রহো হাস্যমুখে।
আঘাতে হও জয়ী অবিচল ধৈর্যে কল্যাণময়ী। আহা॥
চলো শুভবুদ্ধির বাণী শুনে,
সকরুণ নম্রতাগুণে চারি দিকে শান্তি হোক বিস্তার—
ক্ষমাস্নিগ্ধ করো তব সংসার।
যেন উপকরণের গর্ব আত্মারে না করে খর্ব।
মন যেন জানে, উপহাস করে কাল ধনমানে—
তব চক্ষে যেন ধূলির সে ফাঁকি নিত্যেরে না দেয় ঢাকি। আহা॥

১২

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠিছে ফুটি ক্ষুদ্র প্রাণগুলি, নন্দনের এনেছে সংবাদ।

এই হাসিমুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ,
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে, কোলে রেখে,
তোমরা করো গো আশীর্বাদ।
বলো, 'সুখে যাও চলে ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হতে আসুক বাতাস—
সুখ দুঃখ কোরো হেলা, সে কেবল ঢেউখেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ।'

১৩

সমুখে শান্তিপারাবার—
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার॥
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্তের বন্ধনক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার॥

৩. ১২. ১৯৩৯

১৪

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
'মারো মারো' ওঠে হাঁকি।
গর্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর—
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, হে ঈশ্বর!

এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা ॥

২৫. ১২. ১৯৩৯

১৫

আলোকের পথে, প্রভু, দাও দ্বার খুলে—
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,
প্রদোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা,
সমুখে আসিছে ঘিরে নিরাশার নিশা।
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা
আঁধারের আবরণে খোঁজে ধ্রুবতারা,
তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে—
আলোকের পথে ॥

২. ১১. ১৯৪০

১৬

ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে ॥
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ'
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি-উঠিল মহাকাশে ॥

১ বৈশাখ
১৩৪৮

১৭

হে নূতন,
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ ॥
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমামাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।
উদয়দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্তমাঝে
চিরনূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ ॥

২৩ বৈশাখ
১৩৪৮

প্রেম ও প্রকৃতি

১

গিয়াছে সে দিন যে দিন হৃদয় রূপেরই মোহনে আছিল মাতি,
প্রাণের স্বপন আছিল যখন— 'প্রেম' 'প্রেম' শুধু দিবস-রাতি।
শান্তিময়ী আশা ফুটেছে এখন হৃদয়-আকাশপটে,
জীবন আমার কোমল বিভায় বিমল হয়েছে বটে,
বালককালের প্রেমের স্বপন মধুর যেমন উজল যেমন
তেমন কিছুই আসিবে না—
তেমন কিছুই আসিবে না॥

সে দেবীপ্রতিমা নারিব ভুলিতে প্রথম প্রণয় আঁকিল যাহা,
স্মৃতিমরু মোর শ্যামল করিয়া এখনো হৃদয়ে বিরাজে তাহা।
সে প্রতিমা সেই পরিমলসম পলকে যা লয় পায়,
প্রভাতকালের স্বপন যেমন পলকে মিশায়ে যায়।
অলসপ্রবাহ জীবনে আমার সে কিরণ কভু ভাসিবে না আর—
সে কিরণ কভু ভাসিবে না—
সে কিরণ কভু ভাসিবে না॥

২

মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে, জীবন হতেছে শেষ।
শিথিল কপোল, মলিন নয়ন, তুষারধবল কেশ।
পাশেতে আমার নীরবে পড়িয়া অযতনে বীণাখানি—
বাজাবার বল নাহিক এ হাতে, জড়িমাজড়িত বাণী।
গীতিময়ী মোর সহচরী বীণা, হইল বিদায় নিতে।
আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই অমৃত আমার চিতে।
তবু একবার, আর-একবার, ত্যজিবার আগে প্রাণ
মরিতে মরিতে গাইয়া লইব সাধের সে-সব গান।
দুলিবে আমার সমাধি-উপরে তরুগণ শাখা তুলি—
বনদেবতারা গাহিবে তখন মরণের গানগুলি॥

৩

কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস।
কেন গো বিষণ্ণ আঁখি আমি যবে কাছে থাকি,
কেন উঠে মাঝে মাঝে আকুল নিশ্বাস।
আদর করিতে মোরে চায় কতবার,
সহসা কী ভেবে যেন ফেরে সে আবার।
নত করি দু নয়নে কী যেন বুঝায় মনে,
মন সে কিছুতে যেন পায় না আশ্বাস।
আমি যবে ব্যগ্র হয়ে ধরি তার পাণি
সে কেন চমকি উঠি লয় তাহা টানি।
আমি কাছে গেলে হায় সে কেন গো সরে যায়—
মলিন হইয়া আসে অধর সহাস॥

৪

তোরা বসে গাঁথিস মালা, তারা গলায় পরে।
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয় রে অনাদরে॥
তোরা সুধা করিস দান, তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও তো নাহি চায়—
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙে দিয়ে চলে যায়॥
তোরা কেবল হাসি দিবি, তারা কেবল বসে আছে—
চোখের জল দেখিলে তারা আর তো রবে না কাছে।
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরান ভেঙে মধু দিবি অশ্রুছাকা হাসি হেসে—
বুক ফেটে, কথা না ব'লে শুকায়ে পড়িবি শেষে॥

৫

বলি, ও আমার গোলাপ-বালা, বলি, ও আমার গোলাপ-বালা-
তোলো মুখানি, তোলো মুখানি— কুসুমকুঞ্জ করো আলা।

বলি, কিসের শরম এত! সখী, কিসের শরম এত!
সখী, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি কিসের শরম এত।
বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা। সখী, ঘুমায় চন্দ্রতারা।
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা সবে— ঘুমায় জগৎ যত।
বলিতে মনের কথা, সখী, এমন সময় কোথা।
প্রিয়ে, তোলো মুখানি, আছে গো আমার প্রাণের কথা কত।
আমি এমন সুধীর স্বরে, সখী, কহিব তোমার কানে—
প্রিয়ে, স্বপনের মতো সে কথা আসিয়ে পশিবে তোমার প্রাণে।
তবে মুখানি তুলিয়ে চাও, সুধীরে মুখানি তুলিয়ে চাও।
সখী, একটি চুম্বন দাও— গোপনে একটি চুম্বন চাও॥

৬

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ, হোথা যাস নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস নে॥
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা শেফালি হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা বল্‌ রে মুখ ফুটিয়ে॥
ভ্রমর কহে, 'হেথায় বেলা হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলি নি।
মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব—
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারই ঘায়ে জ্বলিব।'

৭

পাগলিনী, তোর লাগি কী আমি করিব বল্‌।
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল।
আদরের ধন তুমি, আদরে রাখিব আমি—
আদরিণী, তোর লাগি পেতেছি এ বক্ষস্থল।
আয় তোরে বুকে রাখি— তুমি দেখো, আমি দেখি—
শ্বাসে শ্বাস মিশাইব, আঁখিজলে আঁখিজল॥

৮

ওই কথা বলো সখী, বলো আর বার—
ভালোবাস মোরে তাহা বলো বার বার।
কতবার শুনিয়াছি, তবুও আবার যাচি—
ভালোবাস মোরে তাহা বলো গো আবার॥

৯

শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি—
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি!
দেখো, তোমারি দুয়ার-'পরে
সখী, এসেছে তোমারি রবি॥
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখো ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
জগত উঠেছে নয়ন মেলিয়া নূতন জীবন লভি।
তবে তুমি কি সজনী জাগিবে নাকো,
আমি যে তোমারি কবি॥
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি—
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠ চাহি।
আজিও এসেছি, চেয়ে দেখো দেখি
আর তো রজনী নাহি।
আজিও এসেছি, উঠ উঠ সখী,
আর তো রজনী নাহি।
সখী, শিশিরে মুখানি মাজি
সখী, লোহিত বসনে সাজি
দেখো বিমল সরসী-আরশির 'পরে অপরূপ রূপরাশি।

থেকে থেকে ধীরে হেলিয়া পড়িয়া
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া শরমের মৃদু হাসি ॥

১০

ও কথা বোলো না তারে, কভু সে কপট না রে—
আমার কপাল-দোষে চপল সেজন।
অধীরহৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মতো করে অন্বেষণ।
ভালো সে বাসিত যবে করে নি ছলনা।
মনে মনে জানিত সে সত্য বুঝি ভালোবাসে—
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবনকল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়া আমায়,
সে হাসি কি সত্য নয়। সে যদি কপট হয়
তবে সত্য বলে কিছু নাহি এ ধরায়।
ও কথা বোলো না তারে— কভু সে কপট না রে,
আমার কপাল-দোষে চপল সেজন।
প্রেমমরীচিকা হেরি ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন ॥

১১

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার প্রাণের পাখিটি উড়িয়ে যাক।
সে যে হেথা গান গাহে না! সে যে মোরে আর চাহে না!
সুদূর কানন হইতে সে যে শুনেছে কাহার ডাক—
পাখিটি উড়িয়ে যাক ॥
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার সাধের স্বপন যায় রে যায়।

হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায় রে হায়,
সাধের স্বপন যায় রে যায় ॥
যে যায় সে যায়, ফিরিয়ে না চায়, যে থাকে সে শুধু করে হায়-হায়—
নয়নের জল নয়নে শুকায়— মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে— রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে— আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক। একবার তবু ডাক্।
কী জানি যদি রে প্রাণ কাঁদে তার তবে থাক্, তবে থাক্ ॥

১২

হৃদয় মোর কোমল অতি, সহিতে নারি রবির জ্যোতি,
লাগিলে আলো শরমে ভয়ে মরিয়া যাই মরমে ॥
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,
ভূতলে ঝ'রে পড়িতে চাহি আকুল হয়ে শরমে ॥
কোমল দেহে লাগিলে বায় পাপড়ি মোর খসিয়া যায়,
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি ঢালিব সদা সুরভিরাশি,
আঁধার এই বনের কোলে মরিব শেষে শুকায়ে ॥

১৩

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর, আয় লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনাহাসি রাশি রাশি মৃদু মধু জোছনায়।
মলয় কপোল চুমে চলিয়া পড়িছে ঘুমে,
কপোলে নয়নে জোছনা মরিয়া যায়।
যমুনালহরীগুলি চরণে কাঁদিতে চায় ॥

১৪

খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা, স্রোত বহে যায় যে।
মন্দ মন্দ অঙ্গভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে— এই বেলা খুলে দে॥
ভাঙিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পুরেছে পাল,
স্রোতোমুখে প্রাণ মন যাক ভেসে যাক—
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয় রে॥

১৫

এ কী হরষ হেরি কাননে!
পরান আকুল, স্বপন বিকশিত মোহমদিরাময় নয়নে॥
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি, বনে বনে বহিছে সমীরণ
নবপল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে— বসন্তপরশে বন শিহরে।
কী জানি কোথা পরান মন ধাইছে বসন্তসমীরণে॥
ফুলেতে শুয়ে জোছনা হাসিতে হাসি মিলাইছে।
মেঘ ঘুমায়ে ঘুমায়ে ভেসে যায় ঘুমভারে অলসা বসুন্ধরা—
দূরে পাপিয়া পিউ-পিউ রবে ডাকিছে সঘনে॥

১৬

আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখী, আমারে জাগায়ো না।
আমার সাধের পাখি যারে নয়নে নয়নে রাখি
তারি স্বপনে রয়েছি ভোর, আমার স্বপন ভাঙায়ো না।
কাল ফুটিবে রবির হাসি, কাল ছুটিবে তিমিররাশি—
কাল আসিবে আমার পাখি, ধীরে বসিবে আমার পাশ।
ধীরে গাহিবে সুখের গান, ধীরে ডাকিবে আমার নাম।
ধীরে বয়ান তুলিয়া নয়ান খুলিয়া হাসিব সুখের হাস।
আমার কপোল ভ'রে শিশির পড়িবে ঝ'রে—
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি, মরমে রহিব ম'রে!
তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া রয়েছি আঁখি—

কখন অসিবে প্রাতে আমার সাধের পাখি,
কখন জাগাবে মোরে আমার নামটি ডাকি ॥

১৭

গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয়স্রোতে।
'যাব না' 'যাব না' করি ভাসায়ে দিলাম তরী—
উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হতে ॥
দাঁড়াতে পাই নে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ—
বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে ॥
জানিনু না, শুনিনু না, কিছু না ভাবিনু—
অন্ধ হয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিনু।
এত দূর ভেসে এসে ভ্রম যে বুঝেছি শেষে—
এখন ফিরিতে কেন হয় গো বাসনা।
আগেভাগে, অভাগিনী, কেন ভাবিলি না।
এখন যে দিকে চাই কূলের উদ্দেশ নাই—
সম্মুখে আসিছে রাত্রি, আঁধার করিছে ঘোর।
স্রোতপ্রতিকূলে যেতে বল যে নাই এ চিতে,
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়েছে হৃদয় মোর ॥

১৮

হাসি কেন নাই ও নয়নে! ভ্রমিতেছ মলিন-আননে।
দেখো, সখী, আঁখি তুলি ফুলগুলি ফুটেছে কাননে ॥
তোমারে মলিন দেখি ফুলেরা কাঁদিছে সখী
শুধাইছে বনলতা কত কথা আকুল বচনে ॥
এসো সখী, এসো হেথা, একটি কহো গো কথা—
বলো, সখী, কার লাগি পাইয়াছ মনোব্যথা।
বলো, সখী, মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে ॥

১৯

একবার বলো, সখী, ভালোবাস মোরে—
রেখো না ফেলিয়া আর সন্দেহের ঘোরে।
সখী, ছেলেবেলা হতে   সংসারের পথে পথে
মিথ্যা মরীচিকা লয়ে যেপেছি সময়।
পারি নে, পারি নে আর—   এসেছি তোমারি দ্বার—
একবার বলো, সখী, দিবে কি আশ্রয়।
সহেছি ছলনা এত, ভয় হয় তাই
সত্যকার সুখ বুঝি এ কপালে নাই।
বহুদিন ঘুমঘোরে   ডুবায়ে রাখিয়া মোরে
অবশেষে জাগায়ো না নিদারুণ ঘায়।
ভালোবেসে থাকো যদি   লও লও এই হৃদি—
ভগ্ন চূর্ণ দগ্ধ এই হৃদয় আমার
এ হৃদয় চাও যদি লও উপহার॥

২০

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমারে, সখা, কত ভালোবাসি।
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা,
কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা।
ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী—
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়,
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয়।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি,
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালোবাসি॥

২১

কেমনে শুধিব বলো তোমার এ ঋণ।
এ দয়া তোমার, মনে রবে চিরদিন।
যবে এ হৃদয়মাঝে ছিল না জীবন,
মনে হ'ত ধরা যেন মরুর মতন,
সে হৃদে ঢালিয়ে তব প্রেমবারিধার
নূতন জীবন যেন করিলে সঞ্চার।
একদিন এ হৃদয়ে বাজিত প্রেমের গান,
কবিতায় কবিতায় পূর্ণ যেন ছিল প্রাণ—
দিনে দিনে সুখগান থেমে গেল এ হৃদয়ে,
নিশীথশ্মশানসম আছিল নীরব হয়ে—
সহসা উঠেছে বাজি তব করপরশনে,
পুরানো সকল ভাব জাগিয়া উঠেছে মনে,
বিরাজিছে এ হৃদয়ে যেন নব-উষাকাল,
শূন্য হৃদয়ের যত ঘুচেছে আঁধারজাল।
কেমনে শুধিব বলো তোমার এ ঋণ।
এ দয়া তোমার, মনে রবে চিরদিন॥

২২

এ ভালোবাসার যদি দিতে প্রতিদান—
একবার মুখ তুলে চাহিয়া দেখিতে যদি
যখন দুখের জল বর্ষিত নয়ান—
শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যবে ছুটে আসিতাম, সখী,
ওই মধুময় কোলে দিতে যদি স্থান—
তা হলে, তা হলে, সখী, চিরজীবনের তরে
দারুণযাতনাময় হ'ত না পরান।
একটি কথায় তব একটু স্নেহের স্বরে
যদি যায় জুড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা,

তবে সেইটুকু, সখী, কোরো অভাগার তরে—
নহিলে হৃদয় যাবে ভেঙেচুরে বালা!
একবার মুখ তুলে চেয়ো এ মুখের পানে—
মুছায়ে দিয়ো গো, সখী, নয়নের জল—
তোমার স্নেহের ছায়ে আশ্রয় দিয়ো গো মোরে,
আমার হৃদয় মন বড়োই দুর্বল।
সংসারের স্রোতে ভেসে কত দূর যাব চলে—
আমি কোথা রব আর তুমি কোথা রবে।
কত বর্ষ হবে গত, কত সূর্য হবে অস্ত,
আছিল নূতন যাহা পুরাতন হবে।
তখন সহসা যদি দেখা হয় দুইজনে—
আসি যদি কহিবারে মরমের ব্যথা—
তখন সঙ্কোচভরে দূরে কি যাইবে সরে।
তখন কি ভালো করে কবে নাকো কথা॥

২৩

ওকি সখা, কেন মোরে কর তিরস্কার!
একটু বসি বিরলে কাঁদিব যে মন খুলে
তাতেও কী আমি বলো করিনু তোমার।
মুছাতে এ অশ্রুবারি বলি নি তোমায়,
একটু আদরের তরে ধরি নি তো পায়—
তবে আর কেন, সখা, এমন বিরাগ-মাখা
ভ্রূকুটি এ ভগ্নবুকে হানো বার বার
জানি জানি এ কপাল ভেঙেছে যখন
অশ্রুবারি পারিবে না গলাতে ও মন—
পথের পথিকও যদি মোরে হেরি যায় কাঁদি
তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার॥

২৪

ওকি সখা, মুছ আঁখি। আমার তরেও কাঁদিবে কি!
কে আমি বা! আমি অভাগিনী— আমি মরি তাহে দুখ কিবা।
পড়ে ছিনু চরণতলে— দলে গেছ, দেখ নি চেয়ে।
গেছ গেছ, ভালো ভালো— তাহে দুখ কিবা॥

২৫

হা সখী, ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা।
ভালো যদি নাহি বাসে কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা॥
মিছে প্রণয়ের হাসি বোলো তারে ভালো নাহি বাসি।
চাই নে মিছে আদর তাহার, ভালোবাসা চাই নে।
বোলো বোলো, সজনী লো, তারে—
আর যেন সে লো আসে নাকো হেথা॥

২৬

ওকে কেন কাঁদালি! ও যে কেঁদে চলে যায়—
ওর হাসিমুখ যে আর দেখা যাবে না॥
শূন্যপ্রাণে চলে গেল, নয়নেতে অশ্রুজল—
এ জনমে আর ফিরে চাবে না॥
দু দিনের এ বিদেশে কেন এল ভালোবেসে,
কেন নিয়ে গেল প্রাণে বেদনা।
হাসি খেলা ফুরালো রে, হাসিব আর কেমনে!
হাসিতে তার কান্নামুখ পড়ে যে মনে।
ডাক্‌ তারে একবার— কঠিন নহে প্রাণ তার!—
আর বুঝি তার সাড়া পাবে না॥

২৭

এতদিন পরে, সখী, সত্য সে কি হেথা ফিরে এল।
দীনবেশে ম্লানমুখে কেমনে অভাগিনী
যাবে তার কাছে সখী রে।

শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন—
সবই গেছে কিছু নাই— রূপ নাই, হাসি নাই—
সুখ নাই, আশা নাই— সে আমি আর আমি নাই—
না যদি চেনে সে মোরে তা হলে কী হবে ॥

২৮

চরাচর সকলই মিছে মায়া, ছলনা।
কিছুতেই ভুলি নে আর— আর না রে—
মিছে ধূলিরাশি লয়ে কী হবে।
সকলই আমি জেনেছি, সবই শূন্য— শূন্য— শূন্য ছায়া—
সবই ছলনা ॥
দিনরাত যার লাগি সুখ দুখ না করিনু জ্ঞান,
পরান মন সকলই দিয়েছি, তা হতে রে কিবা পেনু।
কিছু না— সবই ছলনা ॥

২৯

তারে দেহো গো আনি।
ওই রে ফুরায় বুঝি অন্তিম যামিনী ॥
একটি শুনিব কথা, একটি শুনাব ব্যথা—
শেষবার দেখে নেব সেই মধুমুখানি ॥
ওই কোলে জীবনের শেষ সাধ মিটিবে,
ওই কোলে জীবনের শেষ স্বপ্ন ছুটিবে।
জনমে পূরে নি যাহা আজ কি পূরিবে তাহা।
জীবনের সব সাধ ফুরাবে এখনি ?।

৩০

সাধের কাননে মোর রোপণ করিয়াছিনু
একটি লতিকা, সখী, অতিশয় যতনে।
প্রতিদিন দেখিতাম কেমন সুন্দর ফুল
ফুটিয়াছে শত শত হাসি-হাসি আননে।

প্রতিদিন সযতনে চালিয়া দিতাম জল,
প্রতিদিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা।
সোনার লতাটি আহা বন করেছিল আলো—
সে লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?
কেমন বনের মাঝে আছিল মনের সুখে
গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।
প্রেমের সে আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ রেখেছিল তারে
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে।
এতদিন ফুলে ফুলে ছিল ঢলোঢলো মুখ,
শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিকা।
ছিন্ন অবশেষটুকু এখনো জড়ানো বুকে—
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?।

৩১

সেই যদি সেই যদি ভাঙিল এ পোড়া হৃদি,
সেই যদি ছাড়াছাড়ি হল দুজনায়,
একবার এসো কাছে— কী তাহাতে দোষ আছে।
জন্মশোধ দেখে নিয়ে লইব বিদায়।
সেই গান একবার গাও সখী, শুনি—
যেই গান একসনে গাইতাম দুইজনে,
গাইতে গাইতে শেষে পোহাত যামিনী।
চলিনু চলিনু তবে— এ জন্মে কি দেখা হবে।
এ জন্মের সুখ তবে হল অবসান॥
তবে, সখী, এসো কাছে। কী তাহাতে দোষ আছে।
আরবার গাও, সখী, পুরানো সে গান॥

৩২

দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে—
কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে॥

নিকুঞ্জে দখিনাবায় করিছে হায়-হায়,
লতাপাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে॥
দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল বয়ে,
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল রয়ে।
আর তো হল না দেখা, জগতে দোঁহে একা—
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে॥

৩৩

দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিরল।
এই ম্রিয়মাণ মুখে তোমাদের এত সুখে
বলো দেখি কোন্ প্রাণে ঢালিব গরল।
কিনা করিয়াছি তব বাড়াতে আমোদ—
কত কষ্টে করেছিনু অশ্রুবারি রোধ।
কিন্তু পারি নে যে সখা— যাতনা থাকে না ঢাকা,
মর্ম হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে অশ্রুজল।
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা যদি গো শুধাতে কথা
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি-অনল।
কেবল উপেক্ষা সহি বলো গো কেমনে রহি।
কেমনে বাহিরে মুখে হাসিব কেবল॥

৩৪

পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।
আয় আর-একটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়।
মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়।
মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়—
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়।
হায় মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়—
আবার দেখা যদি হল, সখা, প্রাণের মাঝে আয়॥

৩৫

গা সখী, গাইলি যদি, আবার সে গান।
কতদিন শুনি নাই ও পুরানো তান॥
কখনো কখনো যবে নীরব নিশীথে
একেলা রয়েছি বসি চিন্তামগ্ন চিতে—
চমকি উঠিত প্রাণ— কে যেন গায় সে গান,
দুই-একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে।
হা হা সখী, সেদিনের সব কথাগুলি
প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুলি।
যেদিন মরিব, সখী, গাস্‌ ওই গান—
শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ॥

৩৬

ও গান আর গাস্‌ নে, গাস্‌ নে, গাস্‌ নে।
যে দিন গিয়েছে সে আর ফিরিবে না—
তবে ও গান গাস্‌ নে॥
হৃদয়ে যে কথা লুকানো রয়েছে সে আর জাগাস নে॥

৩৭

সকলই ফুরাইল। যামিনী পোহাইল।
যে যেখানে সবে চলে গেল॥
রজনীতে হাসিখুশি, হরষপ্রমোদরাশি—
নিশিশেষে আকুলমনে চোখের জলে
সকলে বিদায় হল॥

৩৮

ফুলটি ঝরে গেছে রে।
বুঝি সে উষার আলো উষার দেশে চলে গেছে॥

শুধু সে পাখিটি মুদিয়া আঁখিটি
সারাদিন একলা বসে গান গাহিতেছে ॥
প্রতিদিন দেখত যারে আর তো তারে দেখতে না পায়—
তবু সে নিত্যি আসে গাছের শাখে, সেইখেনেতেই বসে থাকে,
সারা দিন সেই গানটি গায় সন্ধ্যা হলে কোথায় চলে যায় ॥

৩৯

সখা হে, কী দিয়ে আমি তুষিব তোমায়।
জরজর হৃদয় আমার মর্মবেদনায়,
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায় ॥
তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালোবাসি—
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায় ॥

৪০

বলি গো সজনী, যেয়ো না, যেয়ো না—
তার কাছে আর যেয়ো না, যেয়ো না।
সুখে সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক—
মোর কথা তারে বোলো না, বোলো না ॥
আমায় যখন ভালো সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে।
কাজ কী, কাজ কী, কাজ কী সজনী—
মোর তরে তারে দিয়ো না বেদনা ॥

৪১

সহে না যাতনা
দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে
নিশিদিন বসে আছি শুধু পথপানে চেয়ে—
সখা হে, এলে না।
সহে না যাতনা ॥

দিন যায়, রাত যায়, সব যায়—
আমি বসে হায়!
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই—
শুকায়ে গিয়াছে আঁখিজল।
একে একে সব আশা ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ে যায়—
সহে না যাতনা॥

৪২

যাই যাই, ছেড়ে দাও— স্রোতের মুখে ভেসে যাই।
যা হবার তা হবে আমার, ভেসেছি তো ভেসে যাই॥
ছিল যত সহিবার সহেছি তো অনিবার—
এখন কিসের আশা আর। ভেসেছি তো ভেসে যাই॥

৪৩

অসীম সংসারে যার কেহ নাহি কাঁদিবার
সে কেন গো কাঁদিছে!
অশ্রুজল মুছিবার নাহি রে অঞ্চল যার
সেও কেন কাঁদিছে!
কেহ যার দুঃখগান শুনিতে পাতে না কান,
বিমুখ সে হয় যারে শুনাইতে চায়,
সে আর কিসের আশে রয়েছে সংসারপাশে—
জলন্ত পরান বহে কিসের আশায়॥

৪৪

অনন্তসাগরমাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।
গেছে সুখ, গেছে দুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া॥
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু দিগ্‌বিদিক হারাইয়া॥

জলধি রয়েছে স্থির, ধু-ধু করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে দুই বাহু প্রসারিয়া॥

৪৫

ফিরায়ো না মুখখানি,
ফিরায়ো না মুখখানি রানী ওগো রানী॥
ভ্রূভঙ্গতরঙ্গ কেন আজি সুনয়নী!
হাসিরাশি গেছে ভাসি, কোন্ দুখে সুধামুখে নাহি বাণী।
আমারে মগন করো তোমার মধুর করপরশে
সুধাসরসে।
প্রাণ মন পুরিয়া দাও নিবিড় হরষে।
হেরো শশীসুশোভন, সজনী,
সুন্দর রজনী।
তৃষিতমধুপসম কাতর হৃদয় মম—
কোন্ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাষাণী॥

৪৬

হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখী,
কেন নয়নে আসে বারি।
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে—
বলো কী করিব আমি সখী।
দেখা হলে, সখী, সেই প্রাণবঁধুরে কী বলিব নাহি জানি।
সে কি না জানিবে, সখী, রয়েছে যা হৃদয়ে—
না বুঝে কি ফিরে যাবে সখী॥

৪৭

দাঁড়াও, মাথা খাও, যেয়ো না সখা।
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়—
কতদিন পরে আজি পেয়েছি দেখা ॥
আর তো চাহি নে কিছু, কিছু না, কিছু না—
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব।
তাও কি হবে না গো, সখা গো!
শুধু একবার ফিরে চাও ॥

৪৮

কে যেতেছিস, আয় রে হেথা— হৃদয়খানি যা-না দিয়ে।
বিম্বাধরের হাসি দেব, সুখ দেব, মধুমাখা দুঃখ দেব,
হরিণ-আঁখির অশ্রু দেব অভিমানে মাখাইয়ে ॥
অচেতন করব হিয়ে বিষে-মাখা সুধা দিয়ে,
নয়নের কালো আলো মরমে বরষিয়ে ॥
হাসির ঘায়ে কাঁদাইব, অশ্রু দিয়ে হাসাইব,
মৃণালবাহু দিয়ে সাধের বাঁধন বেঁধে দেব।
চোখে চোখে রেখে দেব—
দেব না হৃদয় শুধু, আর-সকলই যা-না নিয়ে ॥

৪৯

আবার মোরে পাগল করে দিবে কে।
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন বিরাগ-ভরা বিবেকে ॥
আবার প্রাণে নূতন টানে প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল স্রোতে বহায় যদি—
আবার দুটি নয়নে লুটি হৃদয় হ'রে নিবে কে!
আবার মোরে পাগল করে দিবে কে ॥

আবার কবে ধরণী হবে তরুণা।
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে স্বরগ হতে করুণা।
নিশীথনভে শুনিব কবে গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি কুমারী উষা অরুণা।
আবার কবে ধরণী হবে তরুণা।

দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি- আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে জগত-জাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি সবার হাসি।
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ— জীবনরাশি।
প্রকৃতিবধূ চাহিবে মধু, পরিবে নব আভরণ—
সে দিবে খুলি এ ঘোর ধূলি- আবরণ।

হৃদয়ে এসে মধুর হেসে প্রাণের গান গাহিয়া
পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া।
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি আকুল নীরে,
ঝরনা-সম জগত মম ঝরিবে শিরে—
তাহার বাণী দিবে গো আনি সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া॥

৫০

জীবনে এ কি প্রথম বসন্ত এল, এল! এল রে!
নবীন বাসনায় চঞ্চল যৌবন নবীন জীবন পেল।
এল, এল।
বাহির হতে চায় মন, চায়, চায় রে—
করে কাহার অন্বেষণ।

ফাগুন-হাওয়ার দোল দিয়ে যায় হিল্লোল—
চিত্তসাগর উদ্‌বেল। এল, এল।
দখিনবায়ু ছুটিয়াছে, বুঝি খোঁজে কোন্‌ ফুল ফুটিয়াছে—
খোঁজে বনে বনে— খোঁজে আমার মনে।
নিশিদিন আছে মন জাগি কার পদপরশন-লাগি—
তারি তরে মর্মের কাছে শতদলদল মেলিয়াছে
আমার মন॥

৫১

কাছে ছিলে, দূরে গেলে— দূর হতে এসো কাছে।
ভুবন ভ্রমিলে তুমি— সে এখনো বসে আছে॥
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারো নি ভালো—
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে॥
জটিল হয়েছে জাল, প্রতিকূল হল কাল—
উন্মাদ তানে তানে কেটে গেছে তাল।
কে জানে তোমার বীণা সুরে ফিরে যাবে কিনা—
নিঠুর বিধির টানে তার ছিঁড়ে যায় পাছে॥

৫২

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই-যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি—
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে ॥
যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে।
স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর— নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রিদিনমান— আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিলবন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে ॥

৫৩

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে ॥
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে ॥
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে
তুমি চিরপুরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি—
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে ॥

৫৪

আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি ॥
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে।
গাহিবারে সুর ভুলে গেছি রে ॥

৫৫

বৃথা গেয়েছি বহু গান
কোথা সঁপেছি মন প্রাণ!
তুমি তো ঘুমে নিমগন, আমি জাগিয়া অনুখন।
আলসে তুমি অচেতন, আমারে দহে অপমান।—
বৃথা গেয়েছি বহু গান।
যাত্রী সবে তরী খুলে গেল সুদূর উপকূলে,
মহাসাগরতটমূলে ধূ ধূ করিছে এ শ্মশান।—
কাহার পানে চাহ কবি, একাকী বসি ম্লানছবি।
অস্তাচলে গেল রবি, হইল দিবা অবসান।—
বৃথা গেয়েছি বহু গান॥

৫৬

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা তুমি আমার নিভৃত সাধনা,
মম বিজনগগনবিহারী।
আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম বিজনজীবনবিহারী॥
মম হৃদয়রক্তরাগে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
মম সন্ধ্যাগগনবিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম বিজনস্বপনবিহারী॥
মম মোহের স্বপনলেখা তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে।
মম মুগ্ধনয়নবিহারী।
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম মোহনমরণবিহারী॥

৫৭

বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল
সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না॥

দুটি অতুল পদতল রাতুল শতদল
জানি না কী লাগিয়া পরশে ধরাতল,
মাটির 'পরে তার করুণা মাটি হল— সে পদ মোর পথে চলিবে না ?।
তব কণ্ঠ- 'পরে হয়ে দিশাহারা
বিধি অনেক ঢেলেছিল মধুধারা।
যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি মম
নীরবে অতিধীরে ভ্রমরগীতিসম
দু কথা বল যদি 'প্রিয়' বা 'প্রিয়তম', তাহে তো কণা মধু ফুরাবে না।
হাসিতে সুধানদী উছলে নিরবধি,
নয়নে ভরি উঠে অমৃতমহোদধি—
এত সুধা কেন সৃজিল বিধি, যদি আমারি তৃষাটুকু পূরাবে না॥

৫৮

বঁধু, মিছে রাগ কোরো না, কোরো না।
মম মন বুঝে দেখো মনে মনে— মনে রেখো, কোরো করুণা॥
পাছে আপনারে রাখিতে না পারি
তাই কাছে কাছে থাকি আপনারি—
মুখে হেসে যাই, মনে কেঁদে চাই— সে আমার নহে ছলনা॥
দিনেকের দেখা, তিলেকের সুখ,
ক্ষণেকের তরে শুধু হাসিমুখ—
পলকের পরে থাকে বুক ভ'রে চিরজনমের বেদনা।
তারি মাঝে কেন এত সাধাসাধি,
অবুঝ আঁধারে কেন মরি কাঁদি—
দূর হতে এসে ফিরে যাই শেষে বহিয়া বিফল বাসনা॥

৫৯

কার হাতে যে ধরা দেব হায়
তাই ভাবতে আমার বেলা যায়।

ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন—
বাঁয়ের দিকে ফিরলে তখন দখিন ডাকে 'আয় রে আয়'॥

৬০

আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন—
সে কি অমনি হবে।
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন—
সে কি অমনি হবে॥
কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে—
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে করুক-না বশ, মজুক প্রেমের রসে—
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন—
সে কি অমনি হবে॥

৬১

বুঝি এল, বুঝি এল ওরে প্রাণ।
এবার ধর্‌ এবার ধর্‌ দেখি তোর গান॥
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে, ধরা বুঝি শিউরে ওঠে—
দিগন্তে ওই স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান॥

৬২

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।
আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
ওরে মন, খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে—
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক-পানে তুলে দে।
আনন্দে সব বাধা টুটে সবার সাথে ওঠ্‌ রে ফুটে—
চোখের 'পরে আলস-ভরে রাখিস নে আর আঁচল টানি॥

৬৩

তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির-ছলোছলো,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ওই রৌদ্রে ঝলোমলো।
এমনি নিবিড় ক'রে এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভ'রে—
তাই তো আমি জানি বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল-মানস-সাগর-জলে কমল টলোমলো।
তাই তো আমি জানি— আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান, আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা আলোক জলোজ্বলো॥

৬৪

জলে-ডোবা চিকন শ্যামল কচি ধানের পাশে পাশে
ভরা নদীর ধারে ধারে হাঁসগুলি আজ সারে সারে
দুলে দুলে ওই-যে ভাসে।
অমনি করেই বনের শিরে মৃদু হাওয়ায় ধীরে ধীরে
দিক্‌রেখাটির তীরে তীরে মেঘ ভেসে যায় নীল আকাশে।
অমনি করেই অলস মনে একলা আমার তরীর কোণে
মনের কথা সারা সকাল যায় ভেসে আজ অকারণে।
অমনি করেই কেন জানি দূর মাধুরীর আভাস আনি
ভাসে কাহার ছায়াখানি আমার বুকের দীর্ঘশ্বাসে॥

৬৫

স্বপনলোকের বিদেশিনী কে যেন এলে কে
কোন্ ভুলে-যাওয়া বসন্ত থেকে॥
যা-কিছু সব গেছ ফেলে খুঁজতে এলে হৃদয়ে,
পথ চিনেছ চেনা ফুলের চিহ্ন দেখে॥
বুঝি মনে তোমার আছে আশা
কার হৃদয়ব্যথায় মিলবে বাসা।

দেখতে এলে করুণ বীণা— বাজে কিনা হৃদয়ে,
তারগুলি তার কাঁপে কিনা— যায় কি সে ডেকে

৬৬

হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে—
বেড়া ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে॥
তোমার মোহন এল সোহন বেশে, কুয়াশাভার গেল ভেসে—
এল তোমার সাধনধন উদার আশ্বাসে॥
অরণ্যে তোর সুর ছিল না, বাতাস হিমে ভরা—
জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কানন, পুষ্পবিহীন ধরা।
এবার জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটে অবসাদের বাঁধন টুটে—
বুঝি এল তোমার পথের সাথি উতল উচ্ছ্বাসে॥

৬৭

ওরে বকুল পারুল, ওরে শালপিয়ালের বন,
কোন্‌খানে আজ পাই আমার মনের মতন ঠাঁই।
যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন,
দিয়ে আমার সকল মন॥
সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে
তোদের মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ,
নেই একটি বিরল ক্ষণ
যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন,
দিয়ে আমার সকল মন॥
ওরে বকুল পারুল, ওরে শালপিয়ালের বন,
আকাশ নিবিড় করে তোরা দাঁড়াস নে ভিড় করে
আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন গন্ধ রঙের
বিপুল আয়োজন। আমি চাই নে।

অকূল অবকাশে যেথায় স্বপ্নকমল ভাসে
এমন দে আমারে একটি আমার গগন-জোড়া কোণ,
আমার একটি অসীম কোণ
যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন—
দিয়ে আমার সকল মন ॥

৬৮

হিয়ামাঝে গোপনে হেরিয়ে তোমারে
ক্ষণে ক্ষণে পুলক যে কাঁপে কিশলয়ে,
কুসুমে কুসুমে ব্যথা লাগে ॥

৬৯

যেন কোন্ ভুলের ঘোরে চাঁদ চলে যায় সরে সরে।
পাড়ি দেয় কালো নদী, আয় রজনী, দেখবি যদি—
কেমনে তুই রাখবি ধ'রে, দূরের বাঁশি ডাকল ওরে।
প্রহরগুলি বিলিয়ে দিয়ে সর্বনাশের সাধন কী এ।
মগ্ন হয়ে রইবে বসে মরণ-ফুলের মধুকোষে—
নতুন হয়ে আবার তোরে মিলবে বুঝি সুধায় ভ'রে ॥

৭০

অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে দিনের বিদায়ক্ষণে
গেয়ো না, গেয়ো না চঞ্চল গান ক্লান্ত এ সমীরণে ॥
ঘন বকুলের ম্লান বীথিকায়
শীর্ণ যে ফুল ঝ'রে ঝ'রে যায়
তাই দিয়ে হার কেন গাঁথ হায়, লাজ বাসি তাই মনে।
চেয়ো না, চেয়ো না মোর দীনতায় হেলায় নয়নকোণে ॥
এসো এসো কাল রজনীর অবসানে প্রভাত-আলোর দ্বারে।
যেয়ো না, যেয়ো না অকালে হানিয়া সকালের কলিকারে।

এসো এসো যদি কভু সুসময়
নিয়ে আসে তার ভরা সঞ্চয়,
চিরনবীনের যদি ঘটে জয়— সাজি ভরা হয় ধনে।
নিয়ো না, নিয়ো না মোর পরিচয়
এ ছায়ার আবরণে ॥

৭১

তুমি তো সেই যাবেই চ'লে, কিছু তো না রবে বাকি—
আমায় ব্যথা দিয়ে গেলে জেগে রবে সেই কথা কি ॥
তুমি পথিক আপন-মনে
এলে আমার কুসুমবনে,
চরণপাতে যা দাও দ'লে সে-সব আমি দেব ঢাকি ॥
বেলা যাবে আঁধার হবে, একা ব'সে হৃদয় ভ'রে
আমার বেদনখানি আমি রেখে দেব মধুর ক'রে।
বিদায়-বাঁশির করুণ রবে
সাঁঝের গগন মগন হবে,
চোখের জলে দুখের শোভা নবীন ক'রে দেব রাখি ॥

৭২

আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধ'রে—
ওগো সাকী, দেবে না কি পেয়ালা মোর ভ'রে ভ'রে ॥
রসের ধারা সুধায় ছাঁকা, মৃগনাভির আভাস মাখা গো,
বাতাস বেয়ে সুবাস তারি দূরের থেকে মাতায় মোরে ॥
মুখ তুলে চাও ওগো প্রিয়ে— তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে
এক রজনীর মতো এবার দাও-না আমায় অমর ক'রে।
নন্দননিকুঞ্জশাখে অনেক কুসুম ফুটে থাকে গো,
এমন মোহন রূপ দেখি নাই, গন্ধ এমন কোথায় ওরে ॥

৭৩

কালো মেঘের ঘটা ঘনায় রে আঁধার গগনে,
ঝরে ধারা ঝরোঝরো গহন বনে।
এত দিনে বাঁধন টুটে কুঁড়ি তোমার উঠল ফুটে
বাদল-বেলার বরিষনে।
ওগো, এবার তুমি জাগো জাগো—
যেন এই বেলাটি হারায় না গো।
অশ্রুভরা কোন্ বাতাসে গন্ধে যে তার ব্যথা আসে—
আর কি গো সে রয় গোপনে॥

৭৪

ওগো জলের রানী,
ঢেউ দিয়ো না, দিয়ো না ঢেউ দিয়ো না গো—
আমি যে ভয় মানি।
কখন্ তুমি শান্তগভীর, কখন্ টলোমলো—
কখন্ আঁখি অধীর হাস্যমদির, কখন্ ছলোছলো—
কিছুই নাহি জানি।
যাও কোথা যাও, কোথা যাও যে চঞ্চলি।
লও গো ব্যাকুল বকুলবনের মুকুল-অঞ্জলি।
দখিন-হাওয়ায় বনে বনে জাগল মরোমরো—
বুকের 'পরে পুলক-ভরে কাঁপুক থরোথরো
সুনীল আঁচলখানি।
হাওয়ার দুলালী,
নাচের তালে তালে শ্যামল কূলের মন ভুলালি!
ওগো অরুণ-আলোর মানিক-মালা দোলাব ওই স্রোতে,
দেব হাতে গোপন রাতে আঁধার গগন হতে
তারার ছায়া আনি॥

৭৫

সন্ন্যাসী,
ধ্যানে নিমগ্ন নগ্ন তোমার চিত্ত।
বাহিরে যে তব লীন হল সব বিত্ত॥
রসহীন তরু, নিষ্ঠুর মরু,
বাতাসে বাজিছে রুদ্র ডমরু,
ধরা-ভাণ্ডার রিক্ত॥
জাগো তপস্বী, বাহিরে নয়ন মেলো হে। জাগো!
স্থলে জলে ফুলে ফলে পল্লবে
চপল চরণ ফেলো হে। জাগো!
জাগো গানে গানে নব নব তানে,
জাগাও উদাস হতাশ পরানে
উদার তোমার নৃত্য॥ জাগাও॥

৭৬

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি॥
ছিল তো শেফালিকা তোমারি-লিপি-লিখা,
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি॥
কাশের শিখা যত কাঁপিছে থরথরি,
মলিন মালতী যে পড়িছে ঝরি ঝরি।
তোমার যে আলোকে অমৃত দিত চোখে
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি॥

৭৭

গন্ধ রেখার পন্থে তোমার শূন্যে গতি,
লেখন রে মোর, ছন্দ-ডানার প্রজাপতি—

স্বপ্নবনের ছায়ায় আলোয় বেড়াস্ দুলি
পরান-কণার বিন্দুসুরার নেশার ঘোরে ॥
চৈত্র-হাওয়ায় যে চঞ্চলের ক্ষণিক বাসা
পাতায় পাতায় করিস প্রচার তাহার ভাষা—
অপ্সরীদের দোলের দিনের আবির-ধুলি
কৌতুকে ভোর পাঠায় কে তোর পাথায় ভ'রে ॥
তোর মাঝে মন কীর্তি আপন নিক্কাতরেই করল হেলা।
তার সে চিকন রঙের লিখন ক্ষণেকতরেই খেয়াল খেলা।
সুর বাঁধে আর সুর সে হারায় দণ্ডে পলে,
গান বহে যায় লুপ্ত সুরের ছায়ার তলে,
পশ্চাতে আর চায় না তাহার চপল তুলি—
রয় না বাঁধা আপন ছবির রাখীর ডোরে ॥

৭৮

এবার বুঝি ভোলার বেলা হল—
ক্ষতি কী তাহে যদি বা তুমি ভোলো ॥
যাবার রাতি ভরিল গানে
সেই কথাটি রহিল প্রাণে,
ক্ষণেক-তরে আমার পানে
করুণ আঁখি তোলো ॥
সন্ধ্যাতারা এমনি ভরা সাঁঝে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশমাঝে।
এই-যে সুর বাজে বীণাতে
যেখানে যাব রহিবে সাথে,
আজিকে তবে আপন হাতে
বিদায়দ্বার খোলো ॥

৭৯

কী ধ্বনি বাজে
গহনচেতনামাঝে!
কী আনন্দে উচ্ছ্বসিল
মম তনুবীণা গহনচেতনামাঝে।
মনপ্রাণহরা সুধা-ঝরা
পরশে ভাবনা উদাসীনা॥

৮০

ওরা অকারণে চঞ্চল
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে নবপল্লবদল॥
বাতাসে বাতাসে প্রাণভরা বাণী শুনিতে পেয়েছে কখন কী জানি,
মর্মরতানে দিকে দিকে আনে কৈশোরকোলাহল॥
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি,
বনে বনে জানাজানি।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছলধার ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল॥

৮১

আয় তোরা আয় আয় গো—
গাবার বেলা যায় পাছে তোর যায় গো।
শিশিরকণা ঘাসে ঘাসে শুকিয়ে আসে,
নীড়ের পাখি নীল আকাশে চায় গো।
সুর দিয়ে যে সুর ধরা যায়, গান দিয়ে পাই গান,
প্রাণ দিয়ে পাই প্রাণ— তোর আপন বাঁশি আন্,
তবেই যে তুই শুনতে পাবি কে বাঁশি বাজায় গো।
শুকনো দিনের তাপ তোর বসন্তকে দেয় না যেন শাপ।
ব্যর্থ কাজে মগ্ন হয়ে লগ্ন যদি যায় গো ব'য়ে
গান-হারানো হাওয়া তখন করবে যে 'হায় হায়' গো॥

৮২

ও জলের রানী,

ঘাটে বাঁধা একশো ডিঙি— জোয়ার আসে ধেয়ে,

বাতাস ওঠে দখিন-মুখে। ও জলের রানী,

ও তোর ঢেউয়ের নাচন নেচে দে—

ঢেউগুলো সব লুটিয়ে পড়ুক বাঁশির সুরে কালো-ফণী ॥

৮৩

ভয় নেই রে তোদের নেই রে ভয়,

যা চলে সব অভয়-মনে— আকাশে ওই উঠেছে শুকতারা।

দখিন হাওয়ায় পাল তুলে দে, পাল তুলে দে—

সেই হাওয়াতে উড়ছে আমার মন।

ওই শুকতারাতে রেখে দিলেম দৃষ্টি আমার—

ভয় কিছু নেই, ভয় কিছু নেই ॥

৮৪

ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলি নি,

কোন্ দেশে যে চলে গেছে সে চঞ্চলিনী।

সঙ্গী ছিল কুকুর কালু, বেশ ছিল তার আলুথালু

আপনা-'পরে অনাদরে ধুলায় মলিনী ॥

হুটোপাটি ঝগড়াঝাঁটি ছিল নিষ্কারণেই।

দিঘির জলে গাছের ডালে গতি ক্ষণে-ক্ষণেই।

পাগলামি তার কানায় কানায় খেয়াল দিয়ে খেলা বানায়,

উচ্চহাসে কলভাষে কল'কলিনী ॥

দেখা হলে যখন-তখন বিনা অপরাধে

মুখভঙ্গী করত আমায় অপমানের ছাঁদে।

শাসন করতে যেমন ছুটি হঠাৎ দেখি ধুলায় লুটি

কাজল আঁখি চোখের জলে ছল'ছলিনী ॥

আমার সঙ্গে পঞ্চাশ বার জন্মশোধের আড়ি,
কথায় কথায় নিত্যকালের মতন ছাড়াছাড়ি।
ডাকলে তারে 'পুঁটুলি' ব'লে সাড়া দিত মর্জি হলে,
ঝগড়া-দিনের নাম ছিল তার স্বর্ণনলিনী॥

৮৫

মনে হল পেরিয়ে এলেম অসীম পথ আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধাশ্যামল পারে।
পথ হতে গেঁথে এনেছি সিক্তযূথীর মালা,
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ ঢালা—
লজ্জা দিয়ো না তারে।
সজল মেঘের ছায়া ঘনায় বনে বনে,
পথহারার বেদন বাজে সমীরণে।
দূরের থেকে দেখেছিলেম বাতায়নের তলে
তোমার প্রদীপ জ্বলে—
আমার আঁখি ব্যাকুল পাখি ঝড়ের অন্ধকারে॥

৮৬

জানি জানি এসেছ এ পথে মনের ভুলে।
তাই হোক তবে তাই হোক— এসো তুমি, দিনু দ্বার খুলে॥
এসেছ তুমি যে বিনা আভরণে, মুখর নূপুর বাজে না চরণে—
তাই হোক ওগো, তাই হোক।
মোর আঙিনায় মালতী ঝরিয়া পড়ে যায়—
তব শিথিল কবরীতে নিয়ো নিয়ো তুলে॥
কোনো আয়োজন নাই একেবারে, সুর বাঁধা হয় নি যে বীণার তারে—
তাই হোক ওগো, তাই হোক।
ঝরো ঝরো বারি ঝরে বনমাঝে আমারই মনের সুর ওই বাজে—
বেণুশাখা-আন্দোলনে আমারই উতলা মন দুলে॥

৮৭

কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো
ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা।
আজি এ নিবিড়তিমির যামিনী বিদ্যুতসচকিতা॥
বাদল-বাতাস ব্যেপে হৃদয় উঠিছে কেঁপে
ওগো সে কি তুমি জানো।
উৎসুক এই দুখজাগরণ এ কি হবে হায় বৃথা॥
ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা,
আমার ভবনদ্বারে রোপণ করিলে যারে
সজল হাওয়ার করুণ পরশে সে মালতী বিকশিতা।
ওগো সে কি তুমি জানো।
তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি ওগো সে কি জানো—
সেই-যে তোমার বীণা সে কি বিস্মৃতা॥

৮৮

আমার কী বেদনা সে কি জানো
ওগো মিতা, সুদূরের মিতা।
বর্ষণনিবিড় তিমিরে যামিনী বিজুলি-সচকিতা॥
বাদল-বাতাস ব্যেপে আমার হৃদয় উঠিছে কেঁপে—
সে কি জানো তুমি জানো।
উৎসুক এই দুখজাগরণ এ কি হবে বৃথা।
ওগো মিতা, সুদূরের মিতা,
আমার ভবনদ্বারে রোপিলে যারে
সেই মালতী আজি বিকশিতা— সে কি জানো।
যারে তুমিই দিয়েছ বাঁধি
আমার কোলে সে উঠিছে কাঁদি— সে কি জানো তুমি জানো।
সেই তোমার বীণা বিস্মৃতা॥

৮৯

চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে
ডাকব না, ফিরে ডাকব না—
ডাকি নে তো সকালবেলার শুকতারাকে।
হঠাৎ ঘুমের মাঝখানে কি
বাজবে মনে স্বপন দেখি
'হয়তো ফেলে এলেম কাকে'—
আপনি চলে আসবি তখন আপন ডাকে॥

৯০

আমরা ঝ'রে-পড়া ফুলদল ছেড়ে এসেছি ছায়া-করা বনতল-
ভুলায়ে নিয়ে এল মায়াবী সমীরণে।
মাধবীবল্লরী করুণ কল্লোলে
পিছন-পানে ডাকে কেন ক্ষণে ক্ষণে।
মেঘের ছায়া ভেসে চলে চির-উদাসী স্রোতের জলে—
দিশাহারা পথিক তারা
মিলায় অকূল বিস্মরণে॥

৯১

উদাসিনী সে বিদেশিনী কে নাই বা তারে জানি
মনে জাগে নব নব রাগে তারি মরীচিকা-ছবিখানি॥
পুবের হাওয়ায় তরীখানি তার
ভাঙা এ ঘাট কবে হল পার,
রঙিন মেঘে আর রঙিন পালে তার করে গেল কানাকানি॥
একা আলসে গণি বসে পলাতকা যত ঢেউ।
যায় তারা যায়, ফেরে না, চায় না পিছু-পানে আর কেউ।
জানি তার নাগাল পাব না, আমার ভাবনা
শূন্যে শূন্যে কুড়ায়ে বেড়ায় বাদলের বাণী॥

৯২

বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে
দিবারাতি ঢেউয়ের মতো চিত্ত বাহু হানে,
মন্দ্রধ্বনি জেগে ওঠে উল্লোল তুফানে।
রাগরাগিণী উঠে আবর্তিয়া তরঙ্গে নর্তিয়া
গহন হতে উচ্ছলিত স্রোতে।
ভৈরবী রামকেলি পূরবী কেদারা উচ্ছুসি যায় খেলি,
ফেনিয়ে ওঠে জয়জয়ন্তী বাগেশ্রী কানাড়া গানে গানে।
তোমায় আমায় ভেসে
গানের বেগে যাব নিরুদ্দেশে।
তালী-তমালী-বনরাজি-নীলা বেলাভূমিতলে ছন্দের লীলা—
যাত্রাপথে পালের হাওয়ায় হাওয়ায়
তালে তালে তানে তানে॥

ভাদ্র ১৩৪৬]

৯৩

রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা—
মন যে কেমন করে, হল দিশাহারা।
যেন কে গিয়েছে ডেকে,
রজনীতে সে কে দ্বারে দিল নাড়া—
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা॥
বঁধু দয়া করো, আলোখানি ধরো হৃদয়ে।
আধো-জাগরিত তন্দ্রার ঘোরে আঁখি জলে যায় যে ভ'রে।
স্বপনের তলে ছায়াখানি দেখে মনে মনে ভাবি এসেছিল সে কে—
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা॥

ভাদ্র ১৩৪৬]

৯৪

আজি কোন্ সুরে বাঁধিব দিন-অবসান-বেলারে
দীর্ঘ ধূসর অবকাশে সঙ্গীজনবিহীন শূন্য ভবনে।—

সে কি মূক বিরহস্মৃতিগুঞ্জরণে তন্দ্রাহারা ঝিল্লিরবে।
সে কি বিচ্ছেদরজনীর যাত্রী বিহঙ্গের পক্ষধ্বনিতে।
সে কি অবগুন্ঠিত প্রেমের কুন্ঠিত বেদনায় সম্বৃত দীর্ঘশ্বাসে।
সে কি উদ্ধত অভিমানে উদ্যত উপেক্ষায় গর্বিত মঞ্জীরঝঙ্কারে॥

চৈত্র ১৩৪৬]

৯৫

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে।
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে—
দিই নি তাহারে আসন।
বিদায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে।
সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন
নিশীথতিমিরে বিলীন—
দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা॥

২৮. ১২. ১৩৪৬

৯৬

নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে।
দুয়ারে মম স্বপ্নের ধন-সম এ যে দেখি—
তব কণ্ঠের মালা এ কি গেছ ফেলে।
জাগালে না শিয়রে দীপ জ্বেলে—
এলে ধীরে ধীরে নিদ্রার তীরে তীরে,
চামেলির ইঙ্গিত আসে যে বাতাসে লজ্জিত গন্ধ মেলে॥
বিদায়ের যাত্রাকালে পুষ্প-ঝরা বকুলের ডালে
দক্ষিণপবনের প্রাণে
রেখে গেলে বল নি যে কথা কানে কানে—
বিরহবারতা অরুণ-আভার আভাসে রাঙায়ে গেলে॥

চৈত্র ১৩৪৬

৯৭

এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন, এসো এসো।
আনো আনো তব মল্লারমন্দ্রিত বীন॥
বীণা বাজুক রমকি ঝমকি,
বিজুলির অঙ্গুলি নাচুক চমকি চমকি চমকি।
নবনীপকুঞ্জনিভৃতে কিশলয়মর্মরগীতে—
মঞ্জীর বাজুক রিন্‌-রিন্‌ রিন্‌-রিন্‌॥
নৃত্যতরঙ্গিত তটিনী বর্ষণনন্দিত নটিনী— আনন্দিত নটিনী,
চলো চলো কূল উচ্ছলিয়া কলো-কলো-কলো কল্লোলিয়া।
তীরে তীরে বাজুক অন্ধকারে ঝিল্লির ঝঙ্কার ঝিন্‌-ঝিন্‌-ঝিন্‌-ইন্‌॥

১৬. ৫. ১৩৪৭

৯৮

শ্রাবণের বারিধারা ঝরিছে বিরামহারা।
বিজন শূন্য-পানে চেয়ে থাকি একাকী।
দূর দিবসের তটে মনের আঁধার পটে
অতীতের অলিখিত লিপিখানি লেখা কি।
বিদ্যুৎ মেঘে মেঘে গোপন বহ্নিবেগে
বহি আনে বিস্মৃত বেদনার রেখা কি।
যে ফিরে মালতীবনে, সুরভিত সমীরণে
অস্তসাগরতীরে পাব তার দেখা কি॥

২০. ৫. ১৩৪৭

৯৯

যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল আমার মনে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা মিলায় ধীরে।
একা বসে আছি হেথায় যাতায়াতের পথের তীরে,
আজকে তারা এল আমার স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে।
সুরহারা সব ব্যথা যত একতারা তার খুঁজে ফিরে।

প্রহর-পরে প্রহর যে যায়, বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালার ধ্বনি অন্ধকারের শিরে শিরে ॥

৩. ১১. ১৯৪০

১০০

পাখি, তোর সুর ভুলিস নে—
আমার প্রভাত হবে বৃথা জানিস কি তা।
অরুণ-আলোর করুণ পরশ গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই যে সুর জাগে—
তুই ভোরের আলোর মিতা জানিস কি তা।
আমার জাগরণের মাঝে
রাগিণী তোর মধুর বাজে জানিস কি তা।
আমার রাতের স্বপনতলে প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা
জানিস কি তা ॥

১২. ১৯৪০]

১০১

আমার হারিয়ে-যাওয়া দিন
আর কি খুঁজে পাব তারে
বাদল-দিনের আকাশ-পারে—
ছায়ায় হল লীন।
কোন্ করুণ মুখের ছবি
পুবেন হাওয়ায় মেলে দিল
সজল ভৈরবী।
এই গহন বনচ্ছায়
অনেক কালের স্তব্ধবাণী
কাহার অপেক্ষায়
আছে বচনহীন ॥

১২. ১৯৪০]

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

সকলে। মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।
দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।
তৃতীয়া। মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে।
প্রথমা। দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে
আধো তানে ভাঙা গানে
ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।
তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।
প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান—
দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে—
ওগো যাও, কোথা যাও।
সুখে ঢলোঢলো বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী,
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপুরী-পানে ধাও—
কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও॥

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত—
নবীন বাসনা-ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।
সুখ-ভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়.
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে—
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত॥

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
মনের মতো কারে খুঁজে মরো—
সে কি আছে ভুবনে।
সে-যে রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
তোমার আপনার যেজন, দেখিলে না তারে?
তুমি যাবে কার দ্বারে।

যারে চাবে তারে পাবে না, যে মন
তোমার আছে যাবে তা'ও ॥

[প্রস্থান]

শান্তার প্রতি

অমর। যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে,
তেমনি আমিও, সখী, যাব—
না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে,
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত—
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত ॥

প্রস্থান

নেপথ্যে চাহিয়া

শান্তা। আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও
যাও সুখের সন্ধানে যাও—
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর-কারে ভালোবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও—
আমি যত দুখ পাই গো ॥

তৃতীয় দৃশ্য

কানন

প্রমদার সখীগণ

প্রথমা। সখী, সে গেল কোথায়। তারে ডেকে নিয়ে আয়।
সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।
প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়।
দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে।
সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুলতায়॥

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে সাধের বকুলফুলহার—
আধোফুট জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে, কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো, চঞ্চল কুন্তল কপোলে পড়িছে বারে-বার॥
প্রথমা। আজি এত শোভা কেন। আনন্দে বিবশা যেন—
দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে, লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে
প্রথমা। সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা—
তরুণ তনু এত রূপরাশি বহিতে পারে না বুঝি আর॥
দ্বিতীয়া। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
কোরো না হেলা হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা—
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি।

মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে—
হেসে চলে যায় জোয়ার-জলে ভাসিয়ে ভেলা।
দুর্লভধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি।
ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা হে গরবিনী।
বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায় কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণ ফেলা হে গরবিনী॥

তৃতীয়া। সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা
এ কি আর ভালো লাগে।
আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস প্রাণে কেন নাহি জাগে।
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন—
মধুর হুতাশে মধুর দহন নিতিনব অনুরাগে।
তরল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে ভাসি,
সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে—
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণ রাগে॥

প্রমদা। ওলো, রেখে দে সখী, রেখে দে— মিছে কথা ভালোবাসা।
সুখের বেদনা, সোহাগযাতনা— বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,
'লহো লহো' ব'লে পরে আরাধন— পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা—
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা॥

অমরের প্রবেশ

প্রমদার প্রতি

অমর। যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে।
দাঁড়াও, চরণদুটি বাড়াও হৃদয়-আসনে।
তুমি রঙিন মেঘমালা যেন ফাগুনসমীরে।

প্রমদা। কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই—
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

অমর। তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে—
তুমি গঠিত স্বপনে।
মোরে রেখো না, রেখো না
তব চঞ্চল লীলা হতে রেখো না বাহিরে।

প্রমদা। কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে—
আমি শুধু বহে চলে যাই।
পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হাহুতাশ—
চকিতে শুনিতে শুধু পাই— চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

[অমরের প্রস্থান]

অশোকের প্রবেশ

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি—
যারে ভালোবেসেছি।
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে—
রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে।

নাহয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি ॥

প্রমদা। ওকে বলো সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল।
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল।
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা—
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল।

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল—
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—
ফিরে যাই এই বেলা চলো সখী, চলো ॥

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

[অমর শান্তা ও সখী]

শান্তা। তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো—
বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা।
কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়—
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান।

সখী। সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না— শুধু সুখ চলে যায়।

শান্তা। এত ব্যথা-ভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হ'ত প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান—
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে—
তবু তার সংশয় হত অবসান ॥

[প্রস্থান]

অমর। আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে।

সখী। অবোধ মন লয়ে ফেরো ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহারবে।
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো—
কেন গো নিতে চাও মন তবে।

অমর। স্বপনসম সব জেনেছি মনে—
'তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে,
যেজন ফিরিতেছে আপন আশে
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।'

সখী। নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।
তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে থাক্ সে আপনার গরবে।

অমর। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

সখী। 'মন দিয়ে মন পেতে চাহি'— ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা।

অমর। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।

সখী। ওগো কেন, ওগো কেন মিছে এ পিপাসা।
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে—
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ।

অমর। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়—
একি ঘোর প্রেম অন্ধরাহুপ্রায় জীবন যৌবন গ্রাসে।

সখী। তবে কেন, তবে কেন মিছে এ কুয়াশা॥

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

প্রমদা। সুখে আছি, সুখে আছি, সখা, আপন-মনে।
প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না—
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।
প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো—
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়।
এই মাধুরীধারা বহিছে আপনি,
কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা।
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ
আপনারে সঁপিয়াছি॥
অমর। ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলি নে ছলনাতে।
অমর। মন দাও দাও, দাও সখী, দাও পরের হাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
অমর। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো!
আনো সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়নপাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
অমর। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
সুখ পায় তায় সে।
চির-কলিকাজনম কে করে বহন চির শিশিররাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে॥

প্রস্থান

[পুনঃপ্রবেশ]

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে, কেন আসে না কাছে।
যা তোরা যা সখী, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

সখীগণ। ছি ওলো ছি, হল কী, ওলো সখী।

প্রথমা। লাজবাঁধ কে ভাঙিল। এত দিনে শরম টুটিল!

তৃতীয়া। কেমনে যাব। কী শুধাব।

প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।

প্রমদা। যা তোরা যা সখী, যা শুধা গে—
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে॥

অমরের প্রতি

সখীগণ। ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও—
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর।

অমর। আমি কী যেন করেছি পান, কোন্ মদিরারস-ভোর।
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।

সখীগণ। ছি ছি ছি।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।
এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি কেহ ভোলা-মন,
কেহ সচেতন কেহ অচেতন,
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ কাহারো নয়নে লোর—
আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর।

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায় হেথা দাঁড়ায়ে তরুছায়।

অমর। অবশ হৃদয়ভারে চরণ চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

সখীগণ। ছি ছি ছি।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।
এ ভবে কেহ পড়ে থাকে কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন কাহারো   চরণে পড়েছে ডোর—
কাহারো   নয়নে লেগেছে ঘোর ॥

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না— চলে আয়, চলে আয়।
ও   কী কথা-যে বলে সখী,   কী চোখে যে চায়।
চলে আয়, চলে আয়।
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে   মিছে কাজে।
ধরা দিবে না যে, বলো, কে পারে তায়।
আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে আয়, চলে আয় ॥

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

প্রমদা সখীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার। সখী, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব।

সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি   মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব।

সখীগণ। দেয় যদি কাঁটা?

কুমার। তাও সহিব।

সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি   মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

কুমার। যদি একবার চাও, সখী, মধুর নয়ানে
ওই আঁখিসুধাপানে চিরজীবন মাতি রহিব।

কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব।

সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি   মনে মনে চাহ প্রাণ মন ॥

প্রমদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—
এ-যে হৃদয়দহন জ্বালা সখী।
এ-যে প্রাণ-ভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা—
এ-যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা।
কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে—
'যাই যাই' করে প্রাণ, যেতে পারি নে।
যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি—
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা!
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা॥

প্রথমা সখী। সেজন কে, সখী, বোঝা গেছে
আমাদের সখী যারে মন প্রাণ সঁপেছে।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে।

প্রথমা। ওই-যে তরুতলে, বিনোদমালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—
ও কি কাছে আসিবে কভু। কথা কবে?

তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে। ও কি বাঁধন মানে।
ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে।

দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি-পানে চায়,
যেন কী পথ ভুলে এল কোথায় ওগো।

তৃতীয়া। যেন কী গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভ'রে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে॥

প্রমদা। সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।
যদি শুধায় কে দিল কোন্ ফুলকাননে—
মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে॥

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে!

প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে!

দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে।
তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে ॥

নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

অমর। সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে
সে কি ফিরাতে পারে সখী!
সংসারবাহিরে থাকি, জানি নে কী ঘটে সংসারে।
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কি না-পায়— জানি নে।
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা-হৃদয়-দ্বারে।
তোমার সকলই ভালোবাসি— ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারই—
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে ॥
সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা।
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না।
প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন—
হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন।
তুমি কেন ফেলো শ্বাস, তুমি কেন হাসো না।
সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা—
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা।
দ্বিতীয়া। আপন দুখ আপন ছায়া লয়ে যাও।
প্রথমা। জীবনের আনন্দ-পথ ছেড়ে দাঁড়াও।
তৃতীয়া। দূর হতে করো পূজা হৃদয়কমল-আসনা ॥
অমর। তবে সুখে থাকো, সুখে থাকো। আমি যাই— যাই।
প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না সখী!
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।

অমর। ছিলাম একেলা আপন ভুবনে— এসেছি এ কোথায়।
হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই।
যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই।

প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে। মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই।

সখীগণ। অধীরা হোয়ো না সখী!
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে॥

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

অমর ও শান্তা

অমর। আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।
বিশ্ববীণার রাগিণী যায় থামি যে।
গৃহহারা হৃদয় যায় আলোহারা পথে হায়—
গহন তিমিরগুহাতলে যাই নামি যে।
তোমারই নয়নে সন্ধ্যাতারার আলো,
আমার পথের অন্ধকারে জ্বালো জ্বালো।
মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে।
দিন-অবসানে তোমারই হৃদয়ে
শ্রান্ত পান্থ অমৃততীর্থগামী যে॥

শান্তা। ভুল কোরো না গো, ভুল কোরো না, ভুল
কোরো না ভালোবাসায়।
ভুলায়ো না, ভুলায়ো না, ভুলায়ো না নিষ্ফল আশায়।
বিচ্ছেদদুঃখ নিয়ে আমি থাকি, দেয় না সে ফাঁকি—
পরিচিত আমি তার ভাষায়।

দয়ার ছলে তুমি হোয়ো না নিদয়।
হৃদয় দিতে চেয়ে ভেঙো না হৃদয়।
রেখো না লুব্ধ করে— মরণের বাঁশিতে মুগ্ধ করে
টেনে নিয়ে যেয়ো না সর্বনাশায়॥

অমর। ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।
জেগেছি, জেনেছি— আর ভুল নয়, ভুল নয়।
মায়ার পিছে পিছে
ফিরেছি, জেনেছি স্বপন সবই মিছে—
বিঁধেছে কাঁটা প্রাণে— এ তো ফুল নয়, ফুল নয়।
ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন— হেলা করিব না।
তব হৃদয়ে, সখী, আশ্রয় মাগি।
অতল সাগর সংসারে— এ তো কূল নয়, কূল নয়॥

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

দূর হইতে

সখীগণ। অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে—
তবে তো ফুল বিকাশে।

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না— মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে।

দ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয়রতন-আশে॥

সকলে। ফিরে এসো ফিরে এসো— বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে॥

অমর। ডেকো না আমারে ডেকো না— ডেকো না।
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না।
আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি,
মূল্য নাহি চাই যে ভালো বেসেছি।

কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না।
আমার দুঃখ-জোয়ারের জলস্রোতে।
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।
দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে—
অবহেলা তব ছলনা দিয়ে ঢেকো না॥

অমরের প্রতি

শান্তা। না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।
ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্যপথপানে—
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরান জ্বলে।
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা, দেখ নি ফিরে—
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে॥

অমর। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি—
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে।
শুভখনে কাছে ডাকিলে, লজ্জা আমার ঢাকিলে গো—
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে।
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে—
এ নিরন্তর সংশয়ে আর পারি নে যুঝিতে।
তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে॥

প্রস্থান

[শান্তা] হায় হতভাগিনী,
স্রোতে বৃথা গেল ভেসে, কূলে তরী লাগে নি, লাগে নি।
কাটালি বেলা বীণাতে সুর বেঁধে—
কঠিন টানে উঠল কেঁদে,
ছিন্ন তারে থেমে গেল-যে রাগিণী।

এই পথের ধারে এসে ডেকে গেছে তোরে সে।
ফিরায়ে দিলি তারে রুদ্ধদ্বারে।—
বুক জ্বলে গেল গো, ক্ষমা তবুও কেন মাগি নি।

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর শান্তা, অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

স্ত্রীগণ। এস' এস', বসন্ত ধরাতলে।
আন' কুহুতান, প্রেমগান।
আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আন' নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ—
প্রফুল্লনবীন বাসনা ধরাতলে।

পুরুষগণ। এস' থর'থর'কম্পিত মর্মরমুখরিত
নব পল্লবপুলকিত
ফুল-আকুল মালতিবল্লিবিতানে—
সুখছায়ে মধুবায়ে এস' এস'।
এস' অরুণচরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে।
এস' জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে কলকল্লোলতটিনীতীরে
সুখসুপ্তসরসীনীরে এস' এস'।

স্ত্রীগণ। এস' যৌবনকাতর হৃদয়ে,
এস' মিলনসুখালস নয়নে,
এস' মধুর শরমমাঝারে— দাও বাহুতে বাহু বাঁধি।
নবীনকুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাঁধন॥

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া॥

পুরুষগণ। ও কি এল, ও কি এল না—
বোঝা গেল না, গেল না।
ও কি মায়া কি স্বপনছায়া— ও কি ছলনা।

অমর। ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে।
গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে।
ও-যে চিরবিরহেরই সাধনা।

শান্তা। ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া—
বুঝি শুধু ও পরম কামনা॥

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া॥

সখীগণ। কোন্ সে ঝড়ের ভুল ঝরিয়ে দিল ফুল,
প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল।
নব প্রভাতের তারা
সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে পথহারা।
অমরাবতীর সুরযুবতীর এ ছিল কানের দুল।
এ যে মুকুটশোভার ধন—
হায় গো দরদী কেহ থাক যদি, শিরে দাও পরশন।
এ কি স্রোতে যাবে ভেসে দূর দয়াহীন দেশে—
জানি নে, কে জানে দিন-অবসানে কোন্‌খানে পাবে কূল॥

শান্তা। ছি ছি, মরি লাজে।
কে সাজালো মোরে মিছে সাজে।
বিধাতার নিষ্ঠুর বিদ্রূপে নিয়ে এল চুপে চুপে
মোরে তোমাদের দুজনের মাঝে।
আমি নাই, আমি নাই—
আদরিণী, লহো তব ঠাঁই যেথা তব আসন বিরাজে॥

শান্তা ও স্ত্রীগণ। শুভমিলনলগনে বাজুক বাঁশি,
মেঘমুক্ত গগনে জাগুক হাসি।

পুরুষগণ। কত দুখে কত দূরে দূরে আঁধারসাগর ঘুরে ঘুরে
সোনার তরী তীরে এল ভাসি।
ওগো পুরবালা, আনো সাজিয়ে বরণডালা।
যুগলমিলনমহোৎসবে শুভ শঙ্খরবে
বসন্তের আনন্দ দাও উচ্ছ্বাসি॥

প্রমদা। আর নহে, আর নহে।
বসন্তবাতাস কেন আর শুষ্ক ফুলে বহে।
লগ্ন গেল বয়ে, সকল আশা লয়ে—
এ কোন্ প্রদীপ জ্বালো! এ-যে বক্ষ আমার দহে।
আমার কানন মরু হল—
আজ এই সন্ধ্যা-অন্ধকারে সেথায় কী ফুল তোলো।
কাহার ভাগ্য হতে বরণমালা হরণ করো—
ভাঙা ডালি ভরো।
মিলনমালার কণ্টকভার কণ্ঠে কি আর সহে॥

অমর। ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,
যা উড়ে, যা উড়ে, যা রে একাকী।
বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাবি আনন্দ—
দিশাহারা মেঘ যে গেল ডাকি।
নির্মল দুঃখে যে সেই তো মুক্তি নির্মল শূন্যের প্রেমে।
আত্মবিড়ম্বন দারুণ লজ্জা, নিঃশেষে যাক সে থেমে।
দুরাশার মরাবাঁচায় এতদিন ছিলি তোর খাঁচায়—
ধূলিতলে যাবি রাখি॥

শান্তা। যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল।
দুঃখের প্রসাদে এল আজি মুক্তির কাল।
এই ভালো ওগো, এই ভালো— বিচ্ছেদবহ্নিশিখার আলো।
নিষ্ঠুর সত্য করুক বরদান— ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল।

যাও প্রিয়, যাও তুমি যাও জয়রথে। বাধা দিব না পথে।
বিদায় নেবার আগে মন তব স্বপ্ন হতে যেন জাগে—
নির্মল হোক হোক সব জঞ্জাল॥

মায়াকুমারী। দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম—
নিত্য সে নিঃসংশয়, গৌরব তার অক্ষয়।
দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস
যেথা জ্বলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায় চিরনৈরাশ,
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয়—
অশ্রু-উৎস-জল-স্নানে তাপস মৃত্যুঞ্জয়॥

প্রস্থান

সকলে। আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়।
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলন-মালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুন-দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে—
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ওই শিখর-চূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন—
সাথে নাচুক তোর মরণ-বাঁচন,
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়॥

পরিশিষ্ট ২

পরিশোধ

নাট্যগীতি

'কথা ও কাহিনী'তে প্রকাশিত 'পরিশোধ' নামক পদ্য-কাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয়-উপলক্ষে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।

১

গৃহদ্বারে পথপার্শ্বে

শ্যামা। এখনো কেন সময় নাহি হল

নাম-না-জানা অতিথি—

আঘাত হানিলে না দুয়ারে,

কহিলে না 'দ্বার খোলো'।

হাজার লোকের মাঝে

রয়েছি একেলা যে,

এসো আমার হঠাৎ-আলো—

পরান চমকি তোলো।

আঁধার-বাধা আমার ঘরে,

জানি না কাঁদি কাহার তরে।

চরণসেবার সাধনা আনো,

সকল দেবার বেদনা আনো,

নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র

কানে কানে বোলো॥

রাজপথে

প্রহরীগণ। রাজার আদেশ ভাই—
চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই।
কোথা তারে পাই?
যারে পাও তারে ধরো,
কোনো ভয় নাই॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

প্রহরী। ধর্ ধর্, ওই চোর, ওই চোর।
বজ্রসেন। নই আমি, নই নই নই চোর।
অন্যায় অপবাদে
আমারে ফেলো না ফাঁদে।
নই আমি নই চোর।
প্রহরী। ওই বটে, ওই চোর, ওই চোর।
বজ্রসেন। এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর।
আমি পরদেশী—
হেথা নেই স্বজন বন্ধু কেহ মোর।
নই চোর, নই আমি নই চোর॥
শ্যামা। আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে।— শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে। বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন আমার আলয়ে
দয়া করি॥
সহচরী। সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে।

আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা।
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে—
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে॥

প্রহরীদের প্রতি

শ্যামা। তোমাদের একি ভ্রান্তি—
কে ওই পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি—
এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে।
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে॥

প্রহরী। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে—
চোর চাই যে ক'রেই হোক।
হোক-না সে যেই-কোনো লোক—
নহিলে মোদের যাবে মান॥

শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ—
দুই দিন মাগিনু সময়।

প্রহরী। রাখিব তোমার অনুনয়।
দুই দিন কারাগারে রবে,
তার পর যা হয় তা হবে॥

বজ্রসেন। এ কী খেলা, হে সুন্দরী, কিসের এ কৌতুক।
কেন দাও অপমানদুখ—
মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কৌতুক॥

শ্যামা। নহে নহে নহে এ কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলঙ্কার
সঁপি দিয়া, শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজদেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে॥

বজ্রসেন। কোন্ অযাচিত আশার আলো
দেখা দিল রে তিমিররাত্রি ভেদি দুর্দিনদুর্যোগে।
কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।
অচেনা নির্মম ভুবনে দেখিনু এ কী সহসা—
কোন্ অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনাহাসি॥

২

কারাঘর

শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন। এ কী আনন্দ!
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতসুগন্ধ।
এলে কারাগারে রজনীর পারে উষাসম,
মুক্তিরূপা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময়ী॥

শ্যামা। বোলো না বোলো না আমি দয়াময়ী।
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা!
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।
আমি দয়াময়ী!
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা॥

বজ্রসেন। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারই হরষে,
জেনো, প্রিয়ে—
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলঙ্ক যাহা আছে
দূর হয় তার কাছে—
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে॥

শ্যামা। হে বিদেশী, এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয়স্বামী,
জীবনে মরণে প্রভু॥

বজ্রসেন। প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে—
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাব না—
পাল তুলে দাও, দাও দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল—
হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল।
পাগল হে নাবিক,
ভুলাও দিগ্‌বিদিক
পাল তুলে দাও, দাও দাও॥

শ্যামা। চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে—
নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর—
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে—
তোমার করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

৩

বজ্রসেন ও শ্যামা তরণীতে

শ্যামা। এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি।
ফুল ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত যে গেল স'রে—
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি।
জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে, ঢেউ উঠেছে দুলে—
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস—
সকল বাতাস সকল আকাশ
ওই পারের ওই বাঁশির সুরে উঠে শিহরি।

বজ্রসেন। কহো কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনী,
তোমারই কাছে আমি কত ঋণে ঋণী॥

শ্যামা। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে॥

ওই রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওরে,
থাক্‌-না পিছন পিছে পড়ে—
পিঠে তারে বইতে গেলে
একলা প'ড়ে রইবি কূলে।
ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে—
তাই যে তোরে বারে বারে

ফিরতে হল গেলি ভুলে।
ডাক্ রে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক—
জীবনখানি উজাড় ক'রে
সঁপে দে তার চরণমূলে॥

বজ্রসেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
জানি যদি, প্রিয়ে, শোধ দিব এ জীবন দিয়ে—
এই মোর পণ॥

শ্যামা। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে॥

তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা—

বালক কিশোর, উত্তীয় তার নাম—
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।
মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ
নিজ'পরে লয়ে সঁপেছে আপন প্রাণ।
এ জীবনে মম, ওগো সর্বোত্তম,
সর্বাধিক মোর এই পাপ
তোমার লাগিয়া॥

বজ্রসেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে।
কোথা তুই লুকাবি মুখ মৃত্যু-আঁধারে॥

শ্যামা। ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো॥

বজ্রসেন। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী,
ধিক্ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী ॥

শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই,
দোষ করি নাই,
দোষী আমি বিধাতার পায়ে ;
তিনি করিবেন রোষ—
সহিব নীরবে।
তুমি যদি না কর দয়া
সবে না, সবে না, সবে না ॥

বজ্রসেন। তবু ছাড়িবি নে মোরে ?

শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না।
তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি করো মর্মাঘাত।
ছাড়িব না ॥

শ্যামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা

নেপথ্যে। হায়, এ কী সমাপন ! অমৃতপাত্র ভাঙিলি,
করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ।
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো হারালো
কলঙ্কে অসম্মানে ॥

৪

পথিকরমণী

সব-কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা।

আপনাতে কেন মিটালো না যত-কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা,
সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা।
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো প্রেমের আনন্দেরে॥

প্রস্থান

বজ্রসেন। ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা
পাপীজনশরণ প্রভু!
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা—
ক্ষমো হে মম দীনতা।
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি।
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো, তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা—
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা॥

এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন, নীরস মম ভুবন—
শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীসুধা দিয়ে॥

নূপুর কুড়াইয়া লইয়া

হায় রে নূপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞ্জনসুর।

নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে
রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া স্মরণ সুমধুর।
তোর ঝঙ্কারহীন ধিক্কারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এসেছি, প্রিয়তম।—
ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম
তব নিঠুর করুণ করে ॥

বজ্রসেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে—
যাও যাও, চলে যাও ॥

শ্যামার প্রণাম ও প্রস্থান

বজ্রসেন। ধিক্ ধিক্ ওরে মুগ্ধ, কেন চাস্ ফিরে ফিরে।
এ যে দূষিত নিষ্ঠুর স্বপ্ন,
এ যে মোহবাষ্পঘন কুজ্ঝটিকা—
দীর্ণ করিবি না কি রে।
অশুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে
নিদারুণ বিষ—
লোভ না রাখিস
প্রেতবাস তোর ভগ্ন মন্দিরে।
নির্মম বিচ্ছেদসাধনায়
পাপক্ষালন হোক—
না কোরো মিথ্যা শোক,
দুঃখের তপস্বী রে—
স্মৃতিশৃঙ্খল করো ছিন্ন—
আয় বাহিরে,
আয় বাহিরে।

নেপথ্যে। কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে
যাও চিরবিরহের সাধনায়।
ফিরো না, ফিরো না— ভুলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তরবিদ্রোহে।
যাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা,
যাক মিলায়ে কামনাকুয়াশা।
স্বপ্ন-আবেশ-বিহীন পথে
যাও বাঁধনহারা,
তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে ব'হে॥

পরিশিষ্ট ৩

এই গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নানা গ্রন্থে মুদ্রিত, অথচ প্রথম সংস্করণ গীত-বিতানে (পরিশিষ্ট খ) যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নয় বলিয়া নির্দিষ্ট তাহারই একাংশ। রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় যে, এ সম্পর্কে অন্য নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত প্রমাণ এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

১

এমন আর কতদিন চলে যাবে রে!
জীবনের ভার বহিব কত! হায় হায়!
যে আশা মনে ছিল, সকলই ফুরাইল—
কিছু হল না জীবনে।
জীবন ফুরায়ে এল। হায় হায়॥

২

ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয় এ ধরা-পানে চাও—
পতিত যে জন করিছে রোদন, পতিতপাবন,
তাহারে উঠাও।
মরণে যে জন করেছে বরণ তাহারে বাঁচাও॥

কত দুখ শোক, কাঁদে কত লোক, নয়ন মুছাও।
ভাঙিয়া আলয় হেরে শূন্যময়। কোথায় আশ্রয়—
তারে ঘরে ডেকে নাও।
প্রেমের তৃষায় হৃদয় শুকায়, দাও প্রেমসুধা দাও॥

হেরো কোথা যায়, কার পানে চায়। নয়নে আঁধার—
নাহি হেরে দিক, আকুল পথিক চাহে চারি ধার।
এ ঘোর গহনে অন্ধ সে নয়নে তোমার কিরণে
আঁধার ঘুচাও।
সঙ্গহারা জনে রাখিয়া চরণে বাসনা পূরাও॥

কলঙ্কের রেখা প্রাণে দেয় দেখা প্রতিদিন হায়।
হৃদয় কঠিন হল দিন দিন, লজ্জা দূরে যায়।
দেহো গো বেদনা, করাও চেতনা! রেখো না, রেখো না-
এ পাপ তাড়াও।
সংসারের রণে পরাজিত জনে নববল দাও॥

৩

নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে বিমলহৃদয়ে,
নির্মল অচল সুমতি রাখো ধরি সতত॥
সংশয়নৃশংস সংসারে প্রশান্ত রহো,
তাঁর শুভ ইচ্ছা স্মরি বিনয়ে রহো বিনত॥
বাসনা করো জয়, দূর করো ক্ষুদ্র ভয়।
প্রাণধন করিয়া পণ চলো কঠিন শ্রেয়পথে,
ভোলো প্রসন্নমুখে স্বার্থসুখ, আত্মদুখ—
প্রেম-আনন্দরসে নিয়ত রহো নিরত॥

৪

মা, আমি তোর কী করেছি।
শুধু তোরে জন্ম ভ'রে মা বলে রে ডেকেছি॥
চিরজীবন পাষাণী রে, ভাসালি আঁখিনীরে—
চিরজীবন দুঃখানলে দহেছি॥
আঁধার দেখে তরাসেতে চাহিলাম তোর কোলে যেতে—
সন্তানেরে কোলে তুলে নিলি নে।
মা-হারা সন্তানের মতো কেঁদে বেড়াই অবিরত—
এ চোখের জল মুছায়ে তো দিলি নে।
ছেলের প্রাণে ব্যথা দিয়ে যদি, মা, তোর জুড়ায় হিয়ে
ভালো ভালো, তাই তবে হোক—
অনেক দুঃখ সয়েছি॥

৫

সকলেরে কাছে ডাকি আনন্দ-আলয়ে থাকি
অমৃত করিছ বিতরণ।
পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান
গগনে করিয়া বিচরণ।
সূর্য শূন্যপথে ধায়— বিশ্রাম সে নাহি চায়,
সঙ্গে ধায় গ্রহপরিজন।
লভিয়া অসীম বল ছুটিছে নক্ষত্রদল,
চারি দিকে চলেছে কিরণ।
পাইয়া অমৃতধারা নব নব গ্রহ তারা
বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ—
জাগে নব নব প্রাণ, চিরজীবনের গান
পূরিতেছে অনন্ত গগন।
পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর
প্রাণের সাগরে সন্তরণ।
জগতে যে দিকে চাই বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রীগণ।
মোরা সবে কীটবৎ, সমুখে অনন্ত পথ
কী করিয়া করিব ভ্রমণ।
অমৃতের কণা তব পাথেয় দিয়েছ, প্রভো,
ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন॥

৬

সখা, তুমি আছ কোথা—
সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা॥
কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,
কত যে সয়েছি আমি তোমারে কব সে কথা॥

যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা,
দেখো আজি তাহে কত পড়েছে কলঙ্করেখা।
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা দাও মুছে—
নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা॥
দেখো দেব, চেয়ে দেখো হৃদয়েতে নাহি বল—
সংসারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল।
লহো সে হৃদয় তুলে, রাখো তব পদমূলে—
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে রহে গো সেথা॥

৭

সখা, মোদের বেঁধে রাখো প্রেমডোরে।
আমাদের ডেকে নিয়ে চরণতলে রাখো ধ'রে—
বাঁধো হে প্রেমডোরে।
কঠোর পরানে কুটিল বয়ানে
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার ক'রে।
আপনার অভিমানে দুয়ার দিয়ে প্রাণে
গরবে আছি বসে চাহি আপনা-পানে।
বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে—
ধূলিতে লুটাইব আপনার পাষাণভারে।
তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে॥

৮

ছি ছি সখা, কী করিলে, কোন্ প্রাণে পরশিলে—
কামিনীকুসুম ছিল বন আলো করিয়া।
মানুষ-পরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই-যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া।
জান তো কামিনী-সতী কোমল কুসুম অতি—
দূর হতে দেখিবার, ছুঁইবার নহে সে।

দূর হতে মৃদু বায় গন্ধ তার দিয়ে যায়,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে।
মধুপের পদক্ষেপে পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হতেছে কত প্রভাতের সমীরে।
পরশিতে রবিকর শুকাইছে কলেবর,
শিশিরের ভরটুকু সহিছে না শরীরে।
হেন কোমলতাময় ফুল কি না ছুঁলে নয়—
হায় রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া।
মানুষ-পরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই-যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া॥

৯

না সজনী, না, আমি জানি জানি, সে আসিবে না।
এমনি কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী, বাসনা তবু পূরিবে না।
জনমেও এ পোড়া ভালে কোনো আশা মিটিল না॥
যদি বা সে আসে, সখী, কী হবে আমার তায়।
সে তো মোরে, সজনী লো, ভালো কভু বাসে না— জানি লো।
ভালো ক'রে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে—
বড়ো আশা করে শেষে পূরিবে না কামনা॥

পরিশিষ্ট ৪

এই-সব গান কোনো রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত গ্রন্থে বা রচনায় নাই। নানা জনের নানা সংগীতসংকলনে বা রচনায় ছড়ানো আছে। পরবর্তী গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

১

ভাসিয়ে দে তরী তবে নীল সাগরোপরি।
বহিছে মৃদুল বায়, নাচিছে মৃদু লহরী॥
ডুবেছে রবির কায়া, আধো আলো, আধো ছায়া-
আমরা দুজনে মিলি যাই চলো ধীরি ধীরি॥
একটি তারার দীপ যেন কনকের টিপ
দূর শৈলভুরুমাঝে রয়েছে উজল করি।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ—
শান্তির ছবিটি যেন কী সুন্দর আহা মরি॥

২

ছিলে কোথা বলো, কত কী যে হল
জান না কি তা? হায় হায়, আহা!
মানদায়ে যায় যায় বাসবের প্রাণ—
এখানে কী কর, তুমি ফুলশর
তারে গিয়ে করো ত্রাণ॥

৩

চলো চলো, চলো চলো, চলো চলো ফুলধনু,
চলো যাই কাজ সাধিতে।
দাও বিদায় রতি গো!
এমন এমন ফুল দিব আনি
পরখিবে মানিনীহৃদয়ে হানি,
মরমে মরমে রমণী অমনি
থাকিবে গো দহিতে॥

৪

এসো গো এসো বনদেবতা, তোমারে আমি ডাকি।
জটার 'পরে বাঁধিয়া লতা বাকলে দেহ ঢাকি
তাপস, তুমি দিবস-রাতি নীরবে আছ বসি—
মাথার 'পরে উঠিছে তারা, উঠিছে রবি শশী।

বহিয়া জটা বরষা-ধারা পড়িছে ঝরি ঝরি,
শীতের বায়ু করিছে হাহা তোমারে ঘিরি ঘিরি।
নামায়ে মাথা আঁধার আসি চরণে নমিতেছে,
তোমার কাছে শিখিয়া জপ নীরবে জপিতেছে।

একটি তারা মারিছে উঁকি আঁধারভুরু-'পর,
জটার মাঝে হারায়ে যায় প্রভাতরবিকর।

পড়িছে পাতা, ফুটিছে ফুল, ফুটিছে পড়িতেছে—
মাথায় মেঘ কত-না ভাব ভাঙিছে গড়িতেছে।
মিলিয়া ছায়া মিলিয়া আলো খেলিছে লুকাচুরি,
আলয় খুঁজে বনের বায়ু ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি।

তোমার তপ ভাঙাতে চাহে ঝটিকা পাগলিনী—
গরজি ঘন ছুটিয়া আসে প্রলয়রব জিনি,
ভ্রূকুটি করি চপলা হানে ধরি অশনিচাপ।
জাগিয়া উঠি নাড়িয়া মাথা তাহারে দাও শাপ।

এসো হে এসো বনদেবতা, অতিথি আমি তব—
আমার যত প্রাণের আশা তোমার কাছে কব।
নমিব তব চরণে, দেব, বসিব পদতলে—
সাহস পেয়ে বনবালারা আসিবে দলে দলে॥

৫

কত ডেকে ডেকে জাগাইছ মোরে,
তবু তো চেতনা নাই গো।
মেলি মেলি আঁখি মেলিতে না পারি,
ঘুম রয়েছে সদাই গো॥
মায়ানিদ্রাবশে আছি অচেতন,
শুয়ে শুয়ে কত দেখি কুস্বপন—
ধন রত্ন দাস বিলাসভবন—
অন্ত নাহি তার পাই গো॥

কল্পনার বলে উঠিয়া আকাশে
ভ্রমি অহরহ মনের উল্লাসে,
ভাবি না কী হবে নিদ্রার বিনাশে—
কোথা আছি কোথা যাই গো।
জানি না গো এ-যে রাক্ষসের পুরী,
জানি না যে হেথা দিনে হয় চুরি,
জানি না বিপদ আছে ভূরি ভূরি—
সুধা ব'লে বিষ খাই গো॥

ভাঙিতে আমার মনের সংশয়
জাগায়ে দিতেছ নিজপরিচয়,
তুমি-যে জনক জননী উভয়
বুঝাইছ সদা তাই গো।
সে কথা আমার কানে নাহি যায়,
ভুলিয়ে রয়েছি রাক্ষসীমায়ায়—
কী হবে, জননী, বলো গো উপায়।
শুধু কৃপাভিক্ষা চাই গো॥

৬

আঁধার সকলই দেখি তোমারে দেখি না যবে।
ছলনা চাতুরী আসে হৃদয়ে বিষাদবাসে
তোমারে দেখি না যবে, তোমারে দেখি না যবে॥
এসো এসো, প্রেমময়, অমৃতহাসিটি লয়ে।
এসো মোর কাছে ধীরে এই হৃদয়নিলয়ে।
ছাড়িব না তোমায় কভু জনমে জনমে আর,
তোমায় রাখিয়া হৃদে যাইব ভবের পার॥

—

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত গীতবিতানের পূর্ববর্তী দুই খণ্ডে যে-সব রচনা আছে, তাহাতে কবির রচিত গানের সংকলন সম্পূর্ণ হয় নাই। অবশিষ্ট সমুদয় গান এবং অখণ্ডিত আকারে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া গেল। অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থে, কিছু রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে, কিছু সাময়িক পত্রাদিতে নিবদ্ধ ছিল।

বর্তমান গ্রন্থ-সংকলন ও সম্পাদনের ভার শ্রীকানাই সামন্তকে দেওয়া হইয়াছিল। এই খণ্ডের পরিকল্পনা হইতে মুদ্রণ অবধি সুদীর্ঘ সময়ে শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার নানা তথ্য ও নানা সন্ধান দিয়া, নানা সংশয়ের নিরসন করিয়া, বহু সাহায্য করিয়াছেন। ফলতঃ প্রত্যেক পদে তাঁহাদের এরূপ অকুণ্ঠিত সাহায্য না পাওয়া গেলে, এই গ্রন্থপ্রকাশের আশু কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

ইহা ছাড়া, শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীপ্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীসুধীরচন্দ্র কর বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া এবং শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশ্বিনী-কুমার দাশগুপ্ত, শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ও শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কয়েকখানি দুর্লভ গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ দিয়া নানা ভাবে সম্পাদনকার্যে আনুকূল্য করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের পাঠাগার হইতে কয়েকখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগ ইহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। বিশেষ বিষয়ে যাঁহার নিকটে বা যে রচনা হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে তাহা জানানো হইল। ইতি

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

আশ্বিন ১৩৫৭

তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণের প্রণয়ন-ব্যাপারে শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীবিশ্বজিৎ রায় ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নানা সময়ে গ্রন্থসম্পাদককে নানারূপ সাহায্য করেন এবং শ্রীশান্তিদেব ঘোষ কয়েকটি প্রশ্নের সদুত্তর জানাইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে বাধিত করিয়াছেন।

শ্রাবণ ১৩৬৩

তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণে (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) 'নাট্যগীতি' বিভাগে ৪টি গান (১০৩-১০৬-সংখ্যক) ও 'প্রেম ও প্রকৃতি' বিভাগে ১টি (৮৯-সংখ্যক) গান রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত বিভিন্ন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে নূতন সংকলন করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত গীতচতুষ্টয় শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমাদের গোচরীভূত।

শ্রাবণ ১৩৬৭

বর্তমান সংস্করণে নূতন যোগ করা হইল— ৮৫৭ পৃষ্ঠার ৭৯-সংখ্যক গান : বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে ইত্যাদি।

২২ শ্রাবণ ১৩৭১

গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের বর্তমান সংস্করণে ভগ্নহৃদয়-ধৃত বা ভগ্নহৃদয় হইতে রূপান্তরিত গানগুলি (পৃ ৭৬৮-৭৫/সংখ্যা ৩-১৯) একত্র দেওয়ায়, অনেক গানের সন্নিবেশে পূর্ব সংস্করণ হইতে বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া, 'মুখের হাসি চাপলে কি হয়' গানটি বর্জিত, এ সম্পর্কে যাহা কিছু তথ্য ৯৭০-অঙ্কিত পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৫ বৈশাখ ১৩৭৬

বর্তমান সংস্করণে যে গানগুলি নূতন যোগ করা হইল তাহাদের সূচনা (প্রথম ছত্র) এরূপ—

আনে জাগরণ মুগ্ধ চোখে	পৃ ১০০১
আমরা কত দল গো কত দল	৯৮৯
উদাসিনী সে বিদেশিনী কে	৯০৮
গন্ধরেখার পন্থে তোমার শূন্যে গতি	৯০২
সন্ন্যাসী, / ধ্যানে নিমগ্ন নগ্ন তোমার চিত্ত	৯০২

প্রত্যেক গান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরবর্তী গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণ-প্রণয়নে শ্রীকানাই সামন্তকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

পৌষ ১৩৭৯

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

গ্রন্থপরিচয়

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন

এই তালিকায় অনুষ্ঠানপত্রাদি ধরা হয় নাই

১ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ১২৯১

২ রবিচ্ছায়া। যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র -কর্তৃক প্রকাশিত। বৈশাখ ১২৯২[১]
'অনেকগুলি গানে রাগ রাগিণীর নাম লেখা নাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসান হয় নাই।...

'এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা— পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুরের অনুসারে লিখিত হয়। অনেকগুলি গানে আমি নিজে সুর বসাইয়াছি, এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের সুরে বসান হয়।'
—রচয়িতার নিবেদন। রবীন্দ্রনাথ

৩ গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা। বৈশাখ ১৮১৫ শক। বাংলা ১৩০০ সাল। সংক্ষেপে 'গানের বহি' রূপে উল্লিখিত।
'১-চিহ্নিত গানগুলি[২] আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত। ২-চিহ্নিত গানের সুর হিন্দুস্থানী হইতে লওয়া। আমার স্বরচিত অথবা প্রচলিত সুরের গানে কোন চিহ্ন দেওয়া হয় নাই।'
—সূচীপত্র-সূচনা। রবীন্দ্রনাথ

৪ কাব্যগ্রন্থাবলী। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত। আশ্বিন ১৩০৩
'গীতিগ্রন্থ ও গীতিনাট্য ব্যতীত এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য পুস্তকে যে সকল গান ... সূচীপত্রে তাহাদিগকে তারা-চিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল।'
—ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ

৫ কাব্যগ্রন্থ। মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত। অষ্টম ভাগ: ১৩১০[৩]

৬ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী। হিতবাদীর উপহার। ১৩১১

৭ বাউল। জাতীয় সংগীতের সংকলন। সেপ্টেম্বর ১৯০৫

৮ গান। যোগীন্দ্রনাথ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত। সেপ্টেম্বর ১৯০৮

৯ গান। ইণ্ডিয়ান প্রেস। ১৯০৯
'কিশোরকালের সকল শ্রেষ্ঠ গান হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত যত গান

রচনা হইয়াছে, সমস্ত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারি নাই।... অনেক গানে এখনো সুর বসানো হয় নাই... বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলার গান গুটিকয়েক বিবিধ সঙ্গীতের মধ্যে দ্বিতীয়বার সন্নিবেশিত [এরূপ অন্য গানও প্রচুর]... এই পুস্তকে সাতশত সাতাশটি গান আছে।'[৪] —প্রকাশকের নিবেদন

১০ গীতাঞ্জলি ॥ শ্রাবণ ১৩১৭

১১ গীতিমাল্য ॥ জুলাই ১৯১৪

১২ গান ॥ সেপ্টেম্বর ১৯১৪

১৩ গীতালি ॥ ১৯১৪

১৪ ধর্ম্মসঙ্গীত ॥ ডিসেম্বর ১৯১৪

১৫ কাব্যগ্রন্থ ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস। প্রথম ভাগ : ১৯১৫। দশম ভাগ : ১৯১৬

১৬ প্রবাহিণী ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৩২

১৭ গীতিচর্চ্চা ॥ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক সম্পাদিত। পৌষ ১৩৩২

'পূজনীয় ৺মহর্ষিদেবের ও পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটি গান, তিনটি বেদগানও এই স্থানে সন্নিবেশিত করা হইল।'[৫]

—প্রকাশকের নিবেদন

১৮ ঋতু-উৎসব ॥ ১৩৩৩। শেষবর্ষণ শারদোৎসব বসন্ত সুন্দর ও ফাল্গুনী এই পাঁচখানি গীতিগ্রন্থ বা গীতপ্রধান গ্রন্থের সংকলন।

১৯ বনবাণী ॥ আশ্বিন ১৩৩৮। ইহার 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' ও পরবর্তী অংশে বহু গান আছে।

২০ গীতবিতান ॥ প্রথম সংস্করণ। প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড : আশ্বিন ১৩৩৮
তৃতীয় খণ্ড : শ্রাবণ ১৩৩৯

২১ গীতবিতান ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড : মাঘ ১৩৪৮

যথাক্রমে ১৩৪৫ ভাদ্রে ও ১৩৪৬ ভাদ্রে প্রথম ও দ্বিতীয়[৬] খণ্ডের মুদ্রণ শেষ হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের গীতভূমিকা 'প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে' ঐ গ্রন্থে ছিল না। উত্তরকালে দুই খণ্ডে নূতন আখ্যাপত্র ও প্রথমখণ্ডে গীতভূমিকা সংযোজিত।

১ কবি বলেন : বিস্মৃত বাল্যকালের মুহূর্ত-স্থায়ী সুখ দুঃখের সহিত দুইদণ্ড খেলা করিয়া কে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল··· এ গানগুলি আজ সাত আট বৎসর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, আমি ছাপাইতে চেষ্টা করি নাই।

'প্রকাশকের বক্তব্য'-শেষে আছে : ১২৯১ সনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল।

২ স্পষ্টই মুদ্রণপ্রমাদ। 'গানগুলি' স্থলে 'গানগুলির সুর' হইবে।

৩ মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত অষ্টম ভাগ কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত বা প্রকাশিত এই তথ্য উক্ত গ্রন্থের আখ্যাপত্র-অনুযায়ী ঠিক হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। অষ্টম ভাগের প্রায় শেষে (৩২৩-৩১ পৃষ্ঠায়) সন্নিবিষ্ট— 'মন তুমি নাথ লবে হরে' 'যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ' 'গরব মম হরেছ প্রভু' ইত্যাদি অন্তত আটটি গান যে ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২০ জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৩ আষাঢ়ের মধ্যে রচিত তাহা শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার -সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি দেখিয়া জানা যায়। মনে হয় শেষ ১৬ পৃষ্ঠার একটি ফর্মা এবং আরো ১ পাতা বা ২ পৃষ্ঠা বাদে সমুদয় গ্রন্থ ১৩১০ সালেই ছাপা হইয়া থাকিবে।

৪ 'গান'এর এই দ্বিতীয় সংস্করণ বড়োই রহস্যময়। ইহার বিভিন্ন প্রতি মিলাইতে গিয়া দেখা গেল— সূচীপত্রসহ সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রণ সারা হইলে, বহু গান বর্জনের ও সেই স্থলে নূতন গান সন্নিবেশের প্রয়োজন হয় এবং এজন্য স্পষ্টতই অনেকগুলি পাতা নূতন ছাপা হয়; সমস্ত সূচীপত্র পুনর্বার ছাপা সত্ত্বেও বহু বর্জিত গানের উল্লেখ থাকে, সেগুলি অধিকাংশই ছিল অন্যের রচনা। পরবর্তী 'বর্জিত গান'এর তালিকায় চিহ্ন দিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, ✦ চিহ্নিত রচনা অপরিবর্তিত 'গান' (১৯০৯) গ্রন্থে থাকিলেও, পরিবর্তিত ও বহুপ্রচারিত কপিগুলিতে নাই— উহার 'সংশোধিত' সূচীপত্রে থাক্ বা না'ই থাক্।

এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণসমূহে এক অংশ 'ধর্ম্মসঙ্গীত' এবং অবশিষ্ট অংশ 'গান' নামে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশিত। সুতরাং 'গান' এই নামের পরবর্তী গ্রন্থ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের অখণ্ড 'গান' হইতে বহুশঃ ভিন্ন।

৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'বিমল প্রভাতে' ইত্যাদি গানটিও আছে।

৬ এই খণ্ডের পরিশিষ্ট-ধৃত গান-দুটির মেক-আপ প্রুফ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত, তাহাতে তারিখ : 5/9/39 [১৯ ভাদ্র ১৩৪৬]

অন্যান্য বিশিষ্ট আকর গ্রন্থ

১ জাতীয় সঙ্গীত। প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ১৮৭৮

২ ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী। সংক্ষেপে 'সঙ্গীতমুক্তাবলী'।
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় -সংকলিত। প্রথম ভাগ। তৃতীয় সংস্করণ। ১৩০০

৩ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন। প্রসন্নকুমার সেন -সংকলিত ?[১]

৪ ব্রহ্মসঙ্গীত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। বিশেষভাবে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত একাদশ সংস্করণ (মাঘ ১৩৩৮) দেখা হইয়াছে। 'ব্রহ্মসঙ্গীত' উল্লেখ-মাত্রে সর্বত্র উক্ত গ্রন্থই বুঝিতে হইবে।

৫ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন। নববিধান। দ্বাদশ সংস্করণ। ১৯৩৩

৬ বাঙ্গালীর গান। বঙ্গবাসী। দুর্গাদাস লাহিড়ী -সংকলিত। ১৩১২
এই গ্রন্থে তথ্যের ও মুদ্রণের প্রমাদ অত্যন্ত বেশি।

[১] স্খলিত-আখ্যাপত্র এই নামের একখানি গ্রন্থ দেখা হইয়াছে। ইহাকে আভ্যন্তরিক প্রমাণে, প্রসন্নকুমার-সংকলিত এবং নববিধান-প্রকাশিত গ্রন্থের কোনো-এক সংস্করণ মনে হয়; দ্বাদশ সংস্করণের পূর্ববর্তী।

বর্তমান গ্রন্থে বর্জিত গান

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	[0]প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
অন্তরের ধন প্রাণরঞ্জন স্বামী ॥ ১ ব্রহ্মসঙ্গীত। নাম নাই [2]স্বর ৮ (১৩৫৬)। শুদ্ধিপত্র দ্রষ্টব্য	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [1]বীণাবাদিনী ১২।১৩০৪।২৪৩ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৪।১৩১৫।২২১
আজ তোমায় ধরব চাঁদ ॥ ২ প্রকৃতির প্রতিশোধ	নাই	অ [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] স্বরলিপি-গীতিমালা
আজি এ সন্তান দুটি ॥ ৩ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' গানেরই পাঠান্তর
আজি কী হরষসমীর বহে ॥ ৪ শনিবারের চিঠি ১০।১৩৪৬।৫৯১	নাই	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬ ব্রহ্মসঙ্গীত
†আমি সকলি দিনু ॥ ৫ কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)। গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	ইন্দিরা দেবী[3] শতগান। ব্রহ্মসঙ্গীত
আর গো কত ঘুরি ॥ ৬ দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতান	নাই	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [4]ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩

[0] উক্ত গ্রন্থে 'বাদ-দেওয়া গানের তালিকা' বা পরিশিষ্ট (খ), পৃ ৮৫৯-৬৪, দ্রষ্টব্য। যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের রচিত নয় বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল ওই তালিকায় সেগুলি তারা-চিহ্নিত হইয়াছে।

[1] সাময়িক পত্রের উল্লেখের আনুষঙ্গিক সংখ্যাগুলি যথাক্রমে মাস বৎসর ও পৃষ্ঠাঙ্ক -সূচক। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বৎসর-গণনা শকাব্দে।

[2] স্বর—স্বরবিতান। গ্রন্থোত্তর সংখ্যা সর্বদাই গ্রন্থের খণ্ড-বাচক।

[3] রচনা নিজের বলিয়া স্বীকার করেন।

[4] দ্রষ্টব্য দশম পাদটীকা, পৃ ৯৭৩ † দ্রষ্টব্য চতুর্থ টীকা, পৃ ৯৬৩

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
+এ কী এ মোহের ছলনা ॥ ৭ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৯।১৩১০।৭৯
এ কী ভুলে রয়েছ মন ॥ ৮ কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)	নাই	নিমাইচরণ মিত্র সঙ্গীতমুক্তাবলী
এ ভব-কোলাহল ॥ ৯ বাঙ্গালীর গান	নাই	'চলেছে তরণী প্রসাদপবনে' গানের শেষ অংশ
+এসো দয়া গলে যাক ॥ ১০ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	ইন্দিরা দেবী° ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫
+ওই-যে দেখা যায় আনন্দধাম ॥ ১১ কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)। গান (১৯০৯) প্রথমসংস্করণ গীতবিতান	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত সঙ্গীতপ্রকাশিকা ১।১৩১১।৬৪১
+কতদিন গতিহীন ॥ ১২ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫
কে আমার সংশয় মিটায় ॥ ১৩ রবিচ্ছায়া	নাই	সুরের উল্লেখ নাই গান নহে
+কেন আনিলে গো ॥ ১৪ গান (১৯০৯)	আছে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ১২।'১০।১২৩
গভীর-বেদনা-অস্থির প্রাণ ॥ ১৫ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাসী ১২।১৩৪৬।৮১৮ সাহিত্য-সাধক-চরিত- মালা ৬৬, পৃ ২৫

+ দ্রষ্টব্য চতুর্থ টীকা, পৃ ৯৬৩   ° রচনা নিজের বলিয়া স্বীকার করেন।

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
*চিত মন তব পদে ॥ ১৬ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬
ছাড়িব আজি জীবনতরণী ॥ ১৭ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন	নাই	দয়ালচন্দ্র ঘোষ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন (১৯৩৩)
*ছেলেখেলা কোরো না গো ॥ ১৮ রবিচ্ছায়া। গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	সুরের উল্লেখ নাই গান নহে
*জীবন বৃথায় চলে গেল যে ॥ ১৯ গান (১৯০৯)	আছে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৯।১৩১৪।৮২
জীবনবল্লভ তুমি দীনশরণ ॥ ২০ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন	নাই	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মসঙ্গীত। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন (১৯৩৩)
*ডাকি তোমারে কাতরে ॥ ২১ গানের বহি। কাব্যগ্রন্থাবলী কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)। গান (১৯০৯) রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী	আছে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩
*তাঁরে রেখো রেখো ॥ ২২ ব্রহ্মসঙ্গীত। গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	ইন্দিরা দেবী* প্রবাসী ১১।১৩১১।৬২৪
*তুমি আদি অনাদি ॥ ২৩ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৯।১৩১৪।৭৯

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
†তোমা বিনা কে আর করে ॥ ২৪ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৭।১৩১৪।৩৯
তোমারি জয়, তোমারি জয় ॥ ২৫ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন	নাই	কৈলাসচন্দ্র সেন ব্রহ্মসঙ্গীত ॥ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন (১৯৩৩)
দরশন দাও হে প্রভু ॥ ২৬ সাধনা ১১।১২৯৮।৩১৯ নাম নাই ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা স্বরলিপি ও গানের খসড়া৫
দীন দয়াময়, ভুলো না ॥ ২৭ ব্রহ্মসঙ্গীত তত্ত্ববোধিনী ৬।১৭৯৪।৯৩ রচয়িতার নাম নাই	নাই	প্রথম প্রকাশের কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ১২ । রবীন্দ্রনাথ বলেন— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা। শনিবারের চিঠি ১০।১৩৪৬।৫৯১-৯২
দুজনে মিলিয়া যদি ॥ ২৮ রবিচ্ছায়া	নাই	সুরের উল্লেখ নাই গান নহে
নিকটে নিকটে থাকো হে ॥ ২৯ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার হাতের স্বরলিপি ও গানের খসড়া৫
†নিঝর মিশিছে তটিনীর ॥ ৩০ রবিচ্ছায়া। গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	সুরের উল্লেখ নাই গান নহে

† দ্রষ্টব্য চতুর্থ টীকা, পৃ ৯৬৩

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
৭নিরঞ্জন নিরাকার ॥ ৩১ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩ ব্রহ্মসঙ্গীত
৭প্রভু দয়াময় ॥ ৩২ রবিচ্ছায়া। গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী ৬।১৮৩৭।১১৫
বিপদভয়বারণ ॥ ৩৩ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন	নাই	যদু ভট্ট। ব্রহ্মসঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১
৭বিমল প্রভাতে মিলি ॥ ৩৪ বৈতালিক। গীতিচর্চ্চা ব্রহ্মসঙ্গীত। গান (১৯০৯)	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫ স্বরলিপি ও গানের খসড়া[৫] সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৯।১৩১৪।৬৭
ব্যথাই আমায় আনল ॥ ৩৫ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী লেখক-কর্তৃক স্বীকৃত
৭ভবভয়হর প্রভু ॥ ৩৬ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫
মায়ের বিমল যশে ॥ ৩৭ রবিচ্ছায়া	নাই	সুরের উল্লেখ নাই গান নহে

৫ জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে হিন্দি গানের সুরে বাংলা কথা বসানো। যে স্বরলিপিগুলির বাংলা কথার অংশে অল্পবিস্তর কাটাকুটি আছে সেগুলিকেই খসড়া বলা চলে ; হাতের লেখা যাঁহার রচনাও তাঁহারই। রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত কয়েকটি রচনার খসড়া রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় পাওয়া যায়।

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত-বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা সম্পর্কে ইতি বা নেতি -বাচক প্রমাণ
[৬] মুখের হাসি চাপলে কি হয় ॥ ৩৮	নাই	কেদারনাথ চৌধুরী [?]
[৭] রাজা বসন্ত রায়		[৯] প্রভাত-রবি, পত্র ১৮-১৯
[৮] সঙ্গীতপ্রকাশিকা ২।১৩১২।১৯১		দেশ, ২৮ বৈশাখ ১৩৭৫
[৬] গীতবিতান (১৩৫৭-১৩৭৩)		সাহিত্যসংখ্যা। পৃ ১৫২

---

[৬] গীতবিতানের পূর্বসংস্করণগুলিতে এই গান ও এ সম্পর্কে বহু তথ্য গ্রন্থপরিচয় অংশে দ্রষ্টব্য। বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, এ গানের ভাব ভাষার ইঙ্গিত লেখক রবীন্দ্ররচনা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন :

হাসিরে পায়ে ধোরে রাখিবি কেমন করে,
হাসির যে প্রাণের সাধ ঐ অধরে খেলা করে!

দ্রষ্টব্য : ভারতী ৯।১২৮৮।৪৩০।কলম২/বউঠাকুরানীর হাট, প্রচলিত সংস্করণ, পরিচ্ছেদ ৮।— রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে (১৩১৫-১৬ বঙ্গাব্দে) প্রায়শ্চিত্তে ইহার সার্থক ও সম্পূর্ণ রূপ দেন : হাসিরে কি লুকাবি লাজে ইত্যাদি।

[৭] কেদারনাথ চৌধুরী বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের এই নাট্যরূপ দেন জানা যায়; এই নাটকের উল্লেখও আছে বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৮৭ খৃঃ অঃ) আখ্যাপত্রে। মুদ্রিত আকারে 'রাজা বসন্ত রায়' পাওয়া যায় না।

[৮] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -সম্পাদিত।

[৯] 'মুখের হাসি চাপলে কি হয়' রবীন্দ্রনাথের গান নহে এ পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ ইতঃপূর্বে পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র না পাওয়া গেলেও, তাঁহাকে লিখিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্রেই এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণের

বিজ্ঞাপন

গীত-বিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেননি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেই জন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-সম্পাদিত

গীতবিতানের বিষয়বিন্যাস

ভাগ	গীতসংখ্যা	ইদানীন্তন গীতবিতানের পৃষ্ঠা
সাধক	২	১২৬-১২৭
উৎসব	৭	১২৭-১২৯
আনন্দ	২৫	১২৯-১৩৯
বিশ্ব	৩৯	১৩৯-১৫৪
বিবিধ[১০]	১৪৩	১৫৫-২০৩
সুন্দর	৩০	২০৪-২১৪
বাউল	১৩	২১৫-২২০
পথ	২৫	২২০-২২৯
শেষ	৩৪	২২৯-২৪২
পরিণয়[১১]	৯	৬০৭-৬১০
স্বদেশ	৪৬	২৪৩-২৬৭
প্রেম		
গান	২৭	২৭১-২৮১
প্রেমবৈচিত্র্য	৩৬৮	২৮১-৪২৩
প্রকৃতি		
সাধারণ	৯	৪২৭-৪৩১
গ্রীষ্ম	১৬	৪৩১-৪৩৭
বর্ষা	১১৫	৪৩৭-৪৮১
শরৎ	৩০	৪৮১-৪৯৩
হেমন্ত	৫	৪৯৪-৪৯৫
শীত	১২	৪৯৫-৫০০
বসন্ত	৯৬	৫০০-৫৪০
বিচিত্র	১৩৮	৫৪৩-৬০৪
আনুষ্ঠানিক	৯	৬১০-৬১৪
পরিশিষ্ট[১২]	২	৯০৯

তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের গানের 'সম্পূর্ণ' সংগ্রহ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'গীতবিতান' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) বাংলা ১৩৩৮ সালের আশ্বিনে প্রথম প্রকাশিত হয় ; তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ ১৩৩৯ সালের শ্রাবণে। এই সংস্করণে গানগুলি প্রধানতঃ বিভিন্ন গীতগ্রন্থে কালক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। পরে, বিষয়ানুক্রমে সাজাইবার প্রয়োজন বোধ করিয়া কবি গানগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ও বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। এইভাবে সজ্জিত দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের মুদ্রণ ১৩৪৬ সালের ভাদ্রেই সমাধা হয়, কিন্তু নানা কারণে ১৩৪৮ মাঘের পূর্বে বহুল প্রচারিত হয় নাই। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'গীত-বিতান দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়া যাওয়ার পর কবি আরও অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গান তৃতীয় খণ্ডে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অনবধানতাবশত প্রথম দুই খণ্ডে কতকগুলি গান বাদ পড়িয়াছে ; তৃতীয় খণ্ডে ঐ সকল গান সংযোজিত হইবে।'

বস্তুতঃ ১৩৫৭ আশ্বিনে ওই দীর্ঘপ্রত্যাশিত তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হইল। ইহাকে নির্ভুল বা নিখুঁত করিতে আরও দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধান ও সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। আশা করা যায়, সে কাজ পর পর অনেকগুলি

পূর্বপৃষ্ঠার পাদটীকা—

[১০] দ্বিতীয় সংস্করণে গানের সংখ্যা ১৪৪ ছিল ; তন্মধ্যে ১৪২-সংখ্যক রচনা (আর গো কত ঘুরি। পৃ ১৯৯) বর্তমানে বর্জিত হইল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপির তৃতীয় খণ্ডে এই গান (সংখ্যা ৬) রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত, পরে চিরকুটে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছাপাইয়া সংশোধিত —এরূপ গ্রন্থ দেখা গিয়াছে। শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর অভিমতও এই সংশোধনেরই অনুকূলে।

[১১] বর্তমান মুদ্রণে এই গীতিগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডে আনুষ্ঠানিক সংগীতের প্রথম পর্যায়রূপে সংকলিত। কবির বহু গীতিসংকলনে এই গান বা এরূপ গান সংগত কারণেই অনুষ্ঠানসংগীত-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

[১২] ১৩৪৬ ভাদ্রে গ্রন্থমুদ্রণ প্রায় শেষ হইবার পর রচিত হওয়ায় পরিশিষ্টে দেওয়া হয়। বর্তমানে তৃতীয় খণ্ডের যথোচিত স্থানে সংকলিত। এই দুটি গান সম্পর্কে পৃ ৯৬৩ -ধৃত টীকা ৬ দ্রষ্টব্য।

সংস্করণে (১৩৬৪ ভাদ্র - ১৩৭৯ পৌষ) কথঞ্চিৎ সমাধা হইয়া থাকিবে। কবির রচিত গানের সংখ্যা অল্প নহে ; পাঠভেদ 'অনন্ত' ; মূলতঃ কতগুলি পত্রিকায়, অনুষ্ঠানপত্রে, পাণ্ডুলিপিতে, কবির আপন গ্রন্থে ও অন্যের কৃত সংকলনে এই-সব রচনা বিন্যস্ত বা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহার তালিকাও অতিশয় দীর্ঘ হইবে। কবির প্রথম বয়সে তাঁহার বহু রচনা যেমন অন্যের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, অন্যের একাধিক রচনা যে তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই এমন নয় ; অথচ যথোচিত প্রমাণের অভাবে বা নানা প্রমাণের পরস্পরবিরুদ্ধতায় অনিশ্চয়তা ঘুচে না। সম্পাদন-কার্যে নানা ত্রুটিবিচ্যুতির সম্ভাবনা সব সময়েই আছে।

যাহা হউক, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রচলিত গীতবিতানের প্রথম দুইটি খণ্ডে কবির যে গান বর্জিত, যে গান সংকলিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না বা প্রমাদবশতঃ সংকলিত হয় নাই, সে-সবই বর্তমান তৃতীয় খণ্ডে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত দুই খণ্ডে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র মাত্র অল্প কতকগুলি গান বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল ; বর্তমান তৃতীয় খণ্ডে সম্পূর্ণ 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' মুদ্রিত হইল। কেবল এই দুইটি গীতিনাট্য নয়, কবির সমুদয় গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যই, যাহার আদ্যন্তই প্রায় সুরে বাঁধা এবং প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন হইলে যাহার অনেকাংশের অর্থ বা কবিত্বসৌষ্ঠব -অবধারণে অসুবিধা হইতে পারে, এই সর্বশেষ খণ্ডে সম্পূর্ণতঃ সংকলন করা সংগত মনে হইয়াছে। পরিশিষ্টে 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা' (পাণ্ডুলিপি : পৌষ ১৩৪৫) এবং 'পরিশোধ' (প্রবাসী : কার্তিক ১৩৪৩) মুদ্রিত হইল।

সুধীজনের নিকট বিস্তারিত ভাবে বলা বাহুল্য যে, সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির পরিমাণ প্রকৃতি ও পরিণতির পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন ও ধারণা করিতে হইলে 'রবিচ্ছায়া' 'গানের বহি' প্রভৃতি প্রাচীন কোনো গ্রন্থের কবি-রচিত কোনো গানই ত্যাগ করা চলে না। বহু রচনাকে সাধারণে নিছক কবিতা বলিয়া জানিলেও কবির বহু গ্রন্থে বহুবার সেগুলি সুর-তালের উল্লেখের দ্বারা অভ্রান্ত-ভাবে গীতরূপেও নির্দিষ্ট ; সেই গানগুলি এই গ্রন্থে সংকলন করা হইল। মুদ্রিত স্বরলিপির ঠিকানা সূচীতে দেওয়া হইয়াছে ; যে ক্ষেত্রে সুরের অথবা সুর ও তালের উল্লেখ মাত্র পাওয়া গিয়াছে, সেই তথ্যই সূচীতে পরিবেশিত।

তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানের গানগুলি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি, রচনার সন্নিবেশক্রমে পরে দেওয়া গেল। পার্শ্ববর্তী প্রথম সংখ্যায় এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা, আবশ্যকস্থলে পূর্ণচ্ছেদের পরবর্তী সংখ্যায় আলোচ্য গানের সংখ্যা, বুঝানো হইয়াছে।

৬১৭-৭৫০ গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ॥ কৌতূহলী পাঠক এই নাট্যাবলী সম্পর্কে বহু তথ্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেখিয়া লইবেন। যেমন রবীন্দ্র-রচনাবলীর—

'অচলিত' প্রথম খণ্ডে : কালমৃগয়া ও
প্রথমসংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা

প্রথম খণ্ডে : বাল্মীকিপ্রতিভা ও মায়ার খেলা

পঞ্চবিংশ খণ্ডে : চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা ও শ্যামা

৬১৭-৩৪ কালমৃগয়া ॥ গীতিনাট্য। প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১২৮৯। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' উপলক্ষে খ্রীস্টীয় ১৮৮২ অব্দের শনিবার ২৩ ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত।

৬৩৫-৫৪ বাল্মীকিপ্রতিভা ॥ গীতিনাট্য। ১২৮৭ (১৮০২ শক) ফাল্গুনে প্রকাশিত। ১২৯২ ফাল্গুনে যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বহুশঃ পৃথক গ্রন্থ; উহারই ঈষৎ-সংস্কৃত রূপ বর্তমানে প্রচলিত এবং গীতবিতান গ্রন্থে মুদ্রিত। ইহাতে 'কালমৃগয়া' হইতে বহু গান, কতকগুলি পরিবর্তন-সহ, কতকগুলি যথাযথ, গৃহীত হইয়াছে। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেন, 'বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয় বাবুর [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর] কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী [লাল] চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল-সঙ্গীতের দুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।'

৬৪০ ও ৬৪৩ 'রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা' এবং 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা' অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রস্মৃতি, সংগীতস্মৃতি অধ্যায়।

৬৫২ কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা ॥ 'যাও লক্ষ্মী অলকায়' প্রভৃতি ছত্রে 'সারদামঙ্গল' কাব্যের অংশবিশেষের প্রভাব আছে।

৬৫৩ এই-যে হেরি গো দেবী আমারি॥ ইহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' (অক্টোবর ১৮৭৫) কাব্যের 'জয় জয় পরব্রহ্ম' গানটির কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৬৫৩ দীন হীন বালিকার সাজে॥ গান নহে, আবৃত্তির বিষয়।

৬৫৫-৮২ মায়ার খেলা॥ গীতিনাট্য। ১৮১০ শকের (বাংলা ১২৯৫) অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম প্রকাশিত। কবি ইহার বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছেন, 'সখিসমিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতিকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।… আমার পূর্ব্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার [নলিনী'র] সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।… পাঠক ও দর্শকদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অন্যান্য পাত্রগণের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর নহে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনের এই গীতিনাট্যকে শেষ বয়সে (১৩৪৫ সালে) নূতন রূপ দিয়া, পুরাতন গানকে নূতন করিয়া এবং বহু নূতন গানও যোজনা করিয়া, নৃত্যে অভিনয় করাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই অপ্রকাশিতপূর্ব নৃত্যনাট্য 'পরিশিষ্ট ১' রূপে এই গ্রন্থে অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

৬৮৩-৭০৮ চিত্রাঙ্গদা॥ নৃত্যনাট্য। কবির পুরাতন রচনা 'চিত্রাঙ্গদা' (ভাদ্র ১২৯৯) কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং কলিকাতায় 'নিউ এম্পায়ার থিয়েটার'এ খ্রীষ্টীয় ১৯৩৬ সালের ১১, ১২, ১৩ মার্চ্ তারিখে অভিনয়-উপলক্ষ্যে প্রথম প্রকাশিত। বিজ্ঞপ্তিতে কবি জানাইয়াছিলেন, 'এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য্য নয়। যে পাখীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।'

৬৮৩ 'ভূমিকা' ছাড়াও ইহার—

৬৮৭ সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি ইত্যাদি ৫ ছত্র

৬৮৯ হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ ইত্যাদি ৮ ছত্র

৬৯০-৯১ ব্রহ্মচর্য !— ইত্যাদি ৮ ছত্র

৬৯৩ এ কী দেখি ! ইত্যাদি ১১ ছত্র

৬৯৪ মীনকেতু ইত্যাদি ৪ ছত্র

৬৯৬ হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার ইত্যাদি ১৫ ছত্র

৬৯৭ আজ মোরে ইত্যাদি ২০ ছত্র

৭০২-৭০৩ রমণীর মন-ভোলাবার ছলাকলা ইত্যাদি ৯ ছত্র

৭০৫ হে কৌন্তেয় ইত্যাদি ৮ ছত্র [পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

অংশগুলি গান নয়, 'কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে' রচিত। ৭০৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বৈদিক মন্ত্র কয়টিও আবৃত্তির বিষয়।

৭০৬-৭০৭ এস' এস' বসন্ত, ধরাতলে ॥ রূপান্তরে 'মায়ার খেলা'য় মুদ্রিত।

বিভিন্ন অভিনয়-উপলক্ষে কবিকর্তৃক এই নৃত্যনাট্যের বহুল পরিবর্তন সম্পর্কে, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় যাহা জানাইয়াছেন এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে—

৬৮৭ যাও যদি যাও তবে ইত্যাদি দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম গানটি ১৯৩৬ সালের পরবর্তী অভিনয়ে প্রায়শই বাদ দেওয়া হইয়া থাকে।

৬৯০ যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে··· হায় হায় হায় ॥ সখীগণের গানের এই তুকের পরেই নিম্নলিখিত সংলাপটুকু, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে কবিকর্তৃক সন্নিবিষ্ট হইয়া, বাঁকুড়ায় ও মেদিনীপুরে বহু অভিনয়ে গীত ও অভিনীত হইয়াছিল :

চিত্রাঙ্গদা। তুমি কি পঞ্চশর।

মদন। আমি সেই মনসিজ—

নিখিলের নরনারী-হিয়া

টেনে আনি বেদনাবন্ধনে।

চিত্রাঙ্গদা। কী বেদনা কী বন্ধন

জানে তাহা দাসী।

তুমি কোন্ দেবতা প্রভু,
তুমি কোন্ দেবতা।
[ঋতুরাজ] আমি ঋতুরাজ, আমি
অখিলের অনন্ত যৌবন।
আমি ঋতুরাজ।

এই অংশটি যুক্ত হওয়াতে, সহজেই অনুমেয়, নৃত্যনাট্যের প্রচলিত সংস্করণ-অনুযায়ী মদনের যে কালে আবির্ভাব, তৎপূর্বেই তাঁহার ঋতুরাজ-সহ মঞ্চপ্রবেশ ঘটানো হইয়াছিল।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ইহাও জানাইয়াছেন যে—

৬৯০ ব্রহ্মচর্য !— পুরুষের স্পর্ধা এ যে ইত্যাদি ৩ ছত্র, এ ক্ষেত্রে মদনের উক্তিরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং পরবর্তী

৬৯১ পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয় ইত্যাদি ৫ ছত্র ছিল সখীর উক্তি।

৭০৫ হে কৌন্তেয় ইত্যাদি পূর্বোক্ত ৮ ছত্র সম্পর্কে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ জানাইয়াছেন যে, প্রচলিত স্বরলিপিগ্রন্থে গানরূপে প্রচারিত না থাকিলেও, ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারিতে এই অংশে কবি সুর দেন এবং ঐ বৎসর মার্চ্ মাসে পূর্ববঙ্গ ও আসাম -ভ্রমণকালে বহু অভিনয়ে, তেমনি পরবৎসর বাঁকুড়ায় ও মেদিনীপুরে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী-গোষ্ঠী যে অভিনয় করেন তাহাতে, সুরে ও তালে গীত এবং অভিনীত হয়।

৭০৯-৩২ চণ্ডালিকা॥ নৃত্যনাট্য। ১৩৪০ ভাদ্রে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নাটক প্রকাশিত হয়; উহাতে দুইটি দৃশ্য এবং প্রায় বলা চলে 'প্রকৃতি' ও 'মা' এই দুইটি চরিত্রই আছে। মা ও মেয়ের সংলাপ গদ্যে রচিত। ওই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নূতন ভাবে আদ্যন্ত 'ছন্দে' ও সুরে রচনা করিয়া, বর্তমান নৃত্যনাট্যের প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৪৪ সালের ফাল্গুনে; সর্বসাধারণ-সমক্ষে প্রথম অভিনীত হয় কলিকাতার 'ছায়া' রঙ্গমঞ্চে খ্রীষ্টীয় ১৯৩৮ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ্ তারিখে। পরবর্তী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে) কলিকাতায় 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনয়ের

প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত রচনাটিতে নানা পরিবর্তন সাধন করেন। পরিবর্তিত নাটকের যে পাঠ ১৩৪৫ চৈত্রে স্বরলিপি-সহ প্রচারিত, তাহাই বর্তমান গ্রন্থে সংকলন করা হইয়াছে। এই রচনা আদ্যন্তই সুরে তালে বসানো।

১৩৪৪ ফাল্গুনে প্রকাশিত 'চণ্ডালিকা'য়, আখ্যায়িকার সার-সংকলন হিসাবে মূল নৃত্যনাট্যের পূর্বে একটি 'পরিচয়' মুদ্রিত আছে; উহার সূচনায় কবি বলিয়াছেন, 'সমগ্র চণ্ডালিকা নাটিকার গদ্য এবং পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে।'

বস্তুতঃ, চণ্ডালিকার ব হু গা ন স ম্পূ র্ণ ই গ দ্য ছ ন্দে লে খা —ইহা সতর্ক পাঠকের মনোযোগ এড়াইবে না।

৭৬৩-৫০ শ্যামা ॥ নৃত্যনাট্য। 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের অন্তর্গত 'পরিশোধ' (২৩ আশ্বিন ১৩০৬) কবিতাটির বিষয়বস্তু লইয়া রচিত 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য (আশ্বিন ১৩৪৩) বর্তমান গ্রন্থে 'পরিশিষ্ট ২' রূপে মুদ্রিত। 'শ্যামা' উহারই পরিবর্তিত পরিবর্ধিত ও সমৃদ্ধতর রূপ বলা যায়; বাংলা ১৩৪৬ ভাদ্রে স্বরলিপি-সহ প্রথম প্রচারিত। তৎপূর্বে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতার 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

ইহাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুরে তালে বাঁধা, কোথাও 'কাব্য-আবৃত্তি' নাই।

৭৫৩-৬৪। ১-২০ সংখ্যা ॥ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ॥ বাংলা ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশ-কালে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ[0] -সহ একুশটি রচনা ছিল। আর-একটি ভানুসিংহের পদ (কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়)

---

[0] রবিচ্ছায়ায় যে কয়টি গান (মোট ৫টি) সংকলিত তাহাতে তালেরও উল্লেখ আছে। যে-কোনো গান উল্লিখিত রাগ-তালে গাওয়া হয় কিনা তাহা স্বতন্ত্র বিচারের বিষয়। যেমন, 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান' গানে প্রথমতঃ 'পূরবী'র উল্লেখ ছিল, পরে 'ভৈরবী / কাওয়ালি'র উল্লেখ রবিচ্ছায়ায়— এই গানের স্বরলিপি দ্রষ্টব্য স্বরবিতানের একবিংশ খণ্ডে।

১২৯২ সালের 'প্রচার' মাসিক-পত্রে এবং পরে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের অনুসরণে প্রাচীন ব্রজবুলিতে রচিত এই গান বা কবিতাগুলি কয়েক বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'তেও প্রকাশ পায়— যথা, বর্তমান গ্রন্থের ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫ সংখ্যা ১২৮৪ সালে; ১৮ সংখ্যা ১২৮৫ সালে; ১৬ সংখ্যা ১২৮৬ সালে; ১৭ ও ১৯ সংখ্যা ১২৮৭ সালে এবং ১১ সংখ্যা ১২৯০ সালে। মূলতঃ 'ভারতী'র ১২৮৪ আশ্বিন ও ১২৮৮ শ্রাবণ -সংখ্যায় মুদ্রিত দুইটি পদ—

৪৪০ সজনি গো) শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা ইত্যাদি

৩৪২ মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান ইত্যাদি

গীতবিতানের পূর্ববর্তী অংশে মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডে, যে গানগুলির স্বরলিপি (সংখ্যা ২, ৩, ৫, ৮, ৯, ১০, ১১) আছে সেগুলির পাঠ স্বরলিপি-অনুসারী। স্বরলিপি-বিহীন রচনার সংকলন -কালে প্রায়শঃ পরবর্তী সংহত ও মার্জিত পাঠই গৃহীত হইয়াছে। বলা প্রয়োজন—

৭৫৯। ১২-সংখ্যক গানের প্রাচীন পাঠ 'গহির নীদমে' ইত্যাদি। তেমনি

৭৬৩। ১৯-সংখ্যক গানের প্রাচীন পাঠ 'দেখলো সজনী চাঁদনী রজনী' ইত্যাদি। ১২৯১ সালে মুদ্রিত মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৭৬৭-৮১২। ১-১৩২ সংখ্যা॥ নাট্যগীতি॥ বিভিন্ন নাটক বা নাট্যকাব্যের যে গানগুলি ইতিপূর্বে সংকলিত হয় নাই, সেইগুলি এই অধ্যায়ে মুদ্রিত। কোনো নাটকের না হইলেও, নাট্যগুণোপেত অন্য কতকগুলি রচনা এই অংশে স্থান পাইয়াছে।

৭৬৭।১ জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ॥ যেটুকুর স্বরলিপি আছে সেই সংক্ষিপ্ত পাঠই গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত। দীর্ঘতর মূল রচনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত 'সরোজিনী' নাটকের (১৭৯৭ শকাব্দ) অন্তর্গত এবং জহরব্রত-উদ্‌যাপনে উন্মত্তা রাজপুত-ললনাদিগের সমবেতসংগীত। ইহার রচনা সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের উক্তি উদ্ধারযোগ্য—

…রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ্ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন— এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না— কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (১৩২৬) পৃ ১৪৭

৭৬৭।২ হৃদয়ে রাখো গো, দেবী, চরণ তোমার॥ ইহার ভাব ও ভাষা অনেকাংশে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' (১২৮৬) কাব্য হইতে গৃহীত, উক্ত গ্রন্থের ১২৭৭ সালে রচনা আরম্ভ ও ১২৮১ সালে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে আংশিক প্রকাশ হয়। প্রথম হইতেই এই গানটি 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র শেষে বরদাত্রী সরস্বতীর ভাষণের অব্যবহিত পূর্বে বাল্মীকি-কর্তৃক উদ্গীত বাণীবন্দনারূপে সন্নিবিষ্ট ছিল। 'গান' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে (সেপ্টেম্বর ১৯০৮) ইহা 'বাল্মীকিপ্রতিভা' হইতে বর্জিত হইয়াছে।

৭৬৮-৭৫। ৩-১৯ -সংখ্যক গানগুলি 'ভগ্নহৃদয়' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) নাট্যকাব্যের অন্তর্গত। 'রবিচ্ছায়া'য় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুর তালের উল্লেখ -সহ, সংকলিত আছে। কয়েকটি গান (৬টি) যে ভগ্নহৃদয়েরই নানা অংশ বা অংশের রূপান্তর তাহা নূতন আবিষ্কার; এ-কয়টি গীতবিতানের ১৩৭৬-পূর্ব সংস্করণে প্রেম ও প্রকৃতি অধ্যায়ে (বর্তমান

সংখ্যা ৪, ১৫, ১৬, ১৯) এবং তৃতীয় পরিশিষ্টে (বর্তমান সংখ্যা ৫ ও ১৭) সংকলিত হইয়াছিল। এগুলি ভগ্নহৃদয়ে 'গান' বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই কিন্তু সবগুলি রবিচ্ছায়ায় এবং সংখ্যা ৫ অধিকন্তু 'গানের বহি'তে (১৩০০) ও গানে (১৯০৯) গৃহীত। সংখ্যা ৫ ও ১৭ ('সখা' স্থলে 'সখী' আছে সত্য) প্রথমসংস্করণ গীতবিতানের বর্জনতালিকায় অ-রাবীন্দ্রিক বলিয়া নির্দিষ্ট!

৭৭৩।১৫ প্রথমতঃ 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র (১৩০৩) সূচনায় 'ছায়া' (পৃ ৯) শিরোনামে মুদ্রিত ও গান বলিয়া নির্দিষ্ট, দ্বিতীয়তঃ 'গান' অংশে (পৃ ৪৩৯) উহারই সংক্ষিপ্ত পাঠ সংকলিত— শেষোক্ত পাঠই গীতবিতানে তথা স্বরবিতানে সংকলিত।

৭৭৪।১৬ প্রথম প্রকাশ : ভারতী : কার্তিক ১২৮৬, পৃ ৩২২।

৭৭৫।১৯ ইন্দিরাদেবী -কৃত স্বরলিপি অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত পাঠ সংকলিত।

৭৭৬। ২০ ও ২১ -সংখ্যক রচনা 'রুদ্রচণ্ড' (১২৮৮) নাট্যকাব্যের অন্তর্গত এবং 'রবিচ্ছায়া'য় সংকলিত। প্রথম গান (২০) প্রাপ্ত স্বরলিপি-অনুযায়ী বর্তমান গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলন করা হইয়াছে।

৭৭৭-৭৮ ২২-২৬ সংখ্যা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১২৯১) হইতে।

৭৭৭।২৩ বৃদ্ধ ভিক্ষুকের গান; নাটকের পূর্বসংস্করণে ইহা দীর্ঘতর ছিল। 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে ও পরবর্তী সংস্করণসমূহে সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত।

৭৮০।৩৩-৩৫ 'নলিনী' (১২৯১ বৈশাখ) নাটকে মুদ্রিত। ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক গান পরবর্তী 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যে অঙ্গীকৃত।

৭৭৮-৮৩। ২৬-৩৪ ও ৩৬-৪৫ চিহ্নিত ১৯টি গান[১] 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হয়। (১২৯৯ ভাদ্র-আশ্বিনের 'ভারতী ও বালক' পত্রে ইহার প্রথম দৃশ্য স্বরলিপি-সহ প্রচারিত।[২]) জানা যায় 'কোনো পারিবারিক বিবাহ-উৎসবোপলক্ষে' ইহার যৌথ রচনা।[৩] মোট

---

[১] বলা আবশ্যক, ২৬-সংখ্যক গান প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১) হইতে এই গীতিনাট্যে লওয়া হইয়াছে।

৭টি দৃশ্যে ৪৫টি গান ; তন্মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী ও অক্ষয় চৌধুরীর কতকগুলি গান থাকিলেও. রবীন্দ্রনাথের রচনাই ২৮টি। তাহা ছাড়া, সব-শেষে স্থর-তালের-উল্লেখ-হীন 'যে তোরে বাসে রে ভালো' ইত্যাদি কয় ছত্র ইন্দিরাদেবীর অভিমতে আবৃত্তির বিষয় মাত্র— 'শিশু' কাব্যে পাওয়া যাইবে। বিবাহ-উৎসব[৪] -ধৃত রবীন্দ্রনাথ-রচিত সবগুলি গান গীতবিতানে সংকলিত ; তন্মধ্যে

---

[২] পৃ ২৪৪-৫২। 'মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত।' অপিচ দ্রষ্টব্য ভারতী ও বালক, ১২৯৯ পৌষ, পৃ ৫২৬, নীচে হইতে অষ্টম-সপ্তম ছত্রে— 'মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে "বিবাহ উৎসব" পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে' ইত্যাদি। মনে হয়, মাসিক পত্রে প্রথম দৃশ্যের স্বরলিপি-যুক্ত প্রচার ও 'বিবাহ-উৎসব' পুস্তিকার প্রকাশ প্রায় সমকালীন। প্রথম দৃশ্যের শেষ গানটি মাত্র রবীন্দ্রনাথ-রচিত : নাচ্, শ্যামা, তালে তালে ইত্যাদি।

[৩] দ্রষ্টব্য ইন্দিরাদেবী-রচিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থের 'নাট্যস্মৃতি' অধ্যায়ে 'বিবাহ-উৎসব' প্রসঙ্গ। অপিচ দ্রষ্টব্য সরলাদেবী চৌধুরানীর 'জীবনের ঝরা পাতা' (১৮৭৯ শক) গ্রন্থ ; তদনুযায়ী (পৃ ৫৬) হিরণ্ময়ীদেবীর বিবাহ-উপলক্ষ্যে ইহার রচনা। জানা যায় শেষোক্ত ঘটনা রবীন্দ্রনাথের বিবাহ (২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০) হইতে ৩ মাস পরে ; দ্রষ্টব্য : সমকালীন ১।১৩৬৪। পৃ ২০-২১।

[৪] প্রাপ্ত পুস্তিকার প্রচার তৃতীয় পাদটীকায় উল্লিখিত ঠাকুর-বাড়ির পারিবারিক বিশেষ বিবাহ-উৎসবের সমকালীন নহে, তাহার অনেক পরে, ইহা নিঃসন্দেহ। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার '২৮' সংখ্যায় (মাঘ ১৩৫০/পৃ ১৭) ব্রজেন্দ্রনাথ এই পুস্তিকার বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-ভুক্তির যে তারিখ দিয়াছেন— ১৩ মে ১৮৯২ [১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯]— তাহা গ্রন্থপ্রচারের খুব কাছাকাছি সময় সন্দেহ নাই। তেমনি নিঃসন্দেহে বলা যায় ইহা বিশেষ ভাবে স্বর্ণকুমারীদেবীর রচনা নহে ; প্রথম দৃশ্যে ৭টি গানের মধ্যে

১৯টি বর্তমান গুচ্ছে আর অবশিষ্ট ৯টি নানা সূত্রে গীতবিতানের নানা অধ্যায়ে, যথা—

	পৃষ্ঠাঙ্ক
ও কেন চুরি ক'রে চায়	৪২১
তারে দেখাতে পারি নে কেন	৩৯৬।৬৬২।৯২১
দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা	৪১৮
নাচ্, শ্যামা, তালে তালে	৭৭০
বনে এমন ফুল ফুটেছে	৪১৬
বুঝি বেলা বহে যায়	৪১৬
মনে রয়ে গেল মনের কথা	৩৪৮
ঝিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে	৬৪৪
সখী, সে গেল কোথায়	৪১৯।৬৫৮।৯১৮

৭৭৮-৭৯। ২৮ ও ৩০ বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্যে দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত ও 'ভারতী'র ১৩০০ বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত। এ দুটি গান যে

৬টি তাঁহার হইলেও (স্বর্ণকুমারীদেবীর বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্যের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক -ধৃত) বাকি ৬টি দৃশ্যে সম্ভবতঃ তাঁহার রচনা নাই। বিবাহ-উৎসবের যে মুদ্রিত প্রতি আমরা পাইয়াছি তাহার প্রচ্ছদে বা ভিতরে কোথাও কোনো রচয়িতার নাম নাই। পুস্তিকাখানি 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার 'কার্য্যাধ্যক্ষ' প্রকাশ করেন, মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় অন্যান্য বহু পুস্তকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ-প্রণীত মেঘদূত (১২৯৮), স্বর্ণকুমারীদেবীর নবকাহিনী (১২৯৯), রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' (১২৯৫) বইগুলির বিজ্ঞাপনও দেখা যায়।

বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রনাট্যকল্পনার বিবর্তন' : বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬/পৃ ৩৪৫-৪৭।

'বিবাহ-উৎসব' পুস্তিকার প্রচ্ছাদিত ও প্রচ্ছদহীন বিভিন্ন প্রতি শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহে দেখা গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ইহা জানাইয়াছেন সরলাদেবী (ভারতী : ফাল্গুন ১৩০১/পৃ ৬৮১-৮২) তাঁহার 'বাঙ্গলায় হাসির গান ও তাহার কবি' প্রবন্ধে। বর্তমান গীতিগুচ্ছের অন্যান্য কয়েকটি গান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে—

৭৭৮।২৭ 'ছবি ও গান' (ফাল্গুন ১২৯০) কাব্যের অন্তর্গত। এখানে 'স্বরলিপি-গীতিমালা'র সংক্ষিপ্ত পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

৭৮১।৩৮ 'স্বরলিপি-গীতিমালা' পুস্তকে মুদ্রিত দীর্ঘতর পাঠ রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্মিলিত রচনা বলিয়া নির্দিষ্ট। 'গানের বহি' প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বোক্ত রচনার প্রথমার্ধ মাত্র গৃহীত, এজন্য ঐটুকুই রবীন্দ্ররচনা মনে হয়। অবশিষ্ট রচনাংশের শ্রী ও শৈলী পৃথক— উহাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা হইতে পারে।

'গানের বহি'তে ও 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যে এক পাঠ দেখা যায়, উহাই গীতবিতানে সংকলিত।

৭৮১-৮২। ৪১ ও ৪৪ -সংখ্যক দুটি গানই 'গানের বহি' (বৈশাখ ১৩০০) এবং 'স্বরলিপি-গীতিমালা' (১৩০৪) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৭৮২-৮৩। ৪২ ও ৪৫ -সংখ্যক গান পূর্বোক্ত 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় সংকলিত। শেষোক্ত গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে লেখা স্বরলিপিতেও রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই নির্দিষ্ট।

৭৭৮-৮২। ২৭, ২৯, ৩২-৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৩ -সংখ্যক গান ১২৯২ বৈশাখে প্রকাশিত 'রবিচ্ছায়া'তেও সংকলিত আছে।

৭৮৩।৪৬ প্রথমাবধি 'রাজা ও রানী' (শ্রাবণ ১২৯৬) নাটকে মুদ্রিত।

৭৮৩।৪৭ আজ আসবে শ্যাম॥ 'রাজা ও রানী'র প্রথম সংস্করণে ছিল।

৭৮৪। ৪৮-৫১ -সংখ্যক গান 'বিসর্জন' (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) নাটকের বিভিন্ন সংস্করণ হইতে গৃহীত।

৭৮৪। ৪৮, ৫০-৫১। কলিকাতায় 'ভারত সঙ্গীত সমাজ'এর উদ্যোগে ১ পৌষ ১৩০৭ তারিখে 'বিসর্জন'এর বিশেষ অভিনয় হয়। অনুষ্ঠান-পত্রে দেখা যায়— অটলকুমার সেন (গোবিন্দমাণিক্য), অমরনাথ বসু (নক্ষত্ররায়), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রঘুপতি), হেমচন্দ্র

বসুমল্লিক (জয়সিংহ), অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ (মন্ত্রী), ভূতনাথ মিত্র (চাঁদপাল), বেণীমাধব দত্ত (নয়নরায়) এবং মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (গুণবতী) ইহাতে অভিনয় করেন। উক্ত অভিনয়ের অনুষ্ঠানপত্রে এই তিনটি গানই পাওয়া যায়। ৪৮-সংখ্যক রচনা এপর্যন্ত অপর কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

১৮৫।৫২ খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে॥ 'সোনার তরী'র অন্তর্গত এই কবিতার রচনাকাল : ১৯ আষাঢ় ১২৯৯। 'ভারতী'তে ১২৯৯ চৈত্রে ইহার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়।

১৮৬-৮৮। ৫৩-৫৭ -সংখ্যক রচনাবলী সংশোধিত 'গান' (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থ হইতে সংকলিত। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় চতুর্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৬।৫৩-৫৪ 'চিত্রা' (ফাল্গুন ১৩০২) কাব্যের অন্তর্গত।

১৮৬।৫৫ কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'চৈতালি' (আশ্বিন ১৩০৩) কাব্যের 'গান' রচনার প্রথম ও শেষ স্তবক, মধ্যবর্তী স্তবক বর্জিত; ইহার রচনা : ২৯ চৈত্র [১৩০২]

১৮৭-৯১। ৫৬-৬১ সংখ্যা 'কল্পনা' (বৈশাখ ১৩০৭) কাব্যের অন্তর্গত।

১৮৮।৫৮ 'কল্পনা' কাব্যে পাঠান্তর মুদ্রিত আছে। স্বরলিপি-সহ বর্তমান পাঠ কবির হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে। প্রচলিত 'অখণ্ড' গীতবিতানে তাহার প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

১৮৯-৯০ ৫৯-৬০ -সংখ্যক রচনা 'কল্পনা' কাব্যে পূর্বাপর সুর তালের উল্লেখ-সহ মুদ্রিত। ৬০-সংখ্যক গানের সূচনা (ইন্দিরাদেবীর স্মৃতি-অনুযায়ী) এইরূপ—

I	গা	গা	-া	।	গা	গা	-া	।	গা	-া	গা	।
	কি	সে	র্		ত	রে	॰		অ	শ্‌	শ্রু	
।	মা	মা	-গা	I	রা	রা	-গা	।	-া	সা	সা	।
	ঝ	রে	॰		কি	সে	॰		র্	ত	রে	
।	রা	-া	রা	।	রা	-া	-গা	I	সা	-গা	-রা	।
	দী	র্	ঘ		শ্বা	॰	স্		ব	॰	ন্	
।	গা	-া	-া	।	-া	-া	-া	।	-া	-া	-মা	I
	ধু	॰	॰		॰	॰	॰		॰	॰	॰	

৭৯১।৬১ 'কল্পনা'র এই কবিতাটি সুর তালের উল্লেখ -সহ সংশোধিত 'গান' (১৯০৯) গ্রন্থে সংকলিত। দ্রষ্টব্য পৃ ৯৬৩, টীকা ৪।

৭৯২।৬২ 'বিনি পয়সার ভোজ' (ব্যঙ্গকৌতুক: ১৯০৭) কৌতুকনাট্যের অন্তর্গত, 'সাধনা'য় ১৩০০ সালের পৌষে মুদ্রিত।

৭৯২-৯৬। ৬৩-৮১ সংখ্যা। প্রধানতঃ 'চিরকুমার সভা' হইতে সংকলিত এই ১৯টি গান (ক্ষুদ্রার্থে গীতিকাও বলা চলে) উক্ত নাটকে স্বভাবকবি অক্ষয়কুমার যত্রতত্র ললিতে কেদারায় ভৈরবীতে গাহিয়া উঠেন। বন্ধুদের আক্ষেপ: গানগুলি শেষ করা হয় না কেন। অক্ষয়ের জবাব তাঁহাদের কাছে—

সখা, শেষ করা কি ভালো?
তেল ফুরোবার আগেই আমি
নিবিয়ে দেব আলো।

—প্রজাপতির নির্বন্ধ

অথবা পুরবালার কাছে—

তুমি জান আমার গাছে
ফল কেন না ফলে,
যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে
আনি চরণতলে।

—চিরকুমারসভা

কাজেই অক্ষয়ের গানের এই অজস্রতাতেই খুশি থাকিয়া, গানগুলি চার তুকে সম্পূর্ণ হইল না যে তাহার ক্ষুণ্ণতা, শুধু বন্ধুজনকে নয়, সাধারণকেও মানিয়া লইতে হয়।

বলা প্রয়োজন, 'চিরকুমারসভা' সংলাপপ্রধান উপন্যাসের আকারে 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৭ বৈশাখ-কার্তিক পৌষ-চৈত্র এবং ১৩০৮ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। পরে, হিতবাদী-কর্তৃক প্রচারিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে (১৩১১) 'রঙ্গচিত্র' বিভাগে স্থান পায়। অতঃপর, উহা 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে ইণ্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থাবলীর অষ্টম ভাগ রূপে

(১৩১৪) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করিয়া, কোনো কোনো অংশ নূতন যোগ করিয়া, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩৩১ সালের চৈত্রে বা পরবর্তী বৈশাখে 'চিরকুমারসভা' নাম দিয়াই যে নাটক লিখিয়া দেন তাহা ১৩৩২ সালে বহুদিন ধরিয়া (প্রথম অভিনয় : ২ শ্রাবণ ১৩৩২) সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত সমুদয় সংস্করণ দেখিয়াই গানগুলির সংকলন।

৭৯৬।৮২ মনোমন্দিরসুন্দরী ॥ ইহাও 'চিরকুমারসভা'য় অক্ষয়কুমারের গান। ১৩২১ সালের 'গান' অবধি ইহার যে রূপ ছিল তাহাতে কতকগুলি নূতন ছত্র যোগ করিয়া বর্তমান পাঠটি ১৩২৭ সালে 'গান' গ্রন্থের নূতন সংস্করণে মুদ্রিত হয়। প্রচলিত 'চিরকুমারসভা'তেও এই পাঠই আছে।

৭৯৭।৮৩ 'শিশু' কাব্যে (কাব্যগ্রন্থ : দশম ভাগ : ১৩১০) যে কবিতা আছে এই রচনা তাহারই সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৩৩৮ সালের 'গীতোৎসব' (২৮, ২৯, ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন) উপলক্ষ্যে কবি ইহাতে সুর দেন ও বালক নটের নৃত্য-সহযোগে তাহারই রূপ দেন।

৭৯৭।৮৪ শারদোৎসব (১৩১৫) হইতে সংকলিত।

৭৯৮। ৮৫, ৮৬, ৮৮ ও ৮৯ সংখ্যা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক (১৩১৬) হইতে গৃহীত।

৭৯৮-৯৯। ৮৭ ও ৯০ -সংখ্যক গান 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'বৌঠাকুরানীর হাট'এর অঙ্গীভূত; যথাক্রমে ১২৮৮ মাঘ ও ১২৮৯ আশ্বিনে মুদ্রিত।

৭৯৯।৯১ 'বৌঠাকুরানীর হাট' হইতে গৃহীত।

এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য হইবে না যে, 'বৌঠাকুরানীর হাট' ১২৮৮ কার্তিক হইতে ১২৮৯ আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'তে মুদ্রিত হওয়ার পরে ওই বৎসরেই (১৮০৪ শক) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানি 'বৌঠাকুরানীর হাট' গল্পেরই বিষয়বস্তু লইয়া রচিত। উহার বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ

লিখিয়াছেন, 'মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতই হইয়াছে।'

পূর্বালোচিত 'রাজা বসন্ত রায়' (দ্রষ্টব্য টীকা ৭ পৃ ৯৭০) অন্যে প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাহা জনপ্রিয়ও হইয়াছিল; বহু বৎসর পরে উপন্যাসটির সার্থক রূপান্তর ঘটাইবার ইচ্ছার পিছনে সেই স্মৃতি এবং সমকালীন অন্য কারণও রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল।

৭৯৮-৯৯। ৮৬-৯১ সব গানই কবি উপন্যাস বা নাটকের অন্যতম পাত্র বসন্ত-রায়ের কণ্ঠে দিয়াছেন।

৭৯৯।৯২ 'রাজা' (পৌষ ১৩১৭) নাটক হইতে গৃহীত।

৮০০।৯৩ 'অচলায়তন' (প্রবাসী: আশ্বিন ১৩১৮) নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত। রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত ১২৫-সংখ্যক অচলায়তন পাণ্ডু-লিপিতে (রচনাশেষে তারিখ: '১৫ই আষাঢ় /১৩১৮/ শিলাইদা') যে গানটি বর্জনচিহ্নিত করিবার পরে এ গান লেখা হয় সেটি হইল—

আমরা কত দল গো কত দল!
তোমায় ঘিরে ফুটেছি গো শতদল!
আপন মনে নানা দিশি
ছড়িয়ে আছি দিবানিশি,
তবু একটিখানে আছে মোদের পরিমল
যেখানেতে পরশ কর করতল॥

৮০০।৯৪ শ্রীমতী সীতাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে (১৩৪৯/পৃ ৫৪-৫৫) পূর্বোক্ত অচলায়তন পাণ্ডুলিপি-ধৃত অথচ প্রবাসী পত্রে ও গ্রন্থে বর্জিত এই গানের বিষয় প্রথম উল্লেখ। পাণ্ডুলিপি দেখিয়া অভ্রান্ত পাঠ-নির্ণয় সম্ভবপর হওয়ায়, গানটি এখন গীতবিতানের যথোচিত স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। এই গান রবীন্দ্রসদনের আর-এক পাণ্ডুলিপিতেও পাওয়া যায়; কোনো পাণ্ডুলিপিতেই বর্জন-চিহ্নিত নয়; ইহার স্থান অচলায়তন নাটকে দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে।

৮০০।৯৫ 'ফাল্গুনী' (সবুজ পত্র : চৈত্র ১৩২১) হইতে সংকলিত।

৮০১।৯৬ 'চতুরঙ্গ' হইতে (সবুজ পত্র : পৌষ ১৩২১) সংকলিত।

৮০১-৮০২। ৯৭-১০০ সংখ্যা 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস হইতে। তন্মধ্যে ৯৭-৯৮ -সংখ্যক গান ১৩২২ সবুজ পত্রের কার্তিক সংখ্যায়, ৯৯-সংখ্যক অগ্রহায়ণে এবং ১০০-সংখ্যক পৌষে প্রথম প্রচার লাভ করে।

৮০২।১০১ 'মুক্তধারা'র এই গান 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের 'আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর' গানের রূপান্তর বলা যাইতে পারে।

৮০২।১০২ 'মুক্তধারা' (প্রবাসী : বৈশাখ ১৩২৯) নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান। এই চরিত্র 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও আছে।

৮০৩। ১০৩-১০৬ -সংখ্যক গান রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সংকলন করেন ; এগুলি 'রক্ত-করবী' নাটকের উদ্দেশে রচিত হইলেও নাটকে ব্যবহৃত হয় নাই। ১০৩-১০৪ -সংখ্যক গানে সুরের উল্লেখ ছিল। ১০৬-সংখ্যক রচনার সহিত তুলনীয় গান : আমার স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।

৮০৪।১০৭ 'রক্তকরবী' (প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৩১) হইতে।

৮০৪।১০৮ 'নটীর পূজা' (মাসিক বসুমতী : বৈশাখ ১৩৩৩) হইতে।

৮০৪।১০৯ এই গানটি সম্ভবতঃ 'নটীর পূজা' নাটকে ব্যবহারের উদ্দেশে রচিত হইয়াছিল। এ স্থলে প্রথমসংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ড (শ্রাবণ ১৩৩৯) হইতে গৃহীত।

৮০৫।১১০ তপতী (ভাদ্র ১৩৩৬) নাটকের উদ্দেশে রচিত হইলেও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনের দপ্তর হইতে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

৮০৫।১১১ 'গৃহপ্রবেশ' (প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৩২) হইতে।

৮০৫-৮০৬। ১১১-১১৪ -সংখ্যক গান 'শাপমোচন' (কলিকাতায় মহর্ষিভবনে প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়-কাল : ১৫ ও ১৬ পৌষ ১৩৩৮) নৃত্য-নাট্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। নৃত্য গীত ও কথকতার সম্মিলনে অনুষ্ঠিত কবির এই রচনা বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষ্যে

বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য দ্বাবিংশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে দ্রষ্টব্য।

৮০৫।১১২ রচনাকাল : ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ।

৮০৬।১১৩ রচনার স্থানকাল : পানাদুরা (সিংহল), ২৬ মে ১৯৩৪।

৮০৬।১১৪ 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ' —'উর্বশী' (২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২) কবিতার সংক্ষেপীকৃত ও পরিবর্তিত গীতরূপ। কবির জীবনকালে 'শাপমোচন'এর শেষ অভিনয় শান্তিনিকেতনে, ১৩৪৭ পৌষে। তদুদ্দেশে ১৩৪৭ অগ্রহায়ণে রচিত গানের এই পাঠ শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে, এবং সম্প্রতি প্রথম স্তবকটি শ্রীশান্তিদেব ঘোষ গ্রামোফোন রেকর্ডেও গাহিয়াছেন।

শাপমোচনের বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষে নিম্নলিখিত কথা-অংশগুলিতেও সুর দেওয়া হইয়াছিল—

রাজা। অ সু ন্দ রে র প র ম বে দ না য় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়ে, সেই করুণা কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি॥ ...

রাজা। এ ক দি ন স ই তে পা র বে, সইতে পারবে, তোমার আপনার দাক্ষিণ্যে, রসের দাক্ষিণ্যে॥ ...

রানী। তো মা র এ কী অ নু ক ম্পা অ সু ন্দ রে র তরে, তাহার অর্থ বুঝি নে। ওই শোনো, ওই শোনো উষার কোকিল ডাকে অন্ধকারের মধ্যে, তারে আলোর পরশ লাগে। তেমনি তোমার হোক-না প্রকাশ আমার দিনের মাঝে, আজি সূর্যোদয়ের কালে॥

—রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২। শাপমোচন ও গ্রন্থপরিচয়

৮০৬।১১৫ 'চার-অধ্যায়' (অগ্রহায়ণ ১৩৪১) গল্পে ইহার প্রথম দুটি ছত্র আছে। সমগ্র রচনাটি কবির অন্যতম পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। রচনা ১ অগস্ট ১৯৩৪ [১৬ শ্রাবণ ১৩৪১] তারিখে বা অব্যবহিত পূর্বে। দ্রষ্টব্য শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র,

সংখ্যা ২৮০ : দেশ : ১১ কার্তিক ১৩৬৮।

৮০৭।১১৬ 'বাঁশরী' (ভারতবর্ষ : কার্তিক-পৌষ ১৩৪০) নাটক হইতে।

৮০৭।১১৭ 'মুক্তির উপায়' (অলকা : আশ্বিন ১৩৪৫) নাটক হইতে।

৮০৭।১১৮ 'মুক্তির উপায়' হইতে। বলা উচিত, এই নাটক রবীন্দ্রনাথের ওই নামেরই ছোটো গল্পের নাট্যরূপ। লোকসংগীতের অনুকরণে রচিত এই গানটি গল্পেও ছিল (সাধনা : চৈত্র ১২৯৮)।

৮০৭-৮১০। ১১৯-১২৬ সংখ্যা। গল্পগুচ্ছের 'একটা আষাঢ়ে গল্প' (সাধনা : আষাঢ় ১২৯৯) নাট্যীকৃত হইয়া 'তাসের দেশ' রূপ লয় (ভাদ্র ১৩৪০)। এই গানগুলি উক্ত নাটকেরই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (মাঘ ১৩৪৫) হইতে সংকলিত।

৮১০-১২। ১২৭-১৩২ সংখ্যা। প্রচলিত 'ডাকঘর' নাটকে গান নাই। কবি ১৩৪৬ সালে কতকগুলি গান যোগ করিয়া ইহাকে নূতন রূপ দিতে প্রবৃত্ত হন। বর্তমান ছয়টি গান, তাহা ছাড়া—

৮৬৬।১৩ 'সমুখে শান্তিপারাবার' ডাকঘরের জন্য লেখা এরূপ জানা যায়।

বহুদিন মহলা চলিয়াছিল ; গানগুলি অধিকাংশই ঠাকুর্দার ভূমিকায় কবি নিজে গাহিতেন। কবির ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপর অধিক পীড়নের আশঙ্কায়, শেষ-পর্যন্ত তাঁহাকে এই 'ডাকঘর'-অভিনয়ের উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে— ১৯১৭ অক্টোবরে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' সদনে ডাকঘরের যে অভিনয় হয় তাহার প্রযোজনাতেও কয়েকটি গান ছিল। 'আমি চঞ্চল হে' 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' এবং 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' এই তিনটি গানের উল্লেখ দেখা যায় শ্রীমতী সীতাদেবী -প্রণীত 'পুণ্য-স্মৃতি' গ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৪৯/পৃ ২৫৮-৬০)। (শেষ দুটি গান রবীন্দ্র-নাথ গাহিয়াছিলেন এবং তিনি ঠাকুরদার ভূমিকাতে নামিয়াছিলেন এরূপ জানা যায়।) ১৯১৭ ডিসেম্বরের শেষে ও ১৯১৮ জানুয়ারির প্রথমে ডাকঘরের পুনরভিনয় হইয়াছিল মনে হয়। কারণ, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় ভারতের

জাতীয় মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হয়; জানা যায় ওই সময়ে লোকমান্য টিলক, শ্রীমতী বেসাণ্ট্, গান্ধীজি, মালবীয়জি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া একদিন বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে মুদ্রিত বা পরে পুনর্মুদ্রিত ৪ জানুয়ারি ১৯১৮ তারিখের ইংরেজি অনুষ্ঠানপত্রে জানা যায় যে, 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে' গানটি এই অভিনয়ে গাওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানপত্রে আরও জানি, ঠাকুরদাই (রবীন্দ্রনাথ) কখনো ভিক্ষুক কখনো প্রহরী আর কখনো ফকির সাজেন।

৮১৫-২৩। ১-১৬ সংখ্যা ॥ জাতীয় সংগীত ॥

৮১৫-১৬। ১ ও ২ সংখ্যা 'জাতীয় সংগীত' (১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থ হইতে সংকলিত। এই গান সম্পর্কে ১৩৪৬ সালের 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ (পৃ ৩১৫-১৭) ও কার্তিক (পৃ ১৫২-৫৩) সংখ্যায় মুদ্রিত 'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী' দ্রষ্টব্য। 'অয়ি বিষাদিনী বীণা' (২) ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে 'হিন্দুমেলা'য় পঠিত (অথবা গীত ?) হইয়াছিল, এরূপ অনুমিত হইয়াছে; দুর্গাদাস লাহিড়ী -কর্তৃক সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে (বঙ্গবাসী : আশ্বিন ১৩১২) ইহা রবীন্দ্রনাথের নামেই সুর তালের উল্লেখ -সহ মুদ্রিত আছে।

৮১৬-১৮। ৩-৬ -সংখ্যক গান 'রবিচ্ছায়া'য় মুদ্রিত। বিশেষ কথা এই—

৮১৮।৫ ইহা 'বীণাবাদিনী'তে মুদ্রিত (আশ্বিন ১৩০৫) পাঠ।

৮১৮।৭ 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' ১২৮৬ সালে (১৮০১ শকে) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম নাটক'এর দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম মুদ্রিত হয়। ১২৯২ শ্রাবণের বালক পত্রে (পৃ ১৭৮) ইহার রূপান্তরিত পুনর্মুদ্রণ; রচয়িতার উল্লেখ নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'র ১৩১২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্বরলিপি -সহ রবীন্দ্রনাথের রচনা-রূপে যখন ছাপা হয়, 'বন্দে মাতরম্' ধুয়াটি নূতন দেখা যায়। গীতবিতানে 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'র পাঠ অনুসৃত।

'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে যেখানে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলা' ও 'স্বাদেশিকের সভা'[৫] সম্বন্ধে লিখিয়াছেন সেখানে প্রসঙ্গক্রমে এই গানের প্রথম-দ্বিতীয় ছত্র উদ্‌ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্যগ্রন্থে এই গানটি এপর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই ; 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও রচয়িতা কে সে সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই। অথচ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যে 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটির প্রথম ছত্রেই ইহার ভাবের ও ভাষার আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আছে, দুটি গানের সুরও প্রায় অভিন্ন।

'ভারতী ও বালক' পত্রের ১২৯৬ কার্তিক-সংখ্যায়, ৩৬৫ পৃষ্ঠায়, 'স্নেহলতা' গল্পে[৬] 'সঞ্জীবনী' সভার মতোই একটি সভার বর্ণনায় এই গানটি আছে—

এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান
সহায় আছেন ধর্ম্ম কারে আর ভয়।

গীতবিতানে-সংকলিত রচনার সহিত ভাবে ও ভাষায় ইহার কতটা সাদৃশ্য তাহা ছাড়াও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত কাহিনী-অনুসারে এই গানটির রচয়িতা 'চারু এখন ষোড়শবর্ষীয়

---

[৫] ইহা স্বদেশভক্তদের একরূপ গুপ্তসভা ছিল। রাজনারায়ণ বসুও ইহার সভ্য ছিলেন ; 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' হইতে জানা যায় ইহার নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা' ; সভার সাংকেতিক ভাষায় বলা হইত 'হামচূপামূহাফ্'।

[৬] লেখিকা স্বর্ণকুমারীদেবী। পরবর্তীকালে 'স্নেহলতা' দুই খণ্ডে গ্রন্থ-আকারেও বাহির হয়।

বালক' অথচ বন্ধুপরিজনপ্রশংশিত কবি, তাহাকে 'গুপ্তসভার মেম্বর করিয়াছে— সেখানকার সে Poet Laureate', এবং 'যখন সকলে একসঙ্গে ইহা [সংকলিত গানটি] গাহিয়া উঠিল, চারুর আপনাকে সেক্‌স্‌পিয়ারের সমকক্ষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।' উল্লিখিত 'সঞ্জীবনী সভা'র সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ, সেই মণ্ডলীতে কবি হিসাবে তাঁহার সমাদর, তাঁহার তখনকার বয়স এবং কৈশোরোচিত উৎসাহ, এমন-কি 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত (স্বাদেশিকতা অধ্যায়ের শেষ অংশে) বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু আর তরুণ সকল সভ্য মিলিয়া সমবেত গান গাওয়ার দৃশ্য— স্নেহশীলা ভগিনী স্বর্ণকুমারীদেবী গল্পচ্ছলে প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও সবটারই একটি বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন দেখা যায়।

'রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়' (প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৪৯) গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি'।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সাক্ষ্যও অনুরূপ।[১]

৮১৯।৮ ১২৮৪ আশ্বিনের ভারতীতে মুদ্রিত ও 'রবিচ্ছায়া'য় সংকলিত।

৮১৯-২০। ৯-১১ -সংখ্যক রচনা 'গানের বহি'তে মুদ্রিত আছে।

৮২১।১২ 'কে এসে যায় ফিরে ফিরে' 'কল্পনা' হইতে; রচনা : ১৩০৪।

৮২১-২২। ১৩ ও ১৪ -সংখ্যক গান ১৩১০ সালের 'কাব্যগ্রন্থ' অষ্টম ভাগে প্রথম সংকলিত হয়।

৮২৩।১৫ 'ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না' 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'র ১৩১২ পৌষ সংখ্যায় স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত। তৎপূর্বে ইহা 'ভাণ্ডার' মাসিক পত্রের কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

৮২৩।১৬ 'আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে' কবির অন্যতম পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। রচনা : ২৪ আশ্বিন [১৩১২]।

৮২৭-৫৮। ১-৮৩ সংখ্যা ॥ পূজা ও প্রার্থনা।—

---

[১] রবীন্দ্রনাথের একটি গান : দেশ : ২৬ চৈত্র ১৩৫০/পৃ ২৫৭

৮২৭।১ শক ১৭৯৬ ফাল্গুনের (১২৮১) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে; তখন কবির বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎসর মাত্র। ইহা গুরু নানকের যে গানের প্রথমাংশের ভাষান্তর, তাহা পরে দেওয়া গেল ('ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে আরও বারো ছত্র দেখা যায়)—

জয়জয়ন্তী। তেওরা

গগনময় থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা-মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিলো, পবন চবঁরো করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
ক্যায়্সী আরতি হোবে ভবখণ্ডনা তেরী আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।[৮]

—ব্রহ্মসঙ্গীত

বাংলা গানের রচয়িতা সম্পর্কে পূর্বে নানা সংশয় থাকিলেও, কবির জীবদ্দশায় 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে লেখা হয়—
আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি' (দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এটি তাঁহার রচনা।

—শনিবারের চিঠি ১০।১৩৪৬।পৃ ৫৯০

৮২৭।২ 'প্রবাসী' (চৈত্র ১৩২০) হইতে। অমৃতসর-গুরুদরবারে-প্রচলিত ভজনের অনুস্মৃতি। মূল গান[৯] নিম্নে দেওয়া গেল—

সিন্ধুড়া। তেতালা

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর!
তেরো চরণপর সির নাবেঁ।
সেবক জনকে সেব সেব পর,
প্রেমী জনাঁকে প্রেম প্রেম পর,

---

৮ 'শতগান' গ্রন্থে ঈষৎ ভিন্ন পাঠ ও স্বরলিপি আছে। রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর গ্রন্থেও (১৩৭২/পৃ ১৯৪) সংকলন অনুরূপ।

৯ 'প্রবাসী'তে ঈষৎ ভিন্ন পাঠ আছে।

দুঃখী জনাঁকে বেদন বেদন,
সুখী জনাঁকে আনন্দ এ।
বনা-বনামেঁ সাঁবল সাঁবল,
গিরি-গিরিমেঁ উন্নিত উন্নিত,
সলিতা-সলিতা চঞ্চল চঞ্চল,
সাগর-সাগর গম্ভীর এ।
চন্দ্র সূরজ বরৈ নিরমল দীপা,
তেরো জগমন্দির উজার এ।

—ব্রহ্মসঙ্গীত

৮২৭-৩৯। ৩-৩৬ সংখ্যা 'রবিচ্ছায়া' হইতে সংকলিত। অধিকাংশই বাংলা ১২৮৭ সাল বা ১৮০২ শক (কবির বয়ঃক্রম ২০ বৎসর) হইতে নিম্ন-লিখিত ক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত—

৩-৬,১২	ফাল্গুন ১৮০২ শক
৭-১০	ফাল্গুন ১৮০৪
১১,১৩	জ্যৈষ্ঠ ১৮০৫
১৪-১৮	ফাল্গুন ১৮০৫
১৯-২০	জ্যৈষ্ঠ ১৮০৬
২১	ভাদ্র ১৮০৬
৩৬	কার্তিক ১৮০৬
২২-২৩ ও ২৬	অগ্রহায়ণ ১৮০৬
২৪-২৫ ও ২৭-৩৪	ফাল্গুন ১৮০৬
৩৫	বৈশাখ ১৮০৭

৮৪০-৪১। ৩৭-৩৮ সংখ্যা 'রাজর্ষি (১২৯৩) উপন্যাসে বালক ধ্রুবের গান। 'হরি তোমায় ডাকি' (৩৭) গানের 'বালক' পত্রে (ভাদ্র ১২৯২) প্রকাশিত বা 'রাজর্ষি'তে মুদ্রিত পাঠ ঈষৎ ভিন্ন; বহু ব্রহ্মসংগীতসংকলনে যে পাঠ দেখা যায় এ স্থলে তাহাই গৃহীত। 'আমায় ছজনায় মিলে' (৩৮) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ফাল্গুন ১৮০৮ শকে (১২৯৩) প্রকাশিত।

৮৪১-৪৫। ৩৯-৫৩ সংখ্যা। ৪৭-সংখ্যক গানটি গীতবিতানের প্রথম সংস্করণ হইতে। তদ্‌ব্যতীত সবই 'গানের বহি' গ্রন্থে মুদ্রিত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ—

৪১	ফাল্গুন ১৮০৭ শক
৪২-৪৩	চৈত্র ১৮০৭
৪৪-৪৫	বৈশাখ ১৮০৮
৪৬-৫১	ফাল্গুন ১৮০৮
৫২	ফাল্গুন ১৮০৯
৫৩	ফাল্গুন ১৮১৪

৮৪৫-৪৬। ৫৪-৫৬ 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে (১৩০৩) মুদ্রিত। শেষোক্ত গান (মহাবিশ্বে মহাকাশে ইত্যাদি) সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ইহা প্রচলিত গীতবিতান গ্রন্থের ১৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাঠান্তরের সহিত অবিরোধে ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থে বা ১৯০৮ ও ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের 'গান' গ্রন্থে মুদ্রিত ছিল ; পরবর্তী গীতসংকলনগুলি হইতে ভ্রষ্ট। ইহার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রচলিত চতুর্থখণ্ড স্বরবিতানে সংকলিত হইয়াছে।

৮৪৬।৫৭ স্বরলিপিযুক্ত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে ও 'বীণাবাদিনী'র ১৩০৫ ভাদ্র সংখ্যায় পাওয়া যায়।

৮৪৬-৫২। ৫৮-৬৯ -সংখ্যক রচনা 'কাব্যগ্রন্থ' (১৩১০) হইতে গৃহীত। ৬৩-৬৫ ও ৬৭-৬৯ -সংখ্যক গান আখর-বিহীন ভাবে গীতবিতান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেই মুদ্রিত আছে।

৮৫০।৬৭ 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে' গানের আখর-বিহীন পাঠ অন্যত্র সংকলিত। এই গানের প্রসঙ্গে কবি বলেন—

পূর্বেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে [মাঘ ১২৯৩] সকালে ও বিকালে

আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান— 'নয়ন্ তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতি-দাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-ক'টি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

—জীবনস্মৃতি। হিমালয়যাত্রা

৮৫৩।৭০ ইহা কবির কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই। 'সমালোচনী' পত্রিকায় প্রকাশ : মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৮।

৮৫৩।৭১ 'বসুধা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ : কার্তিক ১৩১২। রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপি-বিচারে মনে হয় ১৩১২ আশ্বিনেই রচিত।

৮৫৩।৭২ 'গীতাঞ্জলি' হইতে। রচনা : ২৬ আষাঢ় ১৩১৭।

৮৫৪।৭৩-৭৪ শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্যতম উৎসব-অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় : ২৫ বৈশাখ ১৩৩২। এ দুটি যে গান তাহা শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদারের সাক্ষ্যে ও সৌজন্যে জানা গিয়াছে। 'গীতালি'-অনুযায়ী রচনাকাল যথাক্রমে ১৬ এবং ২৫ আশ্বিন ১৩২১।

৮৫৫।৭৫ বাউল সুরের নির্দেশ -সহ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ইহার প্রকাশ : মাঘ ১৩২৪। 'গীতপঞ্চাশিকা'য় (আশ্বিন ১৩২৫) রচনাটি থাকিলেও স্বরলিপি নাই।

৮৫৫।৭৬ রবীন্দ্রনামাঙ্কিত গ্রন্থে এ রচনাটির প্রথম সাক্ষাৎ পাই 'নবগীতিকা'র (১৩২৯) দ্বিতীয় খণ্ডে।

৮৫৬।৭৭-৭৮ 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩২৯।

৮৫৭।৭৯ ১৩৩০ সনে 'বিসর্জন' অভিনয়ে গাওয়া হয়। স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র (বুলা) মহলানবিশের নিকট ইহার কথা ও সুর পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীমতী সাহানাদেবী এই গান টেপ্-রেকর্ডে গাহিয়াছেন; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে তাহার সহিতও মিলাইয়া দেখা হইয়াছে।

৮৫৭।৮০ ইহার নানারূপ পাঠ কাব্যে নাটকে অনুষ্ঠানপত্রে ও স্বরলিপি-গ্রন্থে মুদ্রিত। তন্মধ্যে দুই-একটি 'পাঠ' মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র। বর্তমান পাঠ সম্পূর্ণতঃ 'প্রবাহিণী' গ্রন্থের অনুরূপ। এই গান ১৩৩০ ভাদ্রে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ে গাওয়া হইয়াছিল।

৮৫৭।৮১-৮২ এই দুটি হিন্দীভাঙা গান 'আদর্শ'-সহ পাওয়া গিয়াছে শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার -সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে।

৮৫৮।৮৩ 'নবীন' গীতাভিনয়ের সমকালে (চৈত্র ১৩৩৭) রচিত এবং শ্রীমতী সাবিত্রীগোবিন্দের গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড্ রূপে প্রচারিত।

রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত একখণ্ড জীর্ণ কাগজে মূল-সহ পূর্বোক্ত গানের এক পূর্বপাঠ পাওয়া যায়। এক-পিঠ-সাদা ওই কাগজেই আর-এক অজ্ঞাতপূর্ব 'ভাঙা' গানের খসড়া রহিয়াছে; রবীন্দ্রনাথ যেভাবে লিখিয়াছেন মূল-সহ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল (জীর্ণ কাগজে কয়েকটি অক্ষর কেবল অনুমানগম্য এবং শেষ ছত্রের উকারও লুপ্ত)—

মনুয়া, য়ো জগমে
লীপ্টায়ো ॥ অন্ধকারে।
এ রোকয়ি নহী হা সহায়ো।
য়হ সংসার স্বপ্নকী মায়া
বিরসাভর ম ভুলায়ো
ব্রহ্মানন্দ ছোড় ভববন্ধন
মোক্ষদুয়ার আর পারয়ো ॥
পারাবারে

আনে জাগরণ মুগ্ধ চোখে
কেন সংশয়শঙ্কিত চিত্ত
মগন কেন অবসাদে
রুদ্ধ বদ্ধ কেন ভয়বন্ধনে
জীর্ণ [কেন] দুখশো[কে]

৮৬১-৬৮। ১-১৭ সংখ্যা॥ আনুষ্ঠানিক সংগীত॥

৮৬১।১ 'বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত'। ১২৯২ বৈশাখে প্রকাশিত 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থের সর্বশেষ গান।

৮৬১।২ 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাইতে ১৯ মাঘ ১৩০৯ বা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ তারিখে যে সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন করেন, তদুপলক্ষে রচিত। সম্প্রতি চিঠিপত্রের ষষ্ঠ খণ্ডে পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্র এবং আনুষঙ্গিক বিবরণ (পৃ ২৪৬) -সহ প্রচারিত হইয়াছে।

৮৬২।৩ মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন ইত্যাদি যে গান গীতবিতানের প্রথম খণ্ডে (স্বদেশ : ১৭ সংখ্যা) মুদ্রিত, তাহার বহু পাঠান্তরের মধ্যে এটিকে বিশিষ্ট বলা চলে। ১৯৪০ অগস্টে অক্‌স্‌ফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর' উপাধি দেওয়া হয়, তদুপলক্ষ্যে রচিত। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৮৬২-৬৩। ৪-৬ সংখ্যা 'রবিচ্ছায়া' হইতে সংকলিত। তন্মধ্যে 'জগতের পুরোহিত তুমি' (৪) গানটি রচনার বিশেষ উপলক্ষ্য ১৫ শ্রাবণ ১২৮৮ (২৯ জুলাই ১৮৮১) তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা লীলাবতীর বিবাহ। এই সময় রবীন্দ্রনাথ আরও যে দুইটি গান লিখিয়া দেন বলিয়া জানা যায় তাহা হইল 'দুই হৃদয়ের নদী' ও 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' —উভয় গানই গীতবিতান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'আনুষ্ঠানিক' অধ্যায়ে সংকলিত, সংখ্যা যথাক্রমে ৬ ও ৯। রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম খণ্ডে (১৩৭৭/পৃ ১৫১) লীলাবতী দেবীর দিনপঞ্জী উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে : 'নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরীমোহন দাস, অন্ধ

চুনীলাল ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত [পরে স্বামী বিবেকানন্দ] মহাশয়গণ সংগীত করিয়াছিলেন।... শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ...সংগীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।' রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতে (রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ) শেষোক্ত গানের পূর্বপাঠ পাওয়া যায় : মহাগুরু, ছুটি ছাত্র এসেছে তোমার ইত্যাদি।

৮৬৩-৬৪।৭-৮ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (বসু) এবং বাসন্তী মিত্র (চক্রবর্তী) এতদুভয়ের পরিণয়োপলক্ষ্যে রচিত, পরে 'ব্রহ্মসঙ্গীত'এ মুদ্রিত। শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তীর পত্রে এই দুই রচনা সম্পর্কে তথ্য জানা যায় ; ইহাও জানা গিয়াছে যে, রচনাদুটিতে কবি স্বয়ং সুর দেন নাই, তবে 'তাঁহার অসীম মঙ্গললোক হতে' (৮) রচনায় সাহানা সুর দেওয়া হয় এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন॥

৮৬৪-৬৫। ৯-১১ সংখ্যা। কবি শান্তিনিকেতন-আশ্রমে পৌত্রী 'কল্যাণীয়া নন্দিনী'র পরিণয় (১৪ পৌষ ১৩৪৬) উপলক্ষ্যে এই তিনটি গান রচনা করেন। 'প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি' (১০) রচনাটির পূর্বতন পাঠ ছিল 'দুজনের মিলনের সত্যসাক্ষী যিনি' ইত্যাদি এবং পরবর্তী 'জীবনের সব কর্ম' স্থলে ছিল 'তোমাদের সব কর্ম'।

৮৬৫।১২ ১২৯৩ সালে 'কড়ি ও কোমল'এ মুদ্রিত (উত্তরকালে 'শিশু' কাব্যে সংকলিত), 'আশীর্বাদ' কবিতার সূচনাংশ এবং শেষ স্তবক মিলাইয়া এই গানটি ঠিক কোন্ সময়ে রচিত জানা যায় না। তবে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' -কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত'এ সুর-তালের উল্লেখ-সহ বহু বৎসর ধরিয়া (১৩১১ মাঘে প্রকাশিত অষ্টম সংস্করণ দেখা হইয়াছে) মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। কবি স্বয়ং ইহার সুরকার কিনা তাহা জানা যায় না কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় বিশিষ্ট গ্রন্থে বহুলভাবে প্রচারিত হওয়ায় মনে করা অন্যায় হইবে না যে, অন্ততপক্ষে তাঁহার অনুমোদন ছিল। আকর-কবিতার মূল ছত্রগুলি হইতে দু-এক স্থানে সামান্য পাঠান্তর দেখা যায়।

৮৬৬।১৩ ইহার রচনা ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে নবপরিকল্পিত 'ডাকঘর' নাটকের শেষ দৃশ্যে 'সুপ্ত' অমলের শিয়রে ঠাকুরদার গান -রূপে। উল্লিখিত নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হইতে পারে নাই। শুনা যায় কবি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, গানটি তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বে যেন প্রচারিত না হয়; তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে ইহা প্রথম সাধারণসমক্ষে গীত হয়। উল্লিখিত 'ডাকঘর' নাটকের অন্য গান-গুলি এই গ্রন্থের ৮১০-১২ পৃষ্ঠায় (সংখ্যা ১২৭-১৩২) মুদ্রিত।

৮৬৬।১৪ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে খ্রীস্টদিবসের উদ্‌যাপন-উদ্দেশে রচিত, 'প্রবাসী'র ১৩৪৬ মাঘ-সংখ্যায় 'বড়দিন' শিরোনামে মুদ্রিত।

৮৬৭।১৫ 'অন্ধদের দুঃখলাঘব শিবির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে' কলিকাতায় ২ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখে রচিত। 'প্রবাসী'র ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ২৭০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় সম্পাদকীয় মন্তব্যটি দ্রষ্টব্য।

৮৬৭।১৬ 'সৌম্য আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে··· তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।' কবির এবংবিধ উক্তি হইতে জানিতে পারি, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে কবি মানব-সাধারণের অভ্যুত্থান সম্পর্কেই এইটি রচনা করেন ১ বৈশাখ ১৩৪৮ তারিখে। এই রচনা সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য এবং পাঠান্তর শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' (প্রচলিত সংস্করণ) গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

৮৬৮।১৭ 'হে নূতন' গান সম্পর্কে পূর্বোক্ত গ্রন্থে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন, 'এই তাঁর জীবনের সর্বশেষ গান।' কবি বহুদিন পূর্বে (২৫ বৈশাখ ১৩২৯) যে কবিতা (পঁচিশে বৈশাখ : পূরবী) লিখিয়াছিলেন তাহারই শেষ দিকের কতকগুলি ছত্র লইয়া, একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া, ইহার রচনা ও সুরযোজনা বাংলা ১৩৪৮ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে; কবির পরবর্তী জন্মোৎসবে গাওয়া হয়।

৮৭১-৯১২। ১-১০১ সংখ্যা। প্রেম ও প্রকৃতি।

৮৭২-৭৫। ৫-১১ সংখ্যা 'শৈশবসঙ্গীত' (১২৯১) কাব্যে মুদ্রিত। তন্মধ্যে—

৮৭৩।৬ 'ফুলবালা'র অন্তর্গত 'গান'

৮৭৩-৭৪। ৭-৮ 'ভগ্নতরী'র অন্তর্গত 'গান' এবং

৮৭৫।১১ 'অপ্সরাপ্রেম'এর অন্তর্গত 'গান'। শেষোক্ত গাথায় ধৃত সুদীর্ঘ 'গীত' 'কেন গো এমন চপল' ইত্যাদি গীতবিতানে সংকলন করা হয় নাই।

৮৭১-৮৮। ১-৬ এবং ৮-৪৪ -সংখ্যক গানগুলি 'রবিচ্ছায়া' (বৈশাখ ১২৯২) গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

কবি এই গ্রন্থের নামকরণে বা 'নিবেদন' উপলক্ষ্যে 'শৈশব-সঙ্গীত' অথবা 'বাল্যলীলা' (দ্রষ্টব্য টীকা ১/পৃ ৯৬৩) বলিয়া এই সময়ের গানগুলির প্রকাশে বিশেষ সংকোচ দেখাইয়াছেন। ইহার মধ্যে যেগুলি প্রেমের গান তাহাতে আবার প্রায়শই একটি 'নাটকীয়তা'ও দেখা যায়। এখানে সংকলিত প্রথম ও দ্বিতীয় গান ইংরেজির অনুবাদ এবং ২৯-সংখ্যক গান একটি গাথায় ব্যবহৃত হওয়াতে, তাহার কারণও বুঝা যায়; অন্যগুলি যে ঐরূপ কেন তাহা আজও গবেষকগণের অনুসন্ধান-সাপেক্ষ বলা চলে।

তথাপি এটুকু বলিতে বাধা নাই যে— 'মানসী' কাব্যে 'ভুলে' 'ভুল-ভাঙা' 'নারীর উক্তি' 'পুরুষের উক্তি' এবং আরো বহু কবিতায় মধুরভাবের সূক্ষ্ম-ঘাত-প্রতিঘাত-ময় যে বিচিত্র প্রকাশ রসোত্তীর্ণ এবং পরম রমণীয়তায় উদ্ভাসিত, তাহারই পূর্বাভাস 'শৈশবসঙ্গীত' ও 'রবিচ্ছায়া'র 'প্রেমের গান'গুলিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বস্তুতই উজ্জ্বলরসোপেত গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, সেরূপ বিশেষ একটি গুচ্ছ পূর্ববর্তী ৭৭৮-৮৩ পৃষ্ঠায় (গীতসংখ্যা ২৭-৩৪ ও ৩৬-৪৫) সংকলিত হইয়াছে।

৮৭১-৭৫। ১-১১ সংখ্যার মধ্যে যেগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত দেখা যায় মাস ও বর্ষ উল্লেখ -পূর্বক তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

৮৭১।১ ভারতী : কার্তিক ১২৮৬। ইহা Thomas Moore'এর *Irish Melodies* গ্রন্থের Love's Young Dream কবিতার পর-পৃষ্ঠায়-সংকলিত প্রথম ও শেষ স্তবকের অনুবাদ—

Oh ! the days are gone, when beauty bright
my heart's chain wove ;
when my dream of life, from morn till night
was love, still love.
New hope may bloom,
and days may come
of milder calmer beam,
but there's nothing half so sweet in life
as love's young dream.
No, there's nothing half so sweet in life
as love's young dream.

...

No,— that hallow'd form is ne'er forgot
which first love trac'd ;
still it lingering haunts the greenest spot
on memory's waste.
'Twas odour fled
as soon as shed ;
'twas morning's winged dream ;
'twas a light that ne'er can shine again
on life's dull stream :
Oh ! 'twas light that ne'er can shine again
on life's dull stream.

৮৭১।২ ভারতী : কার্তিক ১২৮৬। ওয়েল্‌স্‌'এর কবি Talhaiarn'এর ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

৮৭২।৩ ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৮। 'গানের বহি'র সংক্ষিপ্ত পাঠ গৃহীত।

৮৭২।৪ ভারতী : ভাদ্র ১২৯১।

৮৭২।৫ ভারতী : অগ্রহায়ণ ১২৮৭।

৮৭৩।৬ ভারতী : কার্তিক ১২৮৫।

৮৭৩-৭৪।৭-৮ ভারতী : আষাঢ় ১২৮৬।

৮৭৫।১০ ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৬।

৮৭৫।১১ ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৫।

৮৮৩।২৯ ভারতী : চৈত্র ১২৮৬/পৃ ৫৫৫ : গাথা (খড়্গ-পরিণয়) -শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতার অন্তর্গত। স্বর্ণকুমারীদেবীর উক্ত কবিতা তাঁহার 'গাথা' কাব্যে সংকলন-কালে মূল কবিতায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পূর্বক গানটি বর্জিত হইয়াছে।

৮৮৯।৪৫-৪৬ বাংলা ১৩০০ বৈশাখের 'গানের বহি'তে মুদ্রিত।

৮৯০।৪৭-৪৮ 'স্বরলিপি-গীতিমালা' (১৩০৪ সাল) হইতে সংকলিত। প্রথমোক্ত গানটি পরবর্তী 'গান' (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থেও দেখা যায়। অন্য গানটি (৪৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুপুরাতন ১২৮৮ সালের 'স্বপ্নময়ী' নাটকেও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বহু গান ওই নাটকের অঙ্গীভূত রহিয়াছে।

৮৯০।৪৯ এই রচনা মূলতঃ 'মানসী' কাব্যের অন্তর্গত ; রচনাকাল : আষাঢ় ১২৯৪। ১৩২৬ পৌষের 'কাব্যগীতি'তে ইহার স্বরলিপি মুদ্রিত।

৮৯১।৫০ 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা'র মহলা উপলক্ষে, 'জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত' (পৃ ৬৫৬ ও ৯১৬) গানটিতে বহুবিধ পরিবর্তন করিয়া বর্তমান গানটির রচনা হয় ১৩৪৫ সালে। উক্ত নৃত্যনাট্যের কবি-কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত যে পরবর্তী পাঠ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে গৃহীত হয় নাই।

৮৯২।৫১ বর্তমান গানটি রচনার উপলক্ষ্যও একই। আরম্ভের চারিটি ছত্র লইয়াই গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান (পৃ ৬৭৩)— শেষ চার ছত্র সম্পূর্ণ নূতন। নৃত্যনাট্যের পরবর্তী পাঠ হইতে পুরা গানটি কবি-কর্তৃক বর্জিত হইয়াছে।

৮৯২।৫২ মূলতঃ 'সোনার তরী'র অন্তর্গত ; রচনা : ১২ আষাঢ় ১৩০০। মূল কবিতার কেবল প্রথম ও শেষ স্তবক লইয়া রচিত এই পাঠ সংশোধিত 'গান' (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৮৯৩।৫৩ ১৩০৩ আশ্বিনের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত; রচনা: ১৩ জ্যৈষ্ঠ [১৩০১]

৮৯৩-৯৪। ৫৪-৫৫ -সংখ্যক এই দুটি গান ইন্দিরাদেবীর 'গানের বহি'তে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে। 'বৃথা গেয়েছি বহু গান' (৫৫) অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতেও স্বরের উল্লেখ -সহ পাওয়া যায়।

৮৯৪।৫৬ 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' গানটির বর্তমান পাঠ 'বীণাবাদিনী'র ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে সংকলিত; ইহা 'কল্পনা'য় ও 'গীত-বিতান'এর পূর্ববর্তী 'প্রেম' অধ্যায়ে মুদ্রিত পাঠ হইতে বহুশঃ ভিন্ন। ইন্দিরাদেবীর 'গানের বহি'তে কবির হস্তাক্ষরে এই পাঠই দেখা যায়; রচনাকাল: ৯ আশ্বিন ১৩০৪।

৮৯৪।৫৭ 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল' গানের রচনাকাল: ১০ আশ্বিন ১৩০৪। 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'য় ১৩১২ শ্রাবণে প্রকাশিত এবং পরে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের 'গান'এ সংকলিত।

৮৯৫।৫৮ ইন্দিরাদেবীর 'গানের বহি'তে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়; ১০ আশ্বিন ১৩০৪ তারিখে রচিত। ওই বৎসরেই কার্তিক-সংখ্যা 'বীণাবাদিনী'তে কথা ও স্বরলিপি প্রকাশিত।

৮৯৫।৫৯ ইহা 'কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ' (পৃ ৭৯৫) গানের পাঠান্তর; 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' হইতে সংকলিত। ১৩১০ সালের 'কাব্যগ্রন্থ' অষ্টম ভাগেও দেখা যায়।

৮৯৬।৬০ বাংলা ১৩১৬ বৈশাখে 'বিজ্ঞাপিত' প্রায়শ্চিত্ত নাটকের একটি গানের (দ্রষ্টব্য পৃ ৫৭১/সংখ্যা ৬৪) এই পাঠভেদ ১৩২৯ বৈশাখে প্রকাশিত 'মুক্তধারা'য় পাওয়া যায়।

৮৯৬।৬১ 'অচলায়তন' (প্রথম প্রকাশ: প্রবাসী: ১৩১৮ আশ্বিন) গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

৮৯৬।৬২ আদৌ 'খেয়া' কাব্যে সংকলিত; রচনা: ২৪ মাঘ ১৩১২।

৮৯৭।৬৩ 'বলাকা'য় সংকলিত কবিতার পাঠান্তর; মূল কবিতার রচনা: ৭ কার্তিক ১৩২২।

৮৯৭।৬৪ ভাসে (গান) —এই শিরোনামে বাংলা ১৩২৯ ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে

প্রকাশিত। রচনা : ৩১ আষাঢ় [১৩২৯]

৮৯৭।৬৫ 'অনেক দিনের মনের মানুষ' (দ্বিতীয়খণ্ড নবগীতিকা : ১৩২৯) গানের এই রূপান্তরিত পাঠ 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা'র পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। নৃত্যনাট্য হইতে পরে বাদ দেওয়া হয়।

৮৯৮।৬৬ 'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে' (রচনা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) গানের এই অভিনব পাঠ ১৩৩১ ফাল্গুনে 'নবীন'এর অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত হয়।

৮৯৮।৬৭ ইহার রচনা : ২৪ চৈত্র ১৩২৯। গীতবিতানের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাঠের আথর-ওয়ালা রূপান্তর। দ্বিতীয়খণ্ড স্বরবিতানের প্রচল সংস্করণে দুটি গানেরই স্বরলিপি পাওয়া যাইবে।

৮৯৯।৬৮ পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। ১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্রের মধ্যেই রচিত মনে হয়। ইহার সুর 'পিয়া বিদেশ গয়ে' এরূপ একটি হিন্দি গানের অনুরূপ এই অনুমান করা হয়।

৮৯৯-৯০০। ৬৯-৭১ সংখ্যা। 'প্রবাহিণী' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) হইতে গৃহীত। 'অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে' গানটি (৭০) তৎপূর্বেই 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা'য় প্রচারিত হইয়াছিল।

৯০০।৭২ প্রথমসংস্করণ 'গীতবিতান' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড (১৩৩৯) হইতে সংকলিত। রচনা : ফাল্গুন ১৩৩২।

৯০১।৭৩ সুরেন্দ্রনাথ করের সৌজন্যে প্রাপ্ত অন্যতম রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। আনুমানিক রচনাকাল : ফাল্গুন ১৩৩২।

৯০১।৭৪ প্রথমসংস্করণ 'গীতবিতান' গ্রন্থে মুদ্রিত ; রচনা : ফাল্গুন ১৩৩২। বর্তমান পাঠে, প্রকাশিত স্বরলিপির অনুসরণ করা হইয়াছে। কবি 'দালিয়া' ছোটো গল্পের আখ্যান লইয়া নাটক রচনা করার সংকল্প করিয়াছিলেন শুনা যায় ; ইহা তাহারই প্রস্তাবনা-গীত।

৯০২।৭৫ ১৩৩৪ আষাঢ়ের বিচিত্রায় প্রচারিত (পৃ ২০-২১) এবং বনবাণী-কাব্যের (১৩৩৮ আশ্বিন) নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা অধ্যায়ে সংকলিত 'বৈশাখ' কবিতার (ধ্যাননিমগ্ন নীরব নগ্ন ইত্যাদি) এই পূর্বরূপ তথা গীতরূপ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের একাধিক রবীন্দ্র-

পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান। ইহা যে গানই সে বিষয়ে সমকালীন দু-একজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন। রচনাকাল ফাল্গুন ১৩৩৩।

৯০২।৭৬ 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র অন্তর্গত এই গানটির যে পাঠ ১৩৩৪ আষাঢ়ের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত তাহাই অধিক প্রচলিত এবং এই গ্রন্থের ৫১৯ পৃষ্ঠায় (সংখ্যা ২৩৩) মুদ্রিত। মূলতঃ বসন্তের গান (রচনা: ১৯ ফাল্গুন ১৩৩৩), শরতের প্রসঙ্গে ব্যবহার করায় 'বনবাণী' কাব্যে, অর্থাৎ 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র সর্বশেষ পাঠে, যেমনটি দেখা যায় তাহাই এ স্থলে সংকলিত হইল।

৯০২।৭৭ 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র অঙ্গীভূত 'চঞ্চল' কবিতা: ওরে প্রজাপতি মায়া দিয়ে কে যে পরশ করিল তোরে ইত্যাদি। দিনেন্দ্রনাথ-কৃত ইহার যে গীতরূপ ১৩৪৫ বৈশাখের তৃতীয়খণ্ড স্বরবিতানে সংকলিত (পরে ১৩৫৪ আশ্বিনের দ্বিতীয়খণ্ড গীতবিতানে), কবিতা হিসাবে তাহার ছন্দ পৃথক্, ভাষাতেও বহু পরিবর্তন। অল্পকালের মধ্যেই কবিতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এ রচনায় আরও বহুবার বহু পরিবর্তন করিলেও (বিভিন্ন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে ৮।৯টি রূপের কম নয়), বর্তমান সংকলনের বিশেষ গুরুত্ব নানা কারণে। প্রথমতঃ ইহা মূল কবিতার কেবল ভিন্ন ছন্দে লেখা ভিন্ন রূপই নয়, একেবারে রূপান্তর বা জন্মান্তর। দ্বিতীয়তঃ ইহা যে গান তাহাও জানি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতে (দেশ: ২৮ মাঘ ১৩৬৭/পৃ ৯৯): 'নিম্নলিখিত গানটি পুরাতনের নবীকরণ।' স্মরণ করা যাইতে পারে মূল রচনা ১৩৩৩ সনের ২৭ ফাল্গুনে এবং ওই চিঠি (সম্ভবতঃ গানটিও) লেখা হয় ৩০ অগস্ট্ ১৯২৮ (১৪ ভাদ্র ১৩৩৫) তারিখে। চিঠিতে লিখিয়া পাঠানোর পরেও গানটিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়; শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সেই পরবর্তী পাঠই এ স্থলে গৃহীত।

৯০৩।৭৮ 'এবার বুঝি ভোলার বেলা হল' গানটি ১৩৩৬ চৈত্রের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত; রচনা: ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০। ভাষা ও ভাবের দিক

দিয়া অন্যত্র মুদ্রিত 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে' গানের সহিত তুলনীয়।

৯০৪।৭৯ হিন্দি আদর্শ ও স্বরলিপি -সহ ১৩৬৪ বৈশাখ-আষাঢ়ের বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত। সম্ভবতঃ ১৩৩৮ সালে রচনা করিয়া, কবি স্বয়ং ইহা শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরকে শিখাইয়াছিলেন ; তাঁহারই সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।

৯০৪।৮০ নবীন (ফাল্গুন ১৩৩৭) গীতিনাট্যের বহুখ্যাত গানের এই রূপান্তর ১৩৪১ শ্রাবণে প্রকাশিত 'শ্রাবণগাথা'র অঙ্গীভূত।

৯০৪।৮১ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে জানা যায় : ইহার রচনা ১৩৩৮ বৈশাখের প্রথম দিকে।

৯০৫। ৮২-৮৩ সংখ্যা। মধু বসুর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' ছোটো গল্পটি নাট্যীকৃত হইয়া ১৯৩৩ সনের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতায় 'এম্পায়ার থিয়েটার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহারই সৌজন্যে দেখিবার সুযোগ হইয়াছে যে, উক্ত নাট্যের যে পাঠ রচিত হইয়াছিল তাহাতে কবি স্বহস্তে বহু পরিবর্তন করেন এবং সূচনায় এই রচনা দুটি লিখিয়া দেন। 'ওগো জলের রানী' (৭৪) গানটির সহিত 'ও জলের রানী'র (৮২) সাদৃশ্য নাই ; ইহার সূচনায় কবি এরূপ সুর দেন—

সা -া -া । রা গা -া । রগা রসা -া
ও ॰ ॰ জ লে র্ রা॰ নী॰ ॰

৯০৫।৮৪ প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠের 'সন্দেশ' মাসিক পত্রে ; পরে ইহা 'বিচিত্রিতা' (শ্রাবণ ১৩৪০) গ্রন্থে সংকলিত। বাউল সুরের গান। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ৩ অগস্ট্ ১৯৫৭ তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন : 'কবি যখন এই কবিতায় সুর দেন তখন 'সুটুদি' (শ্রীমতী রমা মজুমদার বা কর / মৃত্যু : মাঘ ১৩৪১) ছিলেন, তাঁকেও শিখিয়েছিলেন।'

৯০৬।৮৫-৮৬ ১৩৪২ সালের শ্রাবণে উদ্‌যাপিত বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানপত্র হইতে সংকলিত। এই দুটি গানেরই পাঠান্তর 'বীথিকা' (ভাদ্র ১৩৪২)

কাব্যে এবং গীতবিতান গ্রন্থের পূর্বতন ভাগে ৪৭১ এবং ২৮৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে।

৯০৭।৮৭ 'বীথিকা'য় মুদ্রিত এই গানের রচনা : ২৮ শ্রাবণ ১৩৪২। শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে কবির পরম স্নেহভাজন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহসা মৃত্যু হয়। স্বভাবতই মনে হয় যে, সেই 'সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী' পরমাত্মীয়ের অশ্রুগূঢ় স্মৃতি ১৩৪২ বর্ষামঙ্গলের এই রচনায় মিলিয়া মিশিয়া আছে।

৯০৭।৮৮ ১৩৪২ শ্রাবণে বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানপত্রে প্রথম প্রচারিত। পূর্ববর্তী ৮৭-সংখ্যক রচনার সহিত তুলনীয়। বর্তমান পাঠে, মুদ্রিত স্বরলিপি অনুসৃত হইয়াছে।

৯০৮।৮৯ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। পত্রপুট কাব্যের পঞ্চম কবিতায় (২৫ অক্টোবর ১৯৩৫) ইহার সূচনার কয়েক ছত্র সংকলিত।

৯০৮।৯০ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত এই গান ১৩৪৩ সালের দোলপূর্ণিমায় রচিত।

৯০৮।৯১ মায়াবিনী বেশে বিদেশিনী কে সে ইত্যাদি যে রবীন্দ্র-লেখাঙ্কনের প্রতিচ্ছবি 'শনিবারের চিঠি'তে (১৩৪৮ চৈত্র / পৃ ৬৩৫), তাহাই অন্যে নকল করেন রবীন্দ্রসদনের ১৯১-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির '৩১' পৃষ্ঠায়। (এখানি মুখ্যতঃ সমসাময়িক নকলের খাতা।) রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে সূচনায় ও শেষের দিকে দুটি পদ বদল করিলে পাই পরিচিত গীতিকবিতা : উদাসিনী-বেশে ইত্যাদি। বর্তমান সংকলন আরও-পরে-রচিত গীতরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কবি স্বহস্তে এটি লেখেন পূর্বোক্ত খাতায় সামনের রচনারিক্ত '৩০' পৃষ্ঠায়। পূর্ব রচনার অথবা কবিতার (তখনও সুর হয়তো দেন নাই) নিখুঁত ছন্দোবন্ধন স্বেচ্ছায় শিথিল করিয়া এই নূতন গীতরূপের উৎপত্তি বা পরিপূর্তি। কাব্যছন্দের বাঁধাবাঁধি ভাঙিয়া এরূপ পরীক্ষা বা পরিবর্তন কবি পূর্বেও করিয়াছেন। কদাচিৎ আগের ও পরের উভয় রচনাতেই সুর দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-রাগরূপ হারাইয়া গিয়া থাকিলে, মুক্ত ছন্দের কবিতারূপেই ইহার সমাদর

হইবে। মূল রচনা শান্তিনিকেতনে ৮ ভাদ্র ১৩৪৫ তারিখে (২৫।৮।১৯৩৮)— মনে হয় এটির রচনা অল্পকাল পরে।

৯০৯। ৯২-৯৩ সংখ্যা। এই গান দুটি দ্বিতীয়সংস্করণ 'গীতবিতান'এর পরিশিষ্ট হইতে সংকলিত। আনুমানিক রচনাকাল : ভাদ্র ১৩৪৬। দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১২, পৃ ৯৭৩।

৯০৯ ও ৯১০। ৯৪ ও ৯৬ সংখ্যা। বাংলা ১৩৪৬ সালের ২৯ ও ২৮ চৈত্রে রচিত। রবীন্দ্র-সদনের পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।

৯১০।৯৫ ১৩৪৬ চৈত্রের এই রচনা 'সানাই' কাব্যের 'ভালোবাসা এসেছিল' (১৫ চৈত্র ১৩৪৬) কবিতার সহিত তুলনীয়।

৯১১।৯৭ ইহা ১৬ ভাদ্র ১৩৪৭ তারিখে রচিত ও পরবর্তী ১৮ভাদ্র তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত হয়।

৯১১।৯৮ পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। রচনা : ২০ ভাদ্র ১৩৪৭।

৮১০-৮১২। ১২৭-১৩২ সংখ্যা

৮৬৪-৬৭। ৯-১১ ও ১৩-১৫ সংখ্যা

৯০৯-৯১১। ৯৪-৯৮ সংখ্যা —সম্ভাবিত তৃতীয়সংস্করণ 'গীতবিতান'এ সংকলনের উদ্দেশে এই সতেরোটি গানের টাইপ-কপি, 'অপ্রকাশিত নূতন গান' এই পরিচয়ে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমানেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

৯১১।৯৯ ৩ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখের সকালে কলিকাতার বেতার-কেন্দ্র হইতে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। উহা শুনিয়া কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবি এই গানটি রচনা করিয়া শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরকে শিখাইয়া দেন। তাঁহারই সৌজন্যে মুদ্রিত পাঠ নির্ধারিত হইয়াছে। শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার আমাদিগকে এই গানের সন্ধান দেন।

এই বৎসর ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কালিম্পঙে কবি নিদারুণ ভাবে পীড়িত হইয়াছিলেন; কলিকাতায় আসিয়া রোগমুক্তির পর ৩০ অক্টোবর তারিখে একটি কবিতা রচনা করেন : একা ব'সে আছি হেথায় ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য রোগশয্যায়। 'যারা বিহান বেলায় গান এনেছিল আমার মনে' উক্ত রচনারই গীতরূপ বলা যায়।

৯১২। ১০০-১০১ সংখ্যা। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত এই রচনা-দুটি যে গানই, শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে তাহা জানা গিয়াছে। রচনা ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে। 'পাখি তোর সুর ভুলিস নে' গানটি পরে কবিতায় পরিবর্তিত হইয়া 'শেষ লেখা'র তৃতীয় কবিতা-রূপে মুদ্রিত আছে।— 'আমার হারিয়ে যাওয়া দিন' গানের একটি পাঠান্তর অন্যতম রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত হইল—

হারিয়ে যাওয়া দিন
আর কি খুঁজে পাব তারে—
অশ্রুসজল আকাশপারে
ছায়ায় হল লীন।
করুণ মুখচ্ছবি
বাদল-হাওয়ায় মেলে দিল
বিরহী ভৈরবী।
গহন বনচ্ছায়
অনেক কালের স্তব্ধবাণী
কাহার অপেক্ষায়
আছে বচনহীন॥

শান্তিনিকেতন
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। বিকাল

৯১৫-৩৪ পরিশিষ্ট ১॥ নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা॥ রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত ১৩৪৫ পৌষের একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ অন্যের হাতের নকল হইলেও রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে বহু বর্জন ও পরিবর্তন করিয়াছেন, বহু নূতন অংশ যোগ করিয়াছেন

দেখা যায়। পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মনে করিবার কারণ আছে যে, রচনা একরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত সাক্ষ্যে এরূপ জানা যায় যে, ১৩৪৫ অগ্রহায়ণে এই নৃত্যনাট্যের কল্পনা ও রচনা শুরু হয়; কিছুকাল মহলা চলিবার পর ওই বৎসরে দোলপূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীতযোগে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে ইহার অংশবিশেষ অভিনীত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যের অভিনয় কখনোই হয় নাই। পাণ্ডুলিপিতে প্রবেশ-প্রস্থান ইত্যাদি নাট্য-নির্দেশে যে যে স্থলে সংশয়ের অবকাশ আছে, বর্তমান মুদ্রণে সম্ভবপর নির্দেশ বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া গেল। পূর্বসংকলিত (পৃ ৬৫৫-৮২) গীতিনাট্যের সহিত বর্তমান নৃত্যনাট্যের তুলনা করিলে[১০] রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্পী -মানসের বিস্ময়কর পরিণতির কিছু আভাস পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। হয়তো ইহাও বুঝা যাইবে কেন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।'[১১]

৯৩০ 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী' এই গানটি 'আমি কারেও বুঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমারে' (পৃ ৬৭৬) গানের রূপান্তর; নূতন সৃষ্টিই বলা চলে। ইহাতে 'পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য' এ উক্তির অর্থ বুঝা যায়।

৯৩৫-৪৫ পরিশিষ্ট ২ ॥ পরিশোধ ॥ এই নৃত্যনাট্য ১৩৪৩ কার্তিকের 'প্রবাসী' হইতে সংকলিত। কবি-কর্তৃক লিখিত মুখবন্ধ (পৃ ৯৩৫) দ্রষ্টব্য।

---

[১০] দ্রষ্টব্য শ্রীকানাই সামন্ত -কর্তৃক আলোচনা: রূপসৃষ্টি: মায়ার খেলার রূপান্তর: তরুণের স্বপ্ন (চৈত্র ১৩৬৩), পৃ ৯৪২-৫৪ অথবা রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৩৬৮), পৃ ৩২০-৩০।

[১১] দ্রষ্টব্য ১৩ জুলাই ১৯৩৫ তারিখের পত্র: সুর ও সঙ্গতি। সংগীতচিন্তা (১৩৭৩) গ্রন্থে সংকলিত, দ্রষ্টব্য পৃ ১৭৯।

১৩৪৩ আশ্বিনে ইহার রচনা। ১৩৪৩ সালের ২৪ ও ২৫ কার্তিক তারিখে কলিকাতায় 'আশুতোষ হল'এ ইহার অভিনয়। এই রচনা পরে নানা ভাবে পরিবর্তিত হইয়া 'শ্যামা' (পৃ ৭৩৩-৫০) নৃত্যনাট্যে পরিণত হয়।

৯৪৭-৫১ পরিশিষ্ট ৩॥ প্রথমসংস্করণ গীতবিতান'এ 'বাদ-দেওয়া গানের তালিকা'য় (পরিশিষ্ট খ) কতকগুলি গান কবির 'স্বরচিত নহে' বলিয়া নির্দিষ্ট। তাহারই একাংশের বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের জ্ঞাতব্য-পঞ্জীতে (পৃ ৯৬৫-৬৯) দ্রষ্টব্য; অন্য অংশ এ স্থলে তৃতীয় পরিশিষ্টরূপে সংকলিত— এগুলি যে রবীন্দ্রনাথের রচিত নয়, এ সম্পর্কে প্রথমসংস্করণ 'গীতবিতান'এর উক্ত বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত অন্য মুদ্রিত ও নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অপর পক্ষে তৃতীয় ও সপ্তম ব্যতীত সব গান ১২৯২ সালের 'রবিচ্ছায়া'য়, তৃতীয় ও অষ্টম ব্যতীত সব গান ১৩০০ সালের 'গানের বহি'তে, এবং প্রথম হইতে নবম অবধি সব গানই ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের 'গান' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৩০৩ সালের 'কাব্যগ্রন্থাবলী' গ্রন্থে এক পাঁচ সাত আট ও নয় -সংখ্যক গান, এবং '১৩১০' সালে প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থ' অষ্টম ভাগে তিন পাঁচ ও সাত -সংখ্যক গান পাওয়া যায়। 'নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে' (৩) 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি'র চতুর্থ ভাগে এবং 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'য় (চৈত্র ১৩১৩) স্বরলিপি-সহ রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রচারিত। 'মা আমি তোর কী করেছি' (৪) গানটি 'ভারতী'তে 'বৌঠাকুরানীর হাট' গল্পের অঙ্গীভূত হইয়া ১২৮৯ আষাঢ়ে প্রথম প্রকাশিত; গ্রন্থের প্রথম-দ্বিতীয় সংস্করণেও মুদ্রিত। 'না সজনী, না, আমি জানি' (৯) 'স্বর-লিপি-গীতিমালা'য় রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৯৫২-৫৫ পরিশিষ্ট ৪॥ সংকলিত রচনাগুলি ইতঃপূর্বে রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত কোনো গ্রন্থে বা রচনায় পাওয়া যায় নাই।

৯৫২।১ এই রচনা স্বরলিপি-সহ 'বালক'এর ১২৯২ আষাঢ় সংখ্যায় ও পরে 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় মুদ্রিত; তৎপূর্বে দীর্ঘতর আকারে ১২৮৬

ভাদ্রের 'ভারতী'তে প্রকাশিত। একমাত্র 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় রচয়িতা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

কথা :—শ্রীজ্যো—
—শ্রীর

কিন্তু, সুরকারের উল্লেখ না থাকায় 'হিন্দিভাঙা' সুর বলিয়া মনে হয়। প্রথম প্রকাশের কাল (ওই সময়ের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হইতেছিল) এবং রচনাশৈলীর বিচারে ইহা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া অনুমান হয়। বর্তমান পাঠ 'স্বরলিপি-গীতিমালা'র অনুসারী।

৯৫২।২-৩ ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রচারিত 'মানময়ী' গীতিনাট্যের অঙ্গীভূত। ইন্দিরাদেবী-লিখিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত : ১৩৬৭/পৃ ২৭-২৮) দ্রষ্টব্য। এক সময়ে গান দুটি পড়িয়া শুনাইলে পর, রবীন্দ্রনাথ 'নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।' দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' : শনিবারের চিঠি : ফাল্গুন ১৩৪৬ / পৃ ৭৬১।

৯৫৩।৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' (১২৮৮) নাটক হইতে সংকলিত। ভাব ভাষা ছন্দের বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্রজীবনের বিশেষ অনুষঙ্গ বা স্মৃতি ছাড়া ইহা যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা সে সম্পর্কে অন্য প্রমাণ দুর্লভ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের গানের অজস্র ব্যবহার দেখা যায়। 'স্বপ্নময়ী'তে পাই—

	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
অনন্তসাগরমাঝে	৮৮৮
আঁধার শাখা উজল করি	৭৭১
আমি স্বপনে রয়েছি ভোর	৮৭৭
আয় তবে, সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি	৪১৪
কে যেতেছিস আয় রে হেথা	৮৯০
ক্ষমা করো মোরে সখী	৭৬৯
দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা	৪১৮
দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে	৮১৮

বল্ গোলাপ, মোরে বল্	৪২২
বলি গো সজনী, যেয়ো না, যেয়ো না	৮৮৭
বুঝেছি বুঝেছি, সখা, ভেঙেছে প্রণয়	৭৭৪
হাসি কেন নাই ও নয়নে	৮৭৮
হৃদয় মোর কোমল অতি	৮৭৬

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে 'দেলো সখি দে পরাইয়ে চুলে' গানটি রবীন্দ্রনাথের যদি বা হয়, 'মায়ার খেলা'র

'দেলো সখি, দে, পরাইয়ে গলে[১২] সাধের বকুলফুলহার।

আধফুট' জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি' ইত্যাদি

সুপরিচিত গান তবু নয়। উভয় গানের সাদৃশ্য উদ্ধৃত দুই ছত্রেই সীমাবদ্ধ। ইন্দিরাদেবীর অভিমত এই যে, স্বপ্নময়ী'র গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা, অথবা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর হইলেও হইতে পারে।

৯৫৪।৫ 'ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন' (৯৬৪ পৃষ্ঠায় 'আকর গ্রন্থ' -তালিকার তৃতীয়) গ্রন্থে এবং 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'এর 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত।

৯৫৫।৬ 'সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ'এর 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থ হইতে (মাঘ ১৩৩৮) সংকলিত। অন্যান্য নানা গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রচারিত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইহার প্রথম প্রকাশ (রচয়িতার নাম মুদ্রিত হয় নাই) ১৮০৮ শক বা বাংলা ১২৯৩ চৈত্রে।

[১২]'মায়ার খেলা' প্রথম সংস্করণের পাঠ। 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের স্বরলিপি-লিখনে এই পাঠই আছে। সম্পূর্ণ গানটির সম্পর্কে 'স্বরলিপি-গীতিমালা'র সংকেতে জানি রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের লেখায় স্পষ্টই পাই— 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

রবীন্দ্রসংগীতের যাঁহারা বিশেষ চর্চা করেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে, পূর্বপ্রচলিত বিলাতি বা বৈঠকি গানের অথবা লোকসংগীতের আত্মীকরণ এবং প্রথম জীবনের কিছু রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরসংযোজন—ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নামে প্রচারিত প্রায় সব গানের সুরস্রষ্টাও রবীন্দ্রনাথ। কৈশোরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্যে ও উৎসাহদানে কবি কী ভাবে গীতিরচনায় প্রবৃত্ত হন সে সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' হইতে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য 'জল্‌জল্‌ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে রচনা করেন তাহা পূর্বেই (পৃ ৯৮১) বলা হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথায় আরও জানিতে পারি—

সরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই, আমরা রবিকে প্রমোশন্‌ দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চাতে আমরা হইলাম তিনজন— অক্ষয় (চৌধুরী), রবি ও আমি।...... এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর-রচনা করিলাম, অমনি ইহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্ম্মা সিগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত, তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চুরুটের টুক্‌রাটি, সম্মুখে যাহা পাইতেন এমন কি পিয়ানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া "হয়েছে হয়েছে" বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে শুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য ক্বচিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টো। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।

স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন।

সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবা-রাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম রচনা "কালমৃগয়া"[১৩] গীতিনাট্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় রচনা "বাল্মীকি-প্রতিভা"[১৪] গীতিনাট্যেও উক্ত-রূপে আমার রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। পৃ. ১৫১, ১৫৫-৫৬

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে জানিতে পারি—

এই সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

—জীবনস্মৃতি। গীতচর্চা

---

[১৩] এক হিসাবে 'কালমৃগয়া' রবীন্দ্রনাথের 'সর্বপ্রথম' গীতিনাট্য হইতে পারে না। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র যে রূপ অধুনা অপ্রচলিত (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'অচলিত প্রথম খণ্ড') উহা 'কালমৃগয়া'র প্রায় দুই বৎসর পূর্বে রচিত বা অভিনীত হয়। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রচলিত দ্বিতীয় সংস্করণ অবশ্যই 'কালমৃগয়া'র পরবর্তী।

[১৪] 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (ফাল্গুন ১৩২৬) গ্রন্থে (পৃ ৩৩) অনুলেখক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (অবশ্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাক্যানুসারে) এরূপ লিখিতেছেন যে, 'বাল্মীকিপ্রতিভার প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতি-বাবুর সংযোজিত।' এ উক্তির সত্যতা-নির্ণয় কিঞ্চিৎ গবেষণা -সাপেক্ষ। সত্য হইলেও, সম্ভবতঃ এ উক্তির লক্ষ্য হইল বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্বর্তীকালীন 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের বহু নূতন 'গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে' গৃহীত— আর, 'কালমৃগয়া'তে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক বা স্বাধীন-স্বতন্ত্র সুরসৃষ্টির পর্ব ভালোভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এরূপ মনে করিবার সংগত কারণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় দেশী-বিলাতি উভয় প্রকার সংগীত লইয়া কী ভাবে পরীক্ষা চলিয়াছিল তাহা 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত হইয়াছে—

এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে— এই নাট্যে অনেক স্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি [পৃ ১০২৬ দ্রষ্টব্য]। বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা— অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে— ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র— স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।

আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল [১৬ ফাল্গুন ১২৮৭]—

ইহাই শেষবার। এই সম্মিলনী উপলক্ষেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল —বাল্মীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

—জীবনস্মৃতি। বাল্মীকিপ্রতিভা

উল্লিখিত সংগীতসৃষ্টিতে সকলে কিরূপ মাতিয়া উঠেন, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ছিল কতখানি, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্ত ভাবে দৌড় করাইবা মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম।··· এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীত-বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছ-বিচার নাই। আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারবার উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি— কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতিনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।

—জীবনস্মৃতি। বাল্মীকিপ্রতিভা

'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও' কালমৃগয়া'র সহিত 'মায়ার খেলা'র পার্থক্যের বিষয়ে কবি বলিয়াছেন—

মায়ার খেলা··· গীতনাট্য··· ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য

নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।

—জীবনস্মৃতি। বাল্মীকিপ্রতিভা

কবি নিজের সংগীতচর্চা ও সংগীতসৃষ্টি সম্পর্কে বহু কথা 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'তে বলিয়াছেন। সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে (সবুজপত্র : ভাদ্র ১৩২৪) এবং মাসিক পত্রিকাদিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অন্য প্রবন্ধে ও পত্ররাজিতে, তথা 'সুর ও সঙ্গতি' পুস্তকে নিবদ্ধ পত্রালাপেও, অনেকটা জানিতে পারা যাইবে। সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার বহু পুরাতন রচনা হিসাবে 'সঙ্গীত ও ভাব' (ভারতী : জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) উল্লেখ করা যাইতে পারে ; তবে, কবি-যে দীর্ঘ জীবনের সংগীতসাধনার পথে এই প্রবন্ধের ভাবনাধারা কালে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন তাহা 'জীবন-স্মৃতি'র 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে। রবীন্দ্রনাথের গান-সম্পর্কিত এই-সকল ও অন্যান্য রচনা, চিঠিপত্র, আলাপ, বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'সংগীত-চিন্তা' গ্রন্থে (বৈশাখ ১৩৭৩) প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাঁহার পরিণত অভিমতের এবং তাহার বিকাশেরও একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। সৃষ্টিতেই স্রষ্টার সব কথা নিঃশেষে নিহিত থাকিলেও, ভাষ্য-ব্যতীত বুদ্ধি দিয়া তাহা আয়ত্ত করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না ; এবং এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। যেমন 'বাল্মীকিপ্রতিভা' প্রভৃতি রচনায় বহু ক্ষেত্রে বিলাতি সুরের ব্যবহারের কথা 'জীবনস্মৃতি' হইতে জানা গেল, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য কোথায় জানিতে হইলেও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই উদ্ধারযোগ্য (ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্র-মন্তব্য তাঁহার আপন সৃষ্টি সম্পর্কেও সত্য সন্দেহ নাই)—

য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে এক দিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সংগীত রোমান্টিক। রোমান্টিক

বলিলে যে ঠিকটি কী বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু, মোটামুটি বলিতে গেলে রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক; তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোক-ছায়ার দ্বন্দ্ব-সম্পাতের দিক; আর-একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্তরেখায় অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস। যাহাই হউক, কথাটা পরিষ্কার না হইতে পারে, কিন্তু আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি ইহা রোমান্টিক— ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।

—জীবনস্মৃতি। বিলাতি সংগীত

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কোন্ কোন্ রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুর দিয়াছিলেন 'গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা'র সূচীপত্রে সংকেতে তাহা বিজ্ঞাপিত। তদনুসারে এবং 'স্বরলিপি-গীতিমালা' (১৩০৪) দেখিয়া যত দূর জানা যায়, নিম্নলিখিত রচনাবলীর সুরস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—

	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
অনেক দিয়েছ নাথ আমায়[১৫]	১৬৭
এত দিন পরে, সখী	৮৮২
এমন আর কত দিন চলে যাবে রে	৯৪৭
ওকি সখা, মুছ আঁখি	৮৮২
কে যেতেছিস আয় রে হেথা[১৬]	৮৯০
খুলে দে তরণী[১৬]	৮৭৭

১৫ 'শতগান'-অনুযায়ী সুরকার রবীন্দ্রনাথ। 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় নাই।

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গান ছাড়া 'গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা'য় প্রায় সাড়ে তিনশত গান আছে। ইহার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একুশ-বাইশটিতে সুর দিয়াছেন দেখা গেল। উক্ত গ্রন্থে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গানের সূচী না থাকাতে, উহার কোন্ গানের সুরকার কে বিস্তারিতভাবে তাহা জানা যায় না; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' হইতে সাধারণভাবে যাহা জানা যায় তাহা পূর্বেই সংকলিত হইয়াছে। 'গানের বহি'তে হিন্দিগান-বিশেষের রাগ-রাগিণীর অনুসরণে রচিত হইয়াছে এরূপ গানের সংখ্যা অনেক

১৬ 'গানের বহি'তে নাই।

বেশি ; 'গানের বহি'র সূচীপত্রের সংকেত এবং ইন্দিরাদেবীর সন্ধান[১৭] অনুযায়ী মোট ৯০।৯২টি হইবে মনে হয়। বলা উচিত, এই গণনায় অল্পসংখ্যক কানাড়ি, গুজরাটি, মাদ্রাজি, মহীশূরি ও পঞ্জাবি গান -ভাঙা রচনাও ধরা হইয়াছে ; 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গান ধরা হয় নাই।

আর-একটা কথাও উল্লেখযোগ্য যে, কালমৃগয়া (প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১২৮৯) ও দ্বিতীয়সংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা (প্রকাশ : ফাল্গুন ১২৯২) এই দুইখানি গীতিনাট্য সারা করিয়া কবি 'মায়ার খেলা'য় (প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১২৯৫) হাত দেন, স্বরলিপি-গীতিমালায় শেষোক্ত গ্রন্থের যতগুলি গান সংকলিত দেখা যায়, প্রায় সবেরই সুরকার রবীন্দ্রনাথ।

'গানের বহি'র পরবর্তী গ্রন্থসমূহেও 'হিন্দিভাঙা' গানের অসদ্ভাব নাই। সে-সব গান ও সেগুলির আদর্শস্বরূপ গানের বিশদ তালিকা ইন্দিরাদেবীর 'রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণীসংগম' পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য। পুরাতন 'গান ভাঙিয়া' নূতন গান রচনা করার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই অপরূপ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। অন্য সহস্রাধিক গানে যেমন এ-সকল ক্ষেত্রেও তেমনি আপনার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্রষ্টা রচনায় আপনার সীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। 'ভাঙা গান'ও বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে ইহা আমাদের অজানা নয়।

'কালমৃগয়া' ও 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র কতকগুলি গানে ইংরেজি স্কচ আইরিশ প্রভৃতি গানের সুর দেওয়া হইয়াছে। 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' অনুযায়ী তাহার তালিকা—

কালমৃগয়া	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে : The Vicar of Bray	৬১৭
[১৮] তুই আয় রে কাছে আয় : The British Grenadiers	৬১৭
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে : Ye banks and braes	৬১৯
মানা না মানিলি : Go where glory waits thee	৬২৩
সকলই ফুরালো : Robin Adair	৬৩৪

---

[১৭] রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম : পৌষ ১৩৬১

[১৮] গানের প্রথম ছত্র : ও ভাই, দেখে যা কত ফুল তুলেছি।

গীতবিতান। পৃষ্ঠা

মায়ার খেলা

আহা, আজি এ বসন্তে। Go where glory waits thee ৬৭৯

বাল্মীকিপ্রতিভা

তবে আয় সবে আয়। অজ্ঞাত ৬৩৭

কালী কালী বলো রে আজ। Nancy Lee ৬৩৮

মরি, ও কাহার বাছা। Go where glory waits thee ৬৩৯

অন্য গান

ওহে দয়াময়। Go where glory waits thee ৯৪৭

কতবার ভেবেছিনু। Drink to me only ৮৭৯

পুরানো সেই দিনের কথা। Auld Lang Syne ৮৮৫

লোকপ্রচলিত বা পুরাতন বাংলা গানের সুরেও কবি কতকগুলি গান বাঁধিয়াছেন ; সে সম্পর্কে জানিতে পারি—

এবার তোর মরা গাঙে। মন-মাঝি সামাল সামাল[১৯] ২৪৫

যদি তোর ডাক শুনে। হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে[১৯] ২৪৪

আমার সোনার বাংলা। আমি কোথায় পাব তারে[১৯+] ২৪৩

বেঁধেছ প্রেমের পাশে। চাঁচর চিকুর আধো[২০] ১৫৭

ক্ষমা করো আমায়— আমায়। জয় জয় ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ ৬৮৯

কাজেই যত দূর জানা যায়, বাংলা কতকগুলি পূর্বপ্রচলিত সংগীতের সুর, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বৈঠকি গানের সুর, অতি অল্পসংখ্যক বিলাতি গানের সুর এবং কবির তরুণ বয়সে কিছু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া সুর, ইহা

---

১৯ 'শতগান' গ্রন্থে স্বরলিপি দেওয়া আছে।

+ মূল বাউল সংগীতটি কবি শিলাইদহে গগন হরকরার নিকট পাইয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য : কথা ও স্বরলিপি : প্রবাসী : বৈশাখ ১৩২২/পৃ ১৫২-৫৪ এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ / পৃ ৩২৪।

২০ কাফিকানাড়া-কাওয়ালি। দ্রষ্টব্য : সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৪।১৩১১।২১৯

ব্যতীত— রবীন্দ্রসংগীতে কথাও যেমন সুরও তেমনি সর্বদাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। তবে—

কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত : 'কথা ও কাহিনী'র প্রথম প্রবেশকের অংশবিশেষ : শিশিরকুমার ভাদুড়ী -কর্তৃক প্রযোজিত ও অভিনীত 'সীতা' নাটকের সূচনায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই : 'শিশু' কাব্যের 'বিদায়' কবিতা

দিনের শেষে ঘুমের দেশে : 'খেয়া'র প্রথম কবিতা

পথের পথিক করেছ আমায় : উৎসর্গ

হে মোর দুর্ভাগা দেশ : গীতাঞ্জলি

এই গানগুলি সময়বিশেষে প্রচলিত বা আদৃত হইলেও, এগুলির কোনটিতেই কবি সুর না দেওয়াতে, এগুলিকে রবীন্দ্রসংগীত বলিয়া গণনা করা সম্ভবপর হয় নাই। অন্যের যে-সব রচনায় রবীন্দ্রনাথ সুর আরোপ করিয়াছেন[২১] সেগুলির

---

২১ এই প্রসঙ্গে 'গীতবিতান বার্ষিকী'তে (১৩৫০) মুদ্রিত শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

সুহাসচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, বাল্যকালে দেখিয়াছেন 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' যে বার মনোমোহন রায় -প্রণীত 'রিজিয়া' নাটকের অভিনয় করান তাহার রিহার্সালে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত আসিতেন এবং গানও শিখাইতেন; কয়েকটি গানের সুর নাকি কবি স্বয়ং রচনা করেন, 'থিয়েটারি' সুর হইতে সেই-সব সুরের বিশেষ পার্থক্য আছে। সুহাসবাবুর উক্তি, রিহার্সালের সাক্ষী ও শ্রোতা তাঁহার মাতুল শ্রীনিত্যরঞ্জন মল্লিক ও শ্রীসত্যরঞ্জন মল্লিক মহাশয়েরা সমর্থন করেন। 'রিজিয়া' নাটকের ব্রজবুলিতে রচিত একটি গানে (বধুয়া, সুধা ঢালয়ি পরাণে ইত্যাদি) কয়েক স্থলে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় এবং বাংলা ১৩১০ সনে প্রচারিত এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই এ যেমন বিজ্ঞাপিত হইতে দেখি যে 'বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রিজিয়া "ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ" কর্তৃক অভিনয়ার্থ মনোনীত হইয়াছে', দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তেমনি মহাসমারোহে ঐ প্রতিষ্ঠানে অভিনীত হওয়ার সংবাদও দেওয়া হইয়াছে।

তালিকা পরে দেওয়া গেল—

প্রথম ছত্র	রচয়িতা	স্বরলিপি
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর	বিদ্যাপতি	শতগান। স্বরবিতান ১১,২১
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি	গোবিন্দদাস	শতগান। স্বর ২১
বন্দে মাতরম্ (অংশ)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শতগান। স্বর ৪৬
মিলে সবে ভারতসন্তান[২২]	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শতগান
বুঝতে নারি নারী কী চায়	অক্ষয়কুমার বড়াল	শতগান
গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে	সুকুমার রায়	ঋতুপত্র : হেমন্ত। ১৩৬২
ওহে সুনির্মল সুন্দর উজ্জ্বল	হেমলতা দেবী	জ্যোতিঃ
বালক-প্রাণে আলোক জ্বালি	হেমলতা দেবী	জ্যোতিঃ

ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বেদমন্ত্রে ও বৌদ্ধ মন্ত্রে স্বর দেন[২৩]—

বৈদিক মন্ত্র	আকর	স্বরলিপি
য আত্মদা বলদা	ঋগ্বেদ	শতগান। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪
তমীশ্বরাণাং	শ্বেতাশ্বতর	আনন্দসঙ্গীত ৪।১৩২২।২। ব্র স্ব ২
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব	ঋগ্বেদ	ভারতী ও বালক ১০।১২৯৯।৫৮৮ আনন্দসঙ্গীত ১।১৩২২।১৩৮। ব্র স্ব ৩
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ	ঋগ্বেদ	আনন্দসঙ্গীত ৪।১৩২০।৬ তত্ত্ববোধিনী ৯।১৮৪৫।২৩৩। ব্র স্ব ৩
সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্	ঋগ্বেদ	
উষো বাজেন বাজিনি	ঋগ্বেদ (ভৈরবী)	
অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ	ঋগ্বেদ (চৌতাল)	হিন্দী বিশ্বভারতী পত্রিকা ৭-৯।১৯৪৬।৫২৫
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে	বৃহদারণ্যক	
ধীরা ত্বস্য মহিনা	ঋগ্বেদ	

[২২] ইন্দিরাদেবীর অভিমত : রবীন্দ্রনাথের স্বর নয়।

[২৩] দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা' —গীতবিতান বার্ষিকী (১৩৫০)। / ব্র স্ব বা ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ -প্রকাশিত নূতন গ্রন্থমালা।

'উদু ত্যং জাতবেদসম্' (ঋগ্বেদ), 'বায়ুরনিলমমৃতমথেদম্' (ঈশ), 'অত্তা দেবা উদিতা সূর্যস্য' (ঋগ্বেদ) এবং 'পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষম্' (অথর্ব বেদ) ইত্যাদি শ্লোকসমূহ[২৪] রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত, তবে রাগ-তালে গাওয়া হয় না, সুরে আবৃত্তি হয় মাত্র। বৌদ্ধমন্ত্রে সুর-যোজনার তালিকা—

বৌদ্ধ মন্ত্র	সুর
ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে[২৫]	ভৈরবী
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং[২৫]	কাফি
নত্থিমে শরণং[২৫]	মিশ্ররামকেলি
নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়[২৫]+	বেহাগ
বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো+	মিশ্ররামকেলি

কোন্ গান কবির প্রথম রচনা এ বিষয়ে রবীন্দ্রসংগীতরসিকের মনে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। 'শনিবারের চিঠি'র পূর্বসংকলিত সাক্ষ্যে 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' গানটি ১২৮১ সালের মধ্যেই রচিত। 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' পরবর্তী স্বাধীন রচনা, ১২৮২ সালের মধ্যে রচিত। 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' ১২৮৩ সালের মধ্যে। এগুলির কোনোটিতে কবি স্বয়ং সুর দিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে গানকে নিজের যথার্থ প্রথম রচনা বলিয়া স্বীকার করেন সে সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

এই শাহিবাগ প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাতটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের-সুর-দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।

—জীবনস্মৃতি। আমেদাবাদ

---

[২৪] 'তপতী' নাটকে [২৫] 'নটীর পূজা'য় + 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে প্রযুক্ত।

পুনশ্চ 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে—

শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাতটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন-খুশি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম— তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্ধৃত করিতেছি।

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!
ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো![২৩]

ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্র ছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ['রবিচ্ছায়া'] ছাপাইয়াছিলাম— কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে সেই সাবরমতী নদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর, কিছুই ছিল না। 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটা এমনি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুরে বসাইয়া গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম। 'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি' 'আঁধার শাখা উজল করি' প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।

—জীবনস্মৃতি (প্রচল সংস্করণ)। গ্রন্থপরিচয়

'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়' রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাধীন রচনা। এটি কবির প্রথম গীতিগ্রন্থ 'রবিচ্ছায়া'র প্রথম গান বটে (গীতবিতানে সংকলিত পাঠ), কিন্তু বলা যায় 'এ গান সে গান নয়' এবং 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় ইহার যে সুর লিপিবদ্ধ তাহাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, কবির উল্লিখিত 'নীরব রজনী দেখো' ও 'আঁধার শাখা উজল করি' গান দুটি 'ভগ্নহৃদয়' (১২৮৮ সাল) কাব্যে এবং 'বলি, ও আমার গোলাপবালা' ও 'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি' 'শৈশবসঙ্গীত' (১২৯১ সাল) কাব্যে প্রথম সংকলিত হয়। তাহা ছাড়া ১২৮৭ সালের 'ভারতী' পত্রে 'ভগ্নহৃদয়'এর প্রথম ছয়

---

[২৩] অব্যবহিত পরে অতিরিক্ত ৪ ছত্র 'ভগ্নহৃদয়' পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থে, তথা ভারতী পত্রে। রবিচ্ছায়ায় বর্জিত। রবীন্দ্র-সুর হারাইলেও, কথা হয়তো হারায় নাই।

সর্গের প্রকাশ, সেই সম্পর্কে মাঘে (পৃ ৪৭৬) 'আঁধার শাখা উজল করি' এবং ফাল্গুনে (পৃ ৫০৮) 'নীরব রজনী দেখো' মুদ্রিত হয়; 'ভারতী'তে 'বলি ও আমার গোলাপবালা'র প্রকাশ ১২৮৭ অগ্রহায়ণে। তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১২৮৫ সালের ৫ আশ্বিন তারিখে বিলাত-অভিমুখে যাত্রা করেন, উল্লিখিত গানগুলি তৎপূর্বেই রচিত।[২৭]

'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্‌ধৃত রচনায় রবীন্দ্রনাথ 'যেমন খুশি ভাঙা ছন্দে'র কথা বলিয়াছেন, এবং পরে 'ভদ্র ছন্দে' 'শুদ্ধি' করিয়া তাহা যে নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল এজন্য খেদও প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতায় বা গানে নব নব পথের সন্ধান, নব নব মুক্তির আস্বাদন, নূতন নূতন আঙ্গিকের পরীক্ষায় নিত্য নূতন সিদ্ধি -লাভ —এ প্রবণতা স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনে শুরু হইতে শেষ পর্যন্তই দেখা যায়। ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬ তারিখে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লেখেন, 'কখনো কখনো গদ্য রচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ?'[২৮] 'লিপিকা'য় কোনোদিন সুর দেওয়া হইয়াছিল কি না জানা নাই, 'শাপমোচন'এর বিভিন্ন অভিনয়ে কতকগুলি গদ্য অংশে সুর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত ও উদ্‌ধৃত হইয়াছে। উত্তরকালে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বা 'পুনশ্চ'-অনুগামী গদ্য ছন্দে গান রচনার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয় যে, তাহা 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র আলোচনায় বুঝা যায় এবং কবি নিজেও তাহা বলিয়া দিয়াছেন—'সমগ্র চণ্ডালিকা নাটিকার গদ্য এবং পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে'। অমিত্রাক্ষর রচনার প্রাচীন ও সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত: এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ ইত্যাদি। এই ভাবগম্ভীর রচনায় যে আনুপূর্বিক চরণে চরণে মিল নাই, সাধারণতঃ সে কেহই লক্ষ্য করেন না। ইহা হইতে

---

[২৭] এই প্রসঙ্গে শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা' (গীতবিতান-বার্ষিকী ১৩৫০) হইতে, ও তৎসম্পাদিত 'জীবনস্মৃতি'র (১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ) গ্রন্থপরিচয় হইতে যথেষ্ট দিশা পাওয়া গিয়াছে।

[২৮] ৩৯-সংখ্যক পত্র : পথে ও পথের প্রান্তে

পুরাতন অল্লাধিক অমিত্রাক্ষর রচনা অনেক পাওয়া যাইবে না তাহাও নয়; যেমন—

	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
বাজাও তুমি কবি	১১৮
দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে	৮৩৭
তোমায় যতনে রাখিব হে	৮৩৮
আইল আজি প্রাণসখা	৮৩৯
অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ	১৬৪

অধিক দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। উক্ত রচনাগুলি 'রবিচ্ছায়া' বা 'গানের বহি'তে প্রথম সংকলিত হয়, অর্থাৎ কবির প্রথম জীবনের রচনা। কেবলমাত্র এই দিক দিয়াও ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে'[২৮] বিস্ময়কর। সুরাশ্রয়ী কবিতার বন্ধন-মুক্তিতে কবির পরীক্ষা যে ফুরায় নাই, তাহার বিশেষ পরিচয় পাই বহুদিন পরে, ১৩৩৭ ফাল্গুনের গীতিগুচ্ছে (অনুষ্ঠানপত্র : নবীন)—

	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী (গদ্য ?)	৫২২
বেদনী কী ভাষায় রে	৫২৫
বাজে করুণ সুরে	৩৪৯

এই গানগুলিতে অন্তর্লীন অনুপ্রাসের মাধুরীতে চমৎকৃত হইয়া, কখনো-বা অনিয়মিত মিলের কৌশলে ভুলিয়া, গীতবধির কোনো কাব্যরসিকও হয়তো নিয়মিত অন্ত্যানুপ্রাসের অভাব বোধ করিবেন না। গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লিখিত গানগুলি সবই পূর্বপ্রচলিত হিন্দি গানের, বা বঙ্গবহির্বর্তী কোনো প্রদেশের কোনো গানের, সুরে রচিত। পরবর্তী তালিকার গানগুলি সম্পর্কে বোধ হয় সে কথা বলা যায় না।

---

[২৮] মজুমদার-পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় রচনা ১৩০২ আশ্বিনে। ঐ বৎসর (শক ১৮১৭) ফাল্গুনের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পাঠান্তর মুদ্রিত : বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য : অখণ্ড গীতবিতান/পৃ ৬১৫

	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে	৮১৮
দিনান্ত-বেলায় শেষের ফসল নিলেম (দিলেম ?)	৩৬৫
ধূসর জীবনের গোধূলিতে	৩৬৫
আজি কোন্ সুরে বাঁধিব	৯০৯

শেষ তিনটি গান, বিশেষতঃ শেষ গানটি (২৯ চৈত্র ১৩৪৬), গদ্যে রচিত বলিয়াই মনে হয়। ছন্দোবদ্ধ কবিতা হউক, তবু রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বশেষ গান 'হে নূতন' (পৃ ৮৬৮) কথা ও কাব্যছন্দ -গত আঙ্গিকের দিক দিয়া অল্প বিস্ময়জনক নয়।

রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যে নৃত্যনাট্যে যেমন সুরের তেমনি ভাষা ও ছন্দের কত নূতন পরীক্ষা করিয়া কোথায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সে বিষয়ে যথাকালে অনুসন্ধান ও আলোচনা হইবে আশা করা যায়। কেবল বলা বাহুল্য না হইতে পারে, যাহা free verse বা মুক্তছন্দ, যে ক্ষেত্রে নানা ছন্দের বা ছন্দশৈথিল্যেরও সুষ্ঠু মিশ্রণ হইয়া থাকে, তাহারও সার্থক উদাহরণ নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' বা 'শ্যামা' খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। পূর্বোক্ত অনেকগুলি অমিত্রাক্ষর রচনাও যে মুক্তছন্দেরই নিদর্শন নয় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। বিশেষতঃ শেষোক্ত রচনার পরবর্তী 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে' ও 'নির্জন রাতে নিঃশব্দচরণপাতে' (পৃ ৯১০) রচনা দুটি অথবা 'পূজা ও প্রার্থনা' অধ্যায়ে (পৃ ৮৫৬-৫৮) ৭৭, ৭৮, ৮১ ও ৮৩ -অঙ্কিত 'ভাঙা' গান কয়টি। (এপর্যন্ত কবিতার ছন্দ লইয়াই আলোচনা করা গেল। গানের ছন্দ সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থ-সম্পাদকের বিশেষ জ্ঞান নাই।) এরূপ হওয়ার কার্যকারণ ঠিক-ঠিক বুঝিতে হইলে— সুর, তাল, লয়, কথা, বিশেষ উপলক্ষ্য, এ-সবের অন্যোন্যনির্ভর বৈশিষ্ট্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করিতে হইবে, বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথের গানের বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বিস্ময়কর। আলোচনার ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারিত।

—

পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

পৃষ্ঠা গান ও ছত্র -সংখ্যার উল্লেখে

সংশোধন-সংযোজন

১৬৪।১৯।১ তব্ স্থলে : তব

২০।১৪ গোপবধূজন

৮৯৯।৭০।৫ তাই স্থলে : তায়

৯০২।৭৭।১ গন্ধরেখার

৭৮৩। শিয়রে 'বিসর্জন' বর্জনীয়

৯১০।৯৪ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে তারিখ : ২৯ চৈত্র ১৩৪৬

৭৬৮।৩ এ গানে 'রবিচ্ছায়া'র (বৈশাখ ১২৯২) পাঠ।

দ্বিতীয় ছত্রে 'অতি ধীরে' একবার মাত্র থাকিলে প্রাপ্ত ও স্বীকৃত স্বরলিপির (গানের) পাঠ পাওয়া যায়। 'ভগ্নহৃদয়' পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে (১২৮৭ ফাল্গুনের ভারতীতে) সংকলিত পাঠের চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রের অবকাশে রহিয়াছে :

নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব জোছনা-সমান
অতি— অতি— অতি ধীরে কর সখি গান !

দ্রষ্টব্য পুরোগামী রবীন্দ্র-উদ্ধৃতি ও তৎসম্পর্কে পাদটীকা-২৬।
পৃ ১০৩০